মা
আনিসুল হক

মা

মা

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের বই

উপন্যাস

ফাঁদ
ভালোবাসা, আমি তোমার জন্যে কাঁদছি
চিয়ারি বা বুদু ওরাঁও কেন দেশত্যাগ করেছিল
বীর প্রতীকের খোঁজে
হৃদিতা
মা

শিশুসাহিত্য

শিপরা

সমগ্র

প্রথম চার উপন্যাস
প্রেমের চার উপন্যাস

মা

আনিসুল হক

সময় প্রকাশন

মা

আনিসুল হক

´পদ্য পারমিতা

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৩

সময় ৪২২

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
সালমানী প্রিন্টার্স, নয়াবাজার, ঢাকা

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

MAA a novel by Anisul Hoque, First Published : Book Fair 2003 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2ka Banglabazar, Dhaka.

Web : www.somoy.com E-mail : somoy@somoy.com

Price : Tk. 150.00 Only

ISBN 984-458-422-1

উৎসর্গ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নিযুত শহীদের প্রত্যেকের মা-কে

সবিনয় নিবেদন

এই কাহিনীর সন্ধান সর্বপ্রথম আমাকে দেন মুক্তিযোদ্ধা নাট্যজন নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু। তারপরে অনেকদিন এই কাহিনী আমাকে তাড়িয়ে ফেরে। অতঃপর আমি একটা উপন্যাস লেখার আশায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে শুরু করি। শহীদ আজাদের আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ পাওয়ার জন্যে আমি পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলাম। বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরেই শহীদ আজাদের সম্পর্কে যাঁরা জানেন, এমন অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তাঁরা আমাকে দিনের পরে দিন তথ্য দিয়ে, উপাত্ত দিয়ে সাহায্য করেছেন। যাঁদের সাক্ষাৎকার আমি নিয়েছি, তাঁদের নামের তালিকা এ বইয়ের শেষে সংযুক্ত করে দিলাম। তাঁদের সকলের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আর বেশ কিছু বইয়েরও সাহায্য দরকার হয়েছে। সেই তালিকাটাও এই বইয়ের শেষে থাকল।

এই উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে আমি নানাজনের কাছ থেকে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা পেয়েছি। ফেরদৌস আহমেদ জায়েদের কথা এখানে বিশেষভাবে উলেখ করতে হয়। সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী আমাকে দিনের পর দিন সময় দিয়েছেন, সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন এবং এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে দিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমার ঋণ জীবনেও শোধ হবার নয়।

এই উপন্যাস রচনাকালে এবং ঈদসংখ্যা প্রথম আলো ২০০২-এ এর সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশের পরে অনেকের কাছ থেকেই আমি অনেক উৎসাহ পেয়েছি। বিশেষ করে পাঠকেরা, তাঁরা ঈদসংখ্যা প্রথম আলো পড়ে এবং সাপ্তাহিক ২০০০-এ ১৬ ডিসেম্বর ২০০২-এ প্রকাশিত আমার লেখা প্রচ্ছদকাহিনী শহীদ আজাদের মায়ের সন্ধানে পড়ে, ফোনে, চিঠিতে ও সরাসরি কথা বলে আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। আলাদা করে আমি আর তাঁদের নাম বলতে চাই না, তাঁরা নিশ্চয়ই এই লেখা থেকেই আমার কৃতজ্ঞতাটুকু গ্রহণ করে নেবেন।

এখন একটা দরকারি কথা বলা প্রয়োজন। এই উপন্যাস সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। তবে এটা ইতিহাস নয়, উপন্যাস। ইংরেজিতে যাকে বলে ফিকশন। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর বেলায় সত্যতা রক্ষার চেষ্টা করেছি পুরোপুরি। যেমন শহীদ আজাদের চিঠিগুলো আসল। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘটনাগুলোর বেলায় অনেক জায়গায় কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে, এটা বোধহয় বলাই বাহুল্য। সব ফিকশনেই এটা নেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মিলি-সংক্রান্ত বিবরণগুলো পুরোটাই বানানো। কিন্তু একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা আজাদ নিজেই লিখেছিলেন তাঁর মাকে লেখা চিঠিতে।

এই উপন্যাস কাউকে আঘাত দেবার বাসনা থেকে রচিত নয়, বরং বাঙালির এক বীরোচিত আখ্যানকে তুলে ধরার আশায় লিখিত ও প্রকাশিত। যদি কোনো অংশ কাউকে সামান্যতম অস্বস্তিতে ফেলে, তবে আমি তাঁকে বলব, ওই অংশটুকু সম্পূর্ণ কাল্পনিক ধরে নেবেন।
প্রিয় পাঠক, আপনার মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক এই দেশটার।

এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
২৪ জানুয়ারি ২০০৩

আনিসুল হক

আলোকোজ্জ্বল শারদীয় দুপুর। আকাশ ঘন নীল। বর্ষাধোয়া গাছগাছালির সবুজ পাতায় রৌদ্ররশ্মি আছড়ে পড়ে পিছলে যাচ্ছে স্বর্ণলতার মতো। সেই চনমনে রোদের নিচে জুরাইন গোরস্তান চত্বরে সমবেত হয়েছেন একদল শবযাত্রী। তাঁদের মধ্যে অনেকেই মুক্তিযোদ্ধা। গোরস্তানের সীমানা-প্রাচীরের বাইরে রাস্তায় গাড়িতে বসে আছেন জাহানারা ইমাম। আজাদের মাকে দাফন করা হবে একটু পরেই।

আজ ৩১শে আগস্ট। ১৯৮৫ সাল। গতকাল, ৩০শে আগস্ট, আজাদের মা মারা গেছেন। পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে আজাদের ধরা পড়ার ঠিক ১৪ বছরের মাথায়, একই দিনে, তিনি মারা গেলেন। এটা শহরের অনেক মুক্তিযোদ্ধারই জানা যে, এই ১৪টা বছর আজাদের মা একটা দানা ভাতও মুখে দেন নাই, কেবল একবেলা রুটি খেয়ে থেকেছেন; কারণ তাঁর একমাত্র ছেলে আজাদ তাঁর কাছে ১৪ বছর আগে একদিন ভাত খেতে চেয়েছিল; পরদিন তিনি ভাত নিয়ে গিয়েছিলেন রমনা থানায়, কিন্তু ছেলের দেখা আর পান নাই। অপেক্ষা করেছেন ১৪টা বছর, ছেলে আর ফিরে আসে নাই। অপেক্ষার এই ১৪টা বছর তিনি কোনোদিন বিছানায় শোন নাই, শানের মেঝেতে শুয়েছেন, কী শীত কী গ্রীষ্ম, তাঁর ছিল একটাই পাষাণশয্যা, কারণ তাঁর ছেলে আজাদ শোবার জন্যে রমনা কি তেজগাঁ থানায়, কি তেজগাঁ ড্রাম ফ্যাক্টরি সংলগ্ন এমপি হোস্টেলের মিলিটারি টর্চার সেলে বিছানা পায় নাই।

শহরের মুক্তিযোদ্ধারা, বিশেষ করে যাঁরা ছিলেন আরবান গেরিলা দলের সদস্য, তাঁরা এসেছেন আজাদের মার জানাজায় শরিক হতে। আজাদের মা মারা যাওয়ার আগে জানতেন যে তিনি মারা যাচ্ছেন, তিনি তাঁর ভাগ্নে জায়েদকে বলে রেখেছিলেন যেন আত্মীয়-স্বজন কাউকে তাঁর মৃত্যুসংবাদ না দেওয়া হয়; কিন্তু জায়েদ মুক্তিযোদ্ধাদের খবরটা না দিয়ে পারে না। জায়েদের কোমরে আর উরুতে আছে বুলেট বের করে নেবার ক্ষতচিহ্ন, ১৪ বছর আগে এই ৩০ শে আগস্টের রাত্রির শূন্য ঘন্টায় পাকিস্তানী সৈন্যদের ছোড়া বুলেট তার শরীরে বিদ্ধ হয়েছিল, তারপর থেকে সে সারাক্ষণ ভুগে আসছে হাতপা-শরীরের অস্বাভাবিক জ্বলুনিতে, এই জায়েদ মুক্তিযোদ্ধা কাজী কামালকে ফোন করে আজাদের মার মৃত্যুসংবাদ অবহিত করে। জাহানারা ইমামের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের পরেও যোগাযোগ ছিল আজাদের মার, জাহানারা ইমাম তথা রুমীভাইয়ের আম্মাকেও জায়েদ জানিয়ে দেয় তার আম্মা অর্থাৎ খালার মারা যাওয়ার খবরটা। জাহানারা ইমাম অতঃপর রুমীর সহযোদ্ধা বন্ধুদের খবর দিতে থাকেন, শাহাদত চৌধুরী থেকে ফতেহ চৌধুরী, হাবিবুল আলম থেকে নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, রাইসুল ইসলাম আসাদ থেকে চুলুভাই, আবুল বারক আলভী থেকে শহীদুলাহ খান বাদল, সামাদ, মাহবুব, হ্যারিস, উলফত, লিনু বিলাহ, হিউবার্ট রোজারিও-সবাই খবর পেয়ে যান যে আজাদের মা মারা গেছেন, তাঁর দাফন হবে জুরাইন গোরস্তানে। জনা তিরিশেক মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ সরাসরি, কেউবা শাহজাহানপুরে আজাদের মার বাসা ঘুরে এসে জুরাইন গোরস্তান এলাকায় জড়ো হয়েছেন।

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর স্মৃতিতে আজাদের মার দাফনের দৃশ্যটাও চিরস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়ে যায়। তাঁর মাথায় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নও চিরকালের মতো আঁকা হয়ে যায় যে, শরতকালের এ-দিনটায় এত আলো থাকা সত্ত্বেও বেলা ১২টার ঘননীল আকাশ থেকে বৃষ্টি নামল কীভাবে। আজাদের মার শবদেহ খাটিয়ায় করে বয়ে চলেছেন মুক্তিযোদ্ধারা, জুরাইন গোরস্তানের দিকে। জুরাইন গোরস্তানটা দেখতে অন্য যে-কোনো গোরস্তানের মতোই, কিছু কাঁচা কবর, কিছু পাকা, পাকা কবরগুলোর কোনোটার চারদিকে কেবল ৫ ইঞ্চি ইটের দেওয়াল, পলেস্তারাহীন, শেওলা-লাগা, আবার কোনোটা

মার্বেল পাথরে ঢাকা, এপিটাফে নামধাম জন্মমৃত্যুসনতারিখ, কোনো কোনো সমাধিসৌধ বেশ জলুসপূর্ণ, তাতে নানা রঙিন কাচ-পাথর বসানো, কোনোটায় টাইলস বসানো, দুতিনদিন বয়সী কবরের মাটি এখনও ঝুরঝুরে, শিয়রে খেজুরপাতা, একটা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে চোখ বন্ধ করে মোনাজাত করছে দুজন টুপি-মাথা শাদা-পাঞ্জাবি– তরুণ এসব দৃশ্যের মধ্যে এমন কিছু নাই যা আলাদা করে চোখে পড়বে। আম্মা, জাহানারা ইমাম, গোরস্তানের মধ্যে মহিলাদের ঢোকা শাস্ত্রসম্মত নয় বলে বাইরে রাস্তায় বসে আছেন গাড়িতে, আর মুক্তিযোদ্ধাদের এ দলটা এগিয়ে যাচ্ছেন যুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া এক সহযোদ্ধার মাকে খাটিয়ায় তুলে নিয়ে। সঙ্গে মরহুমার কিছু সংখ্যক আত্মীয়-স্বজন। তাদের অনেকের মাথায় টুপি। কবরে নামানো হয় শাদা কাফনে মোড়ানো নাতিদীর্ঘ শরীরটাকে, প্রথম মাটিটা দিতে বলা হয় আজাদের খালাত ভাই জায়েদকে, জায়েদ কথার মানে বুঝতে পারে না, তাকিয়ে থাকে নির্বাক আর নিষ্ক্রিয়, তখন একজন তাকে ধরে তার হাতে এক মুঠো মাটি তুলে দেয়, এবং মাটিটা ফেলে দেবার জন্যে তার আঙুলগুলো আলগা করে ধরে, জায়েদের হাত থেকে মাটি ঝরে যায়, তারপর একজন একজন করে মুক্তিযোদ্ধা গোরে মাটি দিতে থাকেন, ঠিক তখনই নির্মেঘ আলোকোজ্জ্বল আকাশ থেকে ঝিরঝির করে নেমে আসে বৃষ্টি। একই সঙ্গে প্রতিটা মুক্তিযোদ্ধার ঘ্রাণেন্দ্রিয়তে একটা অজানা মিষ্টি সুগন্ধ হানা দেয়, আর তাঁরা মাথার ওপরে তাকালে দেখতে পান একখণ্ড বিচ্ছিন্ন মেঘ। রোদ আর বৃষ্টি একসঙ্গে পড়াটা এই বাংলায় কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, রোদ হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে খেঁকশিয়ালির বিয়ে হচ্ছে-ছোটবেলা থেকে এ ছড়াটা কারই বা জানা নাই, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিটা মুক্তিযোদ্ধার মনে হতে থাকে, এই সুগন্ধ, এই সালোক বৃষ্টির অন্য কোনো মানে আছে; তাঁদের মনে হয়, এই শবযাত্রীদলে তাঁদের হারিয়ে যাওয়া শহীদ-বন্ধুরা ফিরে এসেছে, যোগ দিয়েছে। বাচ্চু এরপরে বহুবছর এ আফসোস করবেন যে কেন তাঁরা সেদিন ঘাড় ঘোরান নাই, ঘোরালেই তো দেখতে পেতেন যুদ্ধদিনে চিরতরে হারিয়ে ফেলা তাঁর সহযোদ্ধা বন্ধুদের অনেককেই, আবার এই ১৪ বছর পরে; হাতের এতটা কাছে তিনি পেয়ে যেতেন শহীদ জুয়েলকে, পূর্ব পাকিস্তানের সেরা ব্যাটসম্যান জুয়েল, যার হাতে গুলি লেগেছিল বলে ধরা পড়ার রাতেও আঙুলে ছিল ব্যান্ডেজ, সেই ব্যান্ডেজঅলা আঙুলেই জুয়েল কবরে মাটি দিচ্ছে; দেখতে পেতেন শহীদ বদিকে, স্টান্ড করা ছাত্র বদিউল আলম হয়তো আলবেয়ার কামুর আউটসাইডারটা প্যান্টের কোমরে গুঁজে এক হাতে মাটি দিচ্ছে সমাধিতে, দেখতে পেতেন শহীদ আজাদকে, মরহুমার একমাত্র সন্তান হিসেবে যে এসেছে কর্তব্য পালন করতে; কিন্তু যার পকেটে এখনও আছে জর্জ হ্যারিসনের গানের নিজের হাতে লেখা কপি, মাই ফ্রেন্ড কেম টু মি, স্যাডনেস ইন হিজ আইস...বাংলা দেশ, বাংলা দেশ, সে যেন জর্জ হ্যারিসনের মতোই ভাঙা উচ্চারণে গাইছে ব্যাংলা দেশ, ব্যাংলা দেশ আর গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের মতো মাটি ছিটিয়ে ঢেকে দিচ্ছে কবরখানা। আবুল বারক আলভী দেখতে পান শহীদ আলতাফ মাহমুদকে, যে-কোদাল দিয়ে একাত্তরের ৩০ আগস্ট ভোরে তিনি তাঁর রাজারবাগের বাসার আঙিনায় লুকিয়ে রাখা অস্ত্র তুলছিলেন মিলিটারির বেয়নটের খোঁচা খেতে খেতে, সেই কোদাল নিয়েই এসে গেছেন তিনি, একটু একটু করে মাটি ঢালছেন গোরে। তাঁর কপালে বেয়নটের একটা খোঁচা লাগায় ভুরুর ওপর থেকে চামড়া কেটে নেমে গিয়ে ঝুলে আছে কপালের ওপর, এখনও, যেমনটা ছিল ১৪ বছর আগের সেই ভোরে। আজ তাঁর মুখে যেন আবার বেজে উঠছে অস্ফুট সুর, তারই নিজের কম্পোজিশন: আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি। হয়তো শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের এই ভিড়ে এসেছে বাকের, এসেছে আজাদদের বাসায় থাকা পেয়িং গেস্ট মর্নিং নিউজের সাংবাদিক শহীদ বাশার। এসেছে শহীদ আজাদের সহযোদ্ধা আরো আরো শহীদ মুক্তিযোদ্ধারা।

আজাদের মাকে সমাহিত করে প্রথানুযায়ী দোয়া-দরুদ পড়ে মোনাজাত সেরে একে একে গোরস্তান ছেড়ে চলে আসেন শবযাত্রীদলের সবাই। জায়েদ কবরের গায়ে মরহুমার একটা মাত্র পরিচয় উৎকীর্ণ

করে রাখেঃ শহীদ আজাদের মা। এই তাঁর একমাত্র পরিচয়। তাঁর আর কোনো পরিচয়ের দরকার নাই। এই পরিচয়-ফলক দেখে কেউ কেউ, যেমন আজাদের দুঃসম্পর্কের মামারা, সরোষে এ মত প্রদান করেছিলেন যে কবরের গায়ে মুসলমান মহিলার অবশ্যই স্বামীর নাম থাকা উচিত, কিন্তু জায়েদ নাছোড়, আম্মা মরার আগে আমারে স্পষ্ট ভাষায় কইয়া গেছে, বাবারে আমি যাইতেছি, তুমি এইটা এইটা কইরো, এইটা এইটা কইরো না, তার হুকুম, কবরের গায়ে একটাই পরিচয় থাকব, শহীদ আজাদের মা। ব্যাস আর কিছু না।

১৯৮৫ সালের শরতেই শুধু নয়, তারও ১৭ বছর পরে, ২০০২-এর আগস্টে, যে জিয়ারতকারীরা, শবযাত্রীরা জুরাইন গোরস্তানে যাবে, যদি লক্ষ করে, তারা দেখতে পাবে একটি কবরের গায়ে এই নিরাভরণ পরিচয়-ফলকখানিঃ মোসাঃ সাফিয়া বেগম, শহীদ আজাদের মা। কী জানি তাদের মনে কোনো প্রশ্ন জাগবে কি জাগবে না। কিন্তু জায়েদ জানে, এ ছাড়া আর কোনো পরিচয়েরই আম্মার দরকার নাই, বরং অন্য কোনো পরিচয় কেবল অনাবশ্যক নয়, অবাঞ্ছিত বলে গণ্য হতে পারে। তবু ঢাকার মুক্তিযোদ্ধাদের কারো কারো মনে হবে, তাঁর পরিচয়টা শুধু শহীদ আজাদের মা-ই নয়, তিনি নিজেও এক অসমসাহসিকা যোদ্ধা, তিনি বীর, তিনি সংশপ্তক, তিনি কেবল জাতির মুক্তিযুদ্ধে ছেলেকে উৎসর্গ করেছেন, তাই নয়, সারাটা জীবন লড়ে গেছেন তাঁর নিজের লড়াই এবং সেই যুদ্ধে তিনি হার মানেন নাই।

২

১৯৮৫ সাল। শরত এসেছে এই বাংলায়, এই ঢাকায়, সদ্য মাঁজা কাঁসার বাসনের মতো আলোকোজ্জ্বল আকাশ, তার তীব্র নীল, আর ভাসমান দুধের সরের মতো মেঘমালা, আর শিউলির বোঁটায় বোঁটায় জমে থাকা শিশিরবিন্দু নিয়ে। রাতের রাজপথ এখানে এখন কারফিউ-কাতর, দিনের রাজপথ জনতার বিক্ষোভ-মিছিলের পদচ্ছাপগুলো ধারণ করবে বলে প্রতীক্ষারত। প্রতিবছর শরত এলেই ঢাকার অনেক কজন মুক্তিযোদ্ধার মাথা এলোমেলো হয়ে যেতে থাকে। স্বাধীনতার ১৪ বছর পরে ১৯৮৫-এর এই শরতও তার ব্যতিক্রম নয়। বরং ৩০ আগস্ট আজাদের মার মৃত্যু আর ৩১ আগস্ট তাঁর দাফনের পরে ঢাকার মুক্তিযোদ্ধারা সবাই বড়ো বেশি তাড়িত বড়ো বেশি গ্রস্ত হয়ে পড়েন যেন। এই তাড়না, এই গ্রাস কিসের? সময়ের, নাকি স্মৃতির? কাজী কামাল উদ্দিন বীরবিক্রম চন্দ্রগ্রস্তের মতো হয়ে যান। চাঁদটা যেন তাঁর কাছে একটা পেয়ালা, জ্যোৎস্না যেন পানযোগ্য, আচরাচর যতটা জ্যোৎস্না সবটা তিনি গলাধঃকরণ করে ফেলতে পারেন। তাঁর আফসোস হতে থাকে, রেইডের রাতে তিনি যদি সমর্থ হতেন পাকিস্তানী আর্মি অফিসারের হাত থেকে মেশিনগানটা কেড়ে নিয়ে পুরোপুরি তার দখল নিয়ে নিতে, যদি জিম্মি করতে পারতেন পাকিস্তানী অফিসারটাকে, তাহলে তো তাদের হারাতে হতো না এত এত সহযোদ্ধাকে! আর কী দামি একেকটা অস্ত্র। তাঁর প্রিয় পিস্তলটা! আর সেই রকেট লাঞ্চারটা! হাবিবুল আলম বীরপ্রতীকের মনে হতে থাকে, আরেকটু সাবধান বোধহয় হওয়া যেতে পারত। খালেদ মোশাররফ তো বলেইছেন, ইউ ডিড নট ফাইট লাইক আ গেরিলা, ইউ ফট লাইক আ কাউবয়। শাহাদত চৌধুরী চোখের জল আটকাতে পারেন না। তাঁর চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে যায়। সামান্য ভুলের জন্যে এতগুলো প্রাণ গেল, এত অস্ত্রগোলাবারুদ! তিনি বা আলম যদি তখন ঢাকায় থাকতেন, তাহলে হয়তো এতগুলো তরুণপ্রাণের ক্ষয় রোধ করা যেত! বড়ভাই হিসেবে, শাচৌ হিসেবে মৃত্যুভয়-তুচ্ছজ্ঞানকারী এইসব কিশোর-তরুণের নিরাপত্তা-বিধানের তথা তাদের গাইড করার একটা অলিখিত

দায়িত্ব তার ছিলই! ফতেহ চৌধুরীর মনে হয়, ২৯ আগস্ট বিকালেই যখন জানা গেল, উলফৎ খবর দিল, সামাদভাই ধরা পড়েছে, তখনও যদি তিনি সবগুলো বাড়ি চিনতেন, যদি সবাইকে বলে দিতে পারতেন, সাবধান, তাহলে হয়তো রুমী মরত না, জুয়েল মরত না, আজাদ মরত না, বাশার মরত না...

জাহানারা ইমামের মনে হয়, রুমী যখন যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে জিদ ধরল, তখন তিনি কেন বলে ফেললেন, যা তোকে দেশের জন্যে কুরবানি করে দিলাম, আলাহ বুঝি তাঁর কুরবানি কথাটাই শুনেছেন, আহারে এ কথাটা যদি তিনি না বলতেন, যদি বলতেন, যা রুমী যুদ্ধ জয় করে বীরের বেশে ফিরে আয় স্বাধীন দেশে, তাহলে হয়তো আলাহ তাঁর ছেলেটাকে নিতেন না, ছেলেটা ফিরে আসত ১৬ ডিসেম্বরে, যেমন করে এসেছিল শাহাদত, মেজর হায়দার, বাচ্চু, হাবিবুল আলমেরা, স্টেনগান কাঁধে নিয়ে, লম্বাচুল, কারো কারো গালে দাড়ি, দাড়িতে কেমন লাগত রুমীকে...আচ্ছা ওটা তো আমার মনের কথা ছিল না, শাহাদত, বাচ্চু, উলফত, চুলু,-হাবিব, কামাল, ওটা তো আমার মনের কথা ছিল না, আলাহ না অন্তর্যামী, তিনি আমার মুখের কথাটা ধরলেন,আমার মনের কথাটা পড়তে পারলেন না...

শরত এলেই এইসব স্মৃতি আর শোচনা তাঁদের উদ্ভ্রান্ত করে ফেলে, মনে হয়, পৃথিবীর সমান নিঃসঙ্গতা তাঁদের গিলে ফেলতে আসছে, তার আগেই যদি তাঁরা ধরে ফেলতে পারেন পরস্পরের বিশ্বস্ত আঙুল। কিন্তু এটা ১৯৮৫ সাল, ১৯৭১ নয়। যুদ্ধদিনের পরশপাথর ছোঁয়ানো দিন কি আর ফিরে আসবে? কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের কুলি সর্দার রশিদ আর বিচিত্রা সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী কি আবার একই সিগারেট ভাগ করে খাওয়ার শ্রেণীভেদাভেদ ভুলে যাওয়া দিনে ফিরে যেতে পারেন?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু ঘুমহীনতায় জেগে ওঠেন! কেবল যুদ্ধে হারানো সহযোদ্ধাদের মুখই নয়, নয় শুধু কিশোর মুক্তিযোদ্ধা টিটোর গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহের ছবি, নয় শুধু গুলিবেঁধা শরীর নিয়ে শেষবারের মতো নড়ে ওঠা মানিকের চোয়াল আর দুই ঠোঁটের অব্যক্ত ধ্বনির ফিসফাস, তিনি দেখতে পান যুদ্ধের পরেও প্রতিবাদী মুক্তিযোদ্ধাদের একে একে মরে যাওয়ার ছবি, চলচ্চিত্রের মতো, একের পরে এক, সার সার মৃতদেহ শুধু, মুক্তিযোদ্ধাদের, খালেদ মোশাররফ নাই, হায়দার নাই, মুখতারের লাশ পড়ে আছে স্বাধীন দেশের রাস্তায়, খালেদ মোশাররফ বলতেন, স্বাধীন দেশ জীবিত গেরিলাদের নিতে পারে না, তার চাই শহীদ...

জায়েদ হাহাকার করে ওঠে। মোটরের গ্যারাজ থেকে ফিরতে ফিরতে রাতের বেলা সে ফিসফিস করে, আমি আজাদ দাদাকে সাবধান কইরা দিছলাম, ওই বেটা কামরুজ্জামান পাকিস্তানী আর্মির ইনফর্মার, ওই বেটা ক্যান আমগো বাড়ির চারদিকে ঘুরে, দাদা কয় বাদ দে, তুই আজাইরা ভয় পাস! ক্যান ওই বাড়িতে রাইতের বেলা ওনারা থাকতে গেল?

একেক জন মুক্তিযোদ্ধার বিচ্ছিন্ন দশটা আঙুল কোনো এক সহযোদ্ধার আরো দশটা আঙুলের সন্ধানে মিকেলাঞ্জেলোর ছবির মতো সঞ্চরণশীল হয়ে ওঠে। একজন আরেকজনকে পেয়ে যান। সরবতায় কিংবা নীরবতায় জন্ম নিতে থাকে নিজেদেরই যাপিত জীবনের কিংবদন্তী। এ-কথা সে-কথায় এসে যায় আজাদের প্রসঙ্গ। উচ্চারিত হয়, কিংবা স্মৃত হয়, শেষ পর্যন্ত মাথা নত না করে লড়ে যাওয়া আজাদের মায়ের অবিস্মরণীয় ব্যক্তিগত সংগ্রামের কথা।

তাঁদের মনে পড়ে যায়, আজাদের শেষ দিনগুলো কেটেছে মগবাজারের বাসায়, যুদ্ধদিনের বন্ধুরা এ বাসায় গেছেন অনেকেই। কিন্তু যারা তার ছোটবেলার বন্ধু, তারা স্মরণ করেন যে, ২০৮ নিউ ইস্কাটনে আজাদদের বাসাটা ছিল ঢাকা শহরের সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ বাসা। তাঁরা নিঃসন্দেহ যে এই বাসার কোনো তুলনা ছিল না।

'বাসাটা ছিল দুই বিঘা জমির ওপরে' -একজন বলেন।

'বাসাটায় হরিণ ছিল, একদিন আমার হাত থেকে বাদাম নিতে গিয়ে একটা হরিণ আমার হাতের তালু চেটে দিয়েছিল।' কাজী কামাল এ কথা বলতেই পারেন। কারণ তিনি ছিলেন আজাদের সহপাঠী। সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের ছাত্র ছিল আজাদ। গ্রেগরি স্কুলের ছাত্র ছিল লে. সেলিমও। সেও তো শহীদ। সেন্ট গ্রেগরির ছাত্র ছিল রুমী, রউফুল হাসান, ওমর ফারুক, চৌধুরী কামরান আলী বেগ, মেজর সালেক চৌধুরী। তাঁদের মনে না পড়ে কোনো উপায় থাকে না। তাঁরা ফিরে যান সুদূর অতীতে, তাঁদের শৈশবের দিনগুলোয়, যে-অতীত এতদিন ঢাকা ছিল কালের যবনিকার আড়ালে।

'বাড়িতে তাদের ঝর্না ছিল, সরোবরে রাজহাঁস সাঁতার কাটত, বিরাট লন ছিল, ছিল মশলার বাগান। আমি একদিন ওদের দারুচিনির গাছ থেকে পকেট ভরে ছালবাকল এনেছিলাম'-একজন বিড়বিড় করেন।

'বিরাট বাড়ি, আগাপাস্তলা মোজাইক, ঝকঝকে দামি সব ফিটিংস, আজাদের মায়ের ড্রেসিং রুমটাই একটা বেডরুমের সমান বড়'-জাহানারা ইমাম লেখেন।

'আজাদের বাবা ইউনুস চৌধুরী ছিল ঢাকা শহরের সবচেয়ে বড়লোকদের একজন'-বলেন একজন।

'বড়লোকদের একজন না। সবচেয়ে বড়লোক'-আরেকজন প্রতিবাদ করে ওঠেন।

তখন অভিজ্ঞতা আর কিংবদন্তি এসে তাদের সম্মিলিত স্মৃতিকে সরগরম করে তোলে। সেই স্মৃতি, সেই কিংবদন্তি, সেই ইতিহাস, সেই পুরাণ, মগবাজারের সেই বাড়িটার দেয়ালে বিঁধে থাকা গুলির সেই প্রত্নগাথা, জায়েদের ট্রাংকে সযত্নে তুলে রাখা আজাদের মাকে লেখা আজাদের চিঠির মধ্যে চিরস্থায়ী হয়ে বেঁচে থাকা ইতিহাস-এই সব যদি জোড়া দেওয়া যায়, কী দাঁড়ায়?

যুদ্ধের ভেতর থেকে উঠে আসে আরেক যুদ্ধ, ইতিহাসের ভেতর থেকে উঠে আসে এক মহিলার অবিশ্বাস্য উপ্যাখ্যান।

৩

তখনও আদমজীর বাড়ি হয় নাই। বাওয়ানির বাড়িও ছিল খুব বিখ্যাত, কিন্তু সেটা আজাদদের ইস্কাটনের বাড়ির তুলনায় ছিল নিষ্প্রভ। আজাদের বাবা ইউনুস চৌধুরী ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, টাটা কোম্পানিতে চাকুরি করতেন, ছিলেন বোম্বেতে, কানপুরে। কানপুরেই জন্ম হয় আজাদের। ইউনুস চৌধুরী আর সাফিয়া বেগমের একটা মেয়ে হয়েছিল, তার নাম ছিল বিন্দু, কিন্তু সে বেশি দিন বাঁচে নাই। বসন্ত কেড়ে নিয়েছিল তার জীবন। প্রথম মেয়েকে হারিয়ে সাফিয়া বেগম অনেকটা পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন, ফলে তাঁর কোলে যখন আজাদ এল, তিনি আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো করে আগলে রাখতে শুরু করলেন ছেলেকে। আজাদের একটা ছোটভাইও হয়েছিল পরে, বিক্রমপুরে, কিন্তু ৭ দিনের মাথায় সেও মারা যায় আঁতুড় ঘরেই। ফলে আগে-পরে আজাদই ছিল সাফিয়া বেগমের এক মাত্র সন্তান। অন্ধের যষ্ঠি বাগধারাটা আজাদ আর তার মার বেলায় প্রয়োগ করা যেতে পারত। আজাদ ছিল পাকিস্তানের প্রায় সমবয়সী, তবে আজাদই একটু বয়োজ্যেষ্ঠ। তার জন্ম হয় ১১ জুলাই, ১৯৪৬। আজাদি আজাদি বলে যখন পাগল হয়ে উঠেছিল সারা ভারতবর্ষ, তখনই আজাদের জন্ম বলে তার নাম রাখা হয় আজাদ। ৪৭-এর আগস্টে ভারত-পাকিস্তান দুটো দেশ আলাদা হবার পরে বোম্বে থেকে চৌধুরী সাহেব চলে আসেন ঢাকায়। নিয়তির হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে চলে আসেন তিনি। আসবার ইচ্ছা তেমন ছিল না তাঁর, কিন্তু সাফিয়া বেগম জন্মভূমি ফেলে রেখে অন্য দেশে রয়ে যাবার পক্ষপাতী ছিলেন না একেবারেই। ইউনুস চৌধুরী বিক্রমপুরের ছেলে, মেদিনীমণ্ডল গ্রামে তাঁর পৈতৃক নিবাস। টাটা কোম্পানির চাকুরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় এসে ইউনুস চৌধুরী ব্যবসা শুরু করেন। নানা ধরনের ব্যবসা। যেমন সাপাই আর কন্ট্রাক্টরি। প্রভূত উন্নতি করেন তিনি, বিষয়-সম্পত্তি বাড়তে থাকে অভাবনীয়

হারে। লোকে বলে, ইউনুস চৌধুরীও বলে বেড়ান, এসবের মূলে ছিল একজনের সৌভাগ্য: আজাদের মা। বউয়ের ভাগ্যেই সৌভাগ্যের সিংহ-দুয়ার খুলে যায় চৌধুরীর। যদিও তাত্ত্বিকেরা এ-রকম ব্যাখ্যা দিতে পারে যে, পাকিস্তান কায়েম করাই হয়েছিল মুসলমান মুৎসুদ্দি ও উঠতি ধনিকদের স্বার্থকে নিরঙ্কুশ করার জন্যে, সে-সুযোগ কাজে লাগান ইউনুস চৌধুরী; তবু, চৌধুরী নিজেই তাঁর বৈষয়িক উন্নতির জন্য তার স্ত্রীর ভাগ্যকে মূল্য দিতেন। আসলে, এটা দৃষ্টিগ্রাহ্য যে, বিয়ের পরই ধীরে ধীরে ভাগ্য খুলতে থাকে তাঁর। পাকিস্তানে চলে আসার পর আস্তে আস্তে আজাদের বাবা হয়ে ওঠেন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, চিত্তরঞ্জন কটন মিলের চেয়ারম্যান, একুয়াটি শিপিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। একটা কাস্টম ফোর্ড গাড়ি ছিল তাঁর। গাড়ির নম্বর ছিল ইপিডি ৪৩৪৯। জনশ্রুতি আছে যে, ইরানের শাহ পাহলভি যখন পূর্ব পাকিস্তানে আসেন, তখন তাঁর গাড়ি হিসাবে ব্যবহারের জন্য ইউনুস চৌধুরীর গাড়ি সরকার ধার নিয়েছিল। এ রকমও শোনা যায়, প্রিন্স ফিলিপ শিকারে এসে আজাদদের বাসায় উঠেছিলেন। ভিন্নমতও শোনা যায়, না ঠিক বসায় ওঠে নাই, চৌধুরীর গাড়িটা প্রিন্সের জন্য ধার নিয়েছিল সরকার আর আজাদের বাবা তাদের সফরসঙ্গী হয়েছিলেন।

যাই হোক না কেন, আজাদের বাবা ছিলেন এই শহরের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তি।

আর আজাদদের ইস্কাটনের বাড়িটা ছিল শহরের সবচেয়ে দর্শনীয় বাড়ি। বহুলোক শুধু বাড়ি দেখতেই এ বাড়িতে আসত।

স্মৃতিচারণকারীদের মনে পড়ে যায়, এই বাড়ির একটা রেকর্ড রয়ে গেছে ৩৫ মিলিমিটার সেলুলয়েডে। ডাকে পাখি, খোলো আঁখি, দেখো সোনালি আকাশ, বহে ভোরের বাতাস-এই গানটা শুটিং হয়েছিল এই বাসাতেই। টেলিভিশনের ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠানে এটা অনেকবার দেখানো হয়েছে।

সিনেমার ওই গানের অংশটা খেয়াল করে দেখলেই বোঝা যাবে বড় জব্বর ছিল ওই বাড়িটা।

আজাদ ছিল বাড়ির একমাত্র ছেলে।

আর আজাদের মা সাফিয়া বেগম ছিলেন বাড়ির সুখী গৃহিনী। ছোটখাটো মানুষটার শাড়ির আঁচলে থাকত চাবি। তিনি বাড়িময় ঘুরে বেড়াতেন। আর আল্লার কাছে শোকর করতেন। জাহানারা ইমামের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরোয়-আজাদের মাকে তিনি দেখেছেন এ রকম: 'ভরাস্বাস্থ্যে গায়ের রং ফেটে পড়ছে, হাতে-কানে-গলায় সোনার গহনা ঝকমক করছে, চওড়া পাড়ের দামি শাড়ির আঁচলে চাবি বাঁধা, পানের রসে ঠোঁট টুকটুকে, মুখে সব সময় মৃদু হাসি, সনাতন বাঙালির গৃহলক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি।'

ইউনুস চৌধুরী সেদিন বলেছেন, ওগো শুনছ, আজাদের মা! বাড়িটা আমি তোমার নামেই রেজিস্ট্রি করিয়েছি। এ বাড়ির মালিক তো তুমি।

সাফিয়া বেগম রাগ করেছেন। 'আমি বিষয় সম্পত্তির কী বুঝি? এটা আপনি কী করেছেন? না-না। আপনার বাড়ি আপনি নিজের নামে রেখে দিন।'

ইউনুস চৌধুরী হেসে উঠেছেন। ছাদ কাঁপানো হাসি। 'তুমি তো আমার আছোই। তাইলে বিষয় সম্পত্তিও আমার আছে। কেন, ফরাশগঞ্জের বাড়িও তো আমি তোমার নামে রেখেছি। হাহাহা।' তারপর হাসি থামিয়ে বলেছেন, 'তোমার বরাতেই আমার বরাত খুলেছে। বাড়িটা তোমার নামেই রাখাটা ন্যায্য।'

এ কথা বলার পেছনে কারণ আছে। ইউনুস চৌধুরী যে কানপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়েছেন, তার টাকা যুগিয়েছেন সাফিয়া বেগম। ঢাকায় আসার পর তিনি যে ব্যবসাপাতি শুরু করেন, তারও প্রাথমিক মূলধন যুগিয়েছিলেন সাফিয়া বেগমই, বাবার কাছ থেকে বিয়ের সময় পাওয়া গয়নার কিয়দংশ বিক্রি করে।

স্বামীর কথা শুনে আশ্বস্ত বোধ করলেও কী এক অজানা আশঙ্কায় সাফিয়া বেগমের মনটা তবু যেন কেন কেঁপে উঠেছে। বেশি সম্পত্তির মালিক হওয়া ভালো নয়। টাকাপয়সা বেশি হলে মানুষ বদলে যায়।

আর আজাদের বাবা লোকটা দেখতে এত সুন্দর, তিনি লম্বা, তাঁর গাত্রবর্ণ ফরসা, গাঢ় ভুরু, উন্নত কপাল, উন্নত নাক, উজ্জ্বল চোখ, ভরাট কণ্ঠস্বর, সব মিলিয়ে তিনি এমনি যে মেয়ে-মাত্রই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য। আরেকটা ছবি, হয়তো অকারণেই, সাফিয়া বেগমের মনের পটে মাঝেমধ্যে উদিত হতে থাকে, বোম্বে থাকতে ইউনুস চৌধুরী একটা মঞ্চনাটকে অভিনয় করেছিলেন কৃষ্ণের চরিত্রে, একদিকে রাধা, অন্য দিকে অনেকগুলো গোপিনী কৃষ্ণর জন্যে প্রাণপাত করছে, এই দৃশ্য প্রেক্ষাগৃহের সামনের আসনে বসে দেখেছিলেন সাফিয়া বেগম, বহুদিন আগে, কিন্তু এ দৃশ্যটা মাঝেমধ্যেই দুঃস্বপ্নের মতো তাঁকে তাড়া করে ফেরে।

এই বাড়ি এত বড়, তবু যেন মনে হয় ফরাশগঞ্জের বাড়িই ভালো ছিল। তিনতলার ও বাড়িটা তত জাঁকজমকওয়ালা নয়, কিন্তু যেন ও বাড়িটাতে তিনি নিজেকে খুঁজে পেতেন। ইস্কাটনের বাড়িটা বাড়াবাড়ি রকমের বড়। এটায় নিজেকে কেমন অথৈ বলে মনে হয়। তাই তো তিনি চাবি আঁচলে বেঁধে বাড়িময় ঘুরে বেড়ান। চাকর-বাকর, মালি-বাবুর্চি, দারোয়ান-ড্রাইভার মিলে বাড়ি সারাক্ষণই গমগম করছে। আর আছে আত্মীয়-স্বজন, আশ্রিতরা। বাড়িতে রোজ রান্না হয় ৫০ জনের খাবার। তাদের কে কী খায়, না খায়, এসব দিকেও খুবই খেয়াল রাখেন আজাদের মা। আলাহতালা তাঁদের দুহাত ভরে দিয়েছেন, সেখান থেকে আলাহর বান্দাদের খানিকটা দেওয়া-থোওয়া করলে তো তাঁদের কমছে না, বরং ওদেরও হক আছে এসবের ওপরে।

তবু ফরাশগঞ্জের তিনতলা বাড়িটাই যেন তাঁর বেশি প্রিয় ছিল বলে মনে হয়। ওখান থেকে আজাদের স্কুলও ছিল কাছে। আজাদ সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে ভর্তি হয়েছিল ইনফ্যান্ট ক্লাস থেকেই। একেক দিন একেক পোশাক আর জুতোমোজা পরে সে যখন স্কুলের দিকে রওনা হতো, ছেলের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সাফিয়া বেগমের চোখে অশ্রু এসে যেত। আনন্দের অশ্রু, মায়ার অশ্রু। কাছেই বুড়িগঙ্গা। স্টিমারের শব্দ শোনা যেত। রাত্রিবেলা যখন স্টিমারের সিটির আওয়াজ আসত কানে, কিংবা সার্চ লাইটের বিক্ষিপ্ত আলোয় হঠাৎ হঠাৎ ঝলকে উঠত আকাশ, বাড়ির ছাদ, মাওয়ার সারেং পরিবারের মেয়ে সাফিয়া বেগমের মনটা নিজের অজান্তেই চলে যেত তাঁর শৈশবের দিনগুলিতে। তাঁদের মাওয়ার বাড়িতে ছিল নতুন টিনের চকচকে বড় বড় ঘর, তাতে নানা নকশা কাটা, টিনের চালে টিন-কাটা মোরগ, বাতাসে ঘুরছে আর বাতাসের দিক বলে দিচ্ছে। দূর থেকে লোকে দেখতে আসত তাদের পৈতৃক বাড়িটা। তাঁর বাবার সারেং হওয়ার কাহিনীটাও কিংবদন্তির মতো ভাসছে মাওয়ার আকাশে-বাতাসে: তাঁর বাবা ভাগ্যান্বেষণে উঠে পড়েছিলেন এক ব্রিটিশ জাহাজে, স্টিম ইঞ্জিনচালিত জাহাজ, কী কারণে ব্রিটিশরা তাঁকে ছুড়ে ফেলেছিল গনগনে কয়লার আগুনে, তারপর তাঁকে ফেলে দিয়েছিল সমুদ্রের জলে, কিন্তু তিনি মারা যান নাই, তখন ব্রিটিশ নাবিকেরা বলাবলি করতে লাগল, এই ছেলে যদি বাঁচে, তাহলে সে একদিন কাপ্তান হবে, অগ্নিদগ্ধ শরীরটাকে নিয়ে আসা হলো মাওয়ায়, তাঁকে ডুবিয়ে রাখা হতো কেঁচোর তেলে, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে তোলা হতো কেঁচো আর কেঁচো, সেসব থেকে তেল বের করে তা-ই দুবেলা মাখা হতো আজাদের নানার শরীরে, এই আশ্চর্য ওষুধের গুণে তিনি বেঁচে যান, সেরে ওঠেন এবং শেষতক হয়ে ওঠেন জাহাজের কাপ্তান। ধনসম্পদের মালিক হন, মাওয়ার সবচেয়ে দর্শনীয় বাড়িটার অধিকারী হন। সারেং বাড়ির মেয়ে হিসাবে সাফিয়া বেগমের মাথা সব সময় উঁচুই ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হবে, মাওয়ার দিনগুলোতে, বিয়ের আগে, নিজের বিবাহোত্তর জীবনের যে সুখ-সম্পদময় ছবি সাফিয়া কল্পনা করতেন, বিয়ের রাতে বিশেষভাবে রিজার্ভ করা লঞ্চে করে শ্বশুরবাড়ি বিক্রমপুর যাওয়ার পথে নদীর বাতাস চুলে-মাথায়-ঘোমটায় মাখতে মাখতে যে ঐশ্বর্যময় ভবিষ্যতের ছবি তিনি আঁকতে পেরেছিলেন, তার জঙ্গিতম সংস্করণের চেয়েও আজ তিনি পেয়েছেন বেশি। এই বোম্বে

কানপুর, এই ঢাকার ফরাশগঞ্জের বাড়ি, আবার ইস্কাটনে দুবিঘা জমির ওপরে নিজের প্রাসাদোপম বাড়ি।

ফরাশগঞ্জের বাড়িতে থাকতেই আজাদদের স্কুলে একটা মজার কাণ্ড ঘটেছিল। ব্রাদার ফুল জেম তখন সেন্ট গ্রেগরির প্রিন্সিপ্যাল। সে-সময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন এক বিখ্যাত বাঙালি। ভালো ছাত্র হিসাবে যাঁর নামডাক এখনও রয়ে গেছে কিংবদন্তি হিসেবে। তাঁর ছেলে পড়ত সেন্ট গ্রেগরিতে। গভর্নর সাহেব একদিন স্কুলের শিক্ষকসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে দাওয়াত করলেন নিজের বাসভবনে। উদ্দেশ্য তাঁদের ভালো করে খাওয়াবেন। সে দাওয়াতে আজাদরাও ছিল আমন্ত্রিত। ভোজনপর্ব যা হলো তা ঐতিহাসিকই বলা চলে। তবে খেতে খেতে শিক্ষকদের মধ্যে শুরু হলো গুঞ্জন। কারণ গভর্নর জানাচ্ছেন আজকের এই মজলিশের উপলক্ষ হলো তাঁর সেন্ট গ্রেগরিতে অধ্যয়নরত ছেলের ভালো ফল। শিক্ষকদের মধ্যে যে-বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সেটা হলো গর্ভনরের ছেলে তো মোটেও ভালো ফল করে নাই। তাহলে গভর্নর কেন এত বড় পার্টি এত ধুমধামের সাথে দিলেন। পরে জানা গেল ঘটনার গোমর। একই নামে দুজন ছাত্র আছে ক্লাসে। এর মধ্যে অপরজনের রেজাল্ট খুবই ভালো। ছেলে সেই চমৎকার প্রগ্রেসিভ রিপোর্টটা তুলে দিয়েছে তার বাবার হাতে। সেটা দেখেই বাবা উচ্ছ্বসিত হয়েছেন-বাহ, একবছরেই ছেলের এত উন্নতি। যাক, ছেলে তাঁর বাবার নাম রেখেছে। কী সুখের বিষয়! দাওয়াত করো সবাইকে। সেই দাওয়াত খেয়ে শিক্ষকদের সবার মনমেজাজ অন্তত এক মাস খারাপ ছিল।

শুধু মন নয়, পেটও খারাপ ছিল।

৪

দোহার এলাকার মুক্তিযোদ্ধা গাজী আলী হোসেন এসেছিলেন আজাদের মার জানাজায়। আজাদের সম্পর্কে চাচা হন তিনি। ইউনুস চৌধুরীর খালাত ভাই। আজাদের মা মারা গেছেন শুনে ছুটে এসেছেন। গোরের পাশে যখন তিনি দাঁড়িয়ে, নানা স্মৃতির ভিড়ে তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তাঁর মনের ভেতরে বইতে থাকে রোদনধারা। ভাবি আকারে ছিলেন ছোটখাটো, কিন্তু তাঁর হৃদয়টা ছিল অনেক বড়। ইস্কাটনের বাড়িতে আলী হোসেনও থাকতেন। এ রকম আশ্রিত বা অতিথি আরো অনেকেই থাকত বাসায়। আজাদ আর ভাবির সঙ্গে তিনি বহুদিন কেরমও খেলেছেন। পরহেজগার মহিলা ছিলেন আজাদের মা। নামাজ-রোজা ঠিকভাবে করতেন। দান-খয়রাত করতেন দুহাতে। বাড়ির সব আত্মীয়স্বজন অনাত্মীয় আশ্রিত প্রতিটা লোকেরই আতিথেয়তা করতেন আন্তরিকতার সঙ্গে।

আলী হোসেনের বন্ধুবান্ধবরা খুব একটা এ বাড়িতে আসত না। কিন্তু আলী হোসেনের শখ বন্ধুদের বাড়িটায় আনেন, বাড়িটা বন্ধুরা ঘুরে-ফিরে দেখুক। এই সুবিশাল আর জাঁকজমকপূর্ণ বাড়িটা তো বাইরের কত লোক শুধু দেখতেই আসে। এই বাড়িতে তিনি থাকেন, সেটা বন্ধুবান্ধবদের একটিবার দেখাতে কি সাধ হয় না! বন্ধুরা বাড়িটাও দেখুক, আর তাঁর ভাবির হাতের রান্না একটু ভালোমন্দ খেয়ে যাক। ওরা তো হলে থাকে, কী খায় না খায় কে জানে!

কথাটা তিনি পাড়েন সাফিয়া বেগমের কাছে, ভাবি, আমার বন্ধুরা তো আমি কোথায় থাকি, জানতে চায়, বললাম, ইস্কাটনে ইউনুস চৌধুরীর বাড়িতে, শুনে ওরা বিশ্বাসই করতে চায় না, বলে গু লগাপ্পি বাদ দাও তো ভায়া... কী করি বলেন তো!

ভাবি বলেন, একদিন নিয়ে আসেন তাদের। কবে আনবেন, আগে থেকে জানাবেন। আলী হোসেন বন্ধুদের সাথে আলাপ করে দিনক্ষণ ঠিক করেন। ভাবিকে জানান। ভাবি রান্না করতে পছন্দ করেন খুব। আলীর বন্ধুরা আসবে, এ উপলক্ষ পেয়ে লেগে যান রাঁধতে। কত পদের কত রান্নাই না রাঁধেন। বন্ধুরা আসে। তখন আলী সাফিয়া বেগমকে বলেন, ভাবি, আপনি কি ওদের সামনে একটু আসবেন।

সাফিয়া হেসে বলেন, আমি তো আপনার বন্ধুদের চিনিও না, তাদের সাথে আমার পরিচয়ও হয়নি, কিন্তু আপনি যখন বলছেন, আমি নিশ্চয় তাদের সামনে যাব। আর তাছাড়া তাদের খাওয়ার তদারকিটাও তো করতে হবে। তুলে না দিলে মেহমানরা কী খাবে না খাবে, কে জানে! আমি তাদের তুলে খাওয়াব। ভাবি সামনে আসেন আলী হোসেনের বন্ধুদের। হেসে হেসে কথা বলেন। বন্ধুরা সহজেই আপন হয়ে যায় তার। তিনি খুব যত্ন করে দেবরের বন্ধুদের পাতে খাবার তুলে তুলে দেন। বন্ধুরা ফিরে যায় মোহিত হয়ে।

কিন্তু সবচেয়ে মোহিত হন গাজী আলী হোসেন নিজে, যখন আরেকদিন সাফিয়া বেগম বলেন, বাচ্চুভাই, আপনার বন্ধুদের মাঝেমধ্যে আনবেন। হলে থাকে। বাবা-মার কাছ থেকে কত দূরে। এদেরকে খাওয়াতে পারলে দিলের মধ্যে একটা শান্তি লাগে।

গোরের পাশ থেকে ফিরতে ফিরতে আরো কত কথাই না মনে পড়ে আলী হোসেনের। ইস্কাটনের বাসায় অনেক ফালতু মেহমানও থাকত আশ্রিতের মতো। এদের সবাইকে যে সাফিয়া বেগমের পছন্দ হতে হবে, এমন তো নয়। সবাই পছন্দের ছিলও না হয়তো। হোসেন আলী ছিলেন দেবর, তাঁর ভাবি হিসাবে সাফিয়া বেগম নানা আব্দার অত্যাচার সহ্য করতেন। কিন্তু আলী হোসেনের একটা মামা ছিল, কাদের, যাকে সাফিয়া বেগম ঠিক পছন্দ করতেন না। এটা কাদেরও বুঝত, সাফিয়াও যেন বোঝাতে চাইতেন। একদিন হোসেন আলী আর কাদের একসঙ্গে বসেছেন সকালের নাশতা করতে, সাফিয়া বেগম হোসেন আলীর পাতেও দুটো ডিমের অমলেট দিলেন, তারপর কাদেরের পাতেও দিলেন দুটো ডিমেরই অমলেট। পরে কাদের বলে, বুঝলে ভাগ্নে, তোমার ভাবির মনটা অনেক বড়। ছোটলোকি ব্যাপারটাই তার মধ্যে নাই।

৫

গাড়ির মধ্যে বসে ছিলেন জাহানারা ইমাম, জুরাইন গোরস্তানের বাইরে; ভেতরে অল্প কজন আত্মীয় আর বেশ কজন মুক্তিযোদ্ধা দাফন করছিল আজাদের মাকে। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে জাহানারা ইমাম বেরিয়ে আসেন গাড়ি থেকে। তাঁর কী হয়, তিনিই জানেন। তাঁর মতো স্নিগ্ধরুচি সূক্ষ্ম আচারবোধসম্পন্ন মানুষের এ রকমটা করার কথা নয়-দিনের বেলা বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে সেধে সেধে ভেজা। জাহানারা তা করেন। কারণটা তিনি ধরতে পারেন না। শুধু আবছা একটা অনুভব, হয়তো বেহেশ্‌তের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে, আর শহীদেরা, তাঁর রুমী-রা, আজাদেরা আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করছে। দাফন শেষ করে বাচ্চু, শাহাদাত, কাজী কামাল, হ্যারিস, হাবিব আলম প্রমুখ ফিরে এলে তিনি সংবিৎ ফিরে পান। গাড়িতে ওঠেন। তাঁর গাড়িতে কেউ কেউ লিফ্‌ট নেয়। তিনি সবাইকে তাদের শেষ

গন্তব্যে নামিয়ে দিয়ে এলিফ্যান্ট রোডের বাসা কণিকায় ফিরে আসেন। স্মৃতির দংশন তাঁকে অস্থির করে তোলে।

আজাদের বাবার সঙ্গে জাহানারা ইমামদের পরিচয় মেছের নামে তাঁদের এক ভাগ্নের মাধ্যমে। জাহানারারা কয়েকবার গিয়েছেন আজাদদের ফরাশগঞ্জের বাড়িতে। ইস্কাটনের বাড়িতে গেছেন অনেকবার। রুমীর সাথে খুব সহজেই বন্ধুত্ব হয়ে যায় আজাদের। এত বড় বাড়ি পেয়ে রুমীতো আনন্দে অস্থির হয়ে যেত। এই লংপে-রেকর্ড চালাচ্ছে, এই টেপ রেকর্ডার নিয়ে ছড়া টেপ করছে, এই আবার যাচ্ছে হরিণ দেখতে। আজাদ বলেছে রুমীকে, একটা বাঘও আনার কথা ছিল। কিনেও নাকি ফেলেছিল আজাদের বাবা। কিন্তু আনার পথে বাঘটা মরে যায়।

আজাদের মা খুবই পছন্দ করতেন রাঁধতে। রেঁধে মেহমানদের খাওয়াতে। বাবুর্চি ছিল। কাজের লোকে গমগম করত বাড়িটা। তবু জাহানারা ইমামদের জন্যে নিজ হাতে নানান পদ রেঁধে খাওয়ানোর জন্য তিনি উদ্বেল হয়ে উঠতেন। জাহানারা বলতেন, আপা, আপনি বসেন। আমরা কি খেতে এসেছি নাকি আপনার সাথে গল্প করতে এসেছি? আজাদের মা হাসতেন। স্মিত স্নিগ্ধ হাসি। কথা তিনি বেশি বলতেন না। কিন্তু হাসিটা দিয়েই যেন অনেক কথা বলা হয়ে যেত। বলতেন, পান খান। রেকর্ডের গান শোনেন। আপনি তো দেখতে লোকে বলে সুচিত্রা সেনের মতোন। সুচিত্রা সেনের সিনেমার গানের রেকর্ড আছে শোনেন। আমি আগে সিনেমা থিয়েটার দেখতাম। এখন আর দেখি না। আপনে বোন বসেন। আমি যাব আর আসব। রুমী কী খেতে পছন্দ করে? জামীর জন্য কি আলাদা কিছু রাঁধতে হবে? আপনার সাহেবকে আনেন নি কেন?

পানের একটা রেকাবি সামনে রেখে আজাদের মা রান্নাঘরে চলে যেতেন। এই রেকাবিটাও ছিল যেন শিল্পকর্মের একটা অপূর্ব নিদর্শন । কত ধরনের জর্দাই না তাতে থাকত। একেকটা খোপে একেক রকম জর্দা আর তবক সাজানো। আজাদের মা বলতেন, এটা হলো কিমাম জর্দা, এটা হলো কস্তুরি। পাকিস্তান থেকে আনানো। জাহানারা তেমন পান খেতেন না। আজাদের মাকে খুশি করার জন্যে খানিকটা মুখে দিতেন।

টমি নামে আজাদদের পোষা কুকুর ছিল একটা, স্প্যানিয়েল। এসে জাহানারার গায়ের ঘ্রান নিত। এই কুকুর দেখে রুমী আর জামীর শখ হলো তারা কুকুর পুষবে।

রুমীদের পোষা কুকুর মিকি মারা গেছে ২৫ মার্চের রাতে। আজ থেকে ১৪ বছর আগে! জাহানারার বুক চিরে শুধুই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চায়। রুমীর ১৪ তম মৃত্যুদিনও হয়তো সামনের কোনো একটা দিন। এই সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখ হলেও হতে পারে। রুমীর বাবা শরিফও আজ ১৪ বছর হলো নাই।

৬

আজাদের মার জীবনে এত সুখ, এত প্রাচুর্য! তবু তাঁর বুকটা কেমন যেন হঠাৎ হঠাৎ কেঁপে ওঠে। এখান থেকে ওখান থেকে মেয়েরা ফোন করে, আজাদের বাবাকে চায়। আবার মাঝেমধ্যে ফোন আসে, তিনি ধরেন, হয়তো তাঁর গলা শুনেই ফোন রেখে দেয়। তিনি আজাদের বাবাকে বলেন, কী ব্যাপার, মেয়েরা আপনাকে এত ফোন করে কেন?

আজাদের বাবা হাসেন। 'আরে সব কাজের ফোন। তুমি এত চিন্তা করো কেন? চিন্তা করতে করতে তুমি শুকিয়ে যাচ্ছ।'

'কাজের ফোন, তাহলে আমি ধরলে কেটে দেয় কেন?'

'কেটে দেয় নাকি? তাহলে মনে হয় তোমাকে কাজের লোক ভাবে না। হাহাহাহা।' আজাদের বাবা হাসি দিয়েই যেন সব কিছু আড়াল করতে চান।

আজাদের মা স্বামীর কোনো দোষত্রুটি এখনও দেখেন নাই। কিন্তু তাঁর মনের ভেতরে কেমন যেন কাঁটা খচখচ করে। বোম্বের দিনগুলিতে সেই যে কৃষ্ণরূপী ইউনুস আর তাঁকে ঘিরে থাকা রাধার সখিদের কলকাকলির দৃশ্য তিনি দেখেছিলেন, সেটা তিনি সারাক্ষণ মানস-চোখে দেখতে পান।

আর যেখানে কাঁটার ক্ষত, বাইরের আঘাতগুলো এসে সেই জায়গাতেই লাগে।

একদিন একটা ফোন আসে। 'হ্যালো, আজাদের মা কইতেছেন?'

'জি।'

'আমারে আপনে চিনবেন না। তয় আমি আপনার উপকারের জন্যে ফোন করতেছি। আপনার আজাদের বাপেরে আপনে কতটা চিনেন?'

'আমি তাকে কতোটা চিনি, সেটা কি আপনাকে বলতে হবে?'

'আরে রাগ করেন ক্যান। আমি আপনের উপকার করনের লাইগাই ফোন করছি। আজাদের বাপে যে এক মহিলার লগে গিয়া দেখা করে, আপনি কিছু জানেননি?'

'আপনি কে আমি জানি না। কিন্তু আপনাকে যদি আমার সামনে পেতাম, চড় দিয়ে দাঁত নড়িয়ে দিতাম।'

'রাগ করেন ক্যান? আমারে চড় মারলে কি আপনে আপনের স্বামীরে বশ করতে পারবেন? নিজের ঘরটা সামলান।'

সাফিয়া বেগম ফোন রেখে দেন। দুপুরে ভাত খান না। রাতেও না।

আজাদের দাদির বোধহয় তৃতীয় নয়ন আছে। তিনি তাঁর বিছানায় বসে পেষা পান চিবাচ্ছেন আর বকে চলেছেন, অ আজাদের মা, তুমি যে দুপুরের ভাত অহনও খাইলা না! পিত্তি পইড়া যাইব না?

সাফিয়া বেগম জবাব দেন না।

রাত্রিবেলা স্বামী আসে। তিনি তাঁর সামনে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন।

ইউনুস চৌধুরী বিস্মিত হন। তিনি ঘরে আসা মাত্রই সাফিয়া তাঁর কাছে আসে, তাঁর কোট খুলে দেয়, তাঁর ঘরে পরার স্যান্ডেল পোশাক এগিয়ে দেয়, তাঁর খোঁজখবর নেয়। কিন্তু আজকে সাফিয়ার কী হলো?

সাফির কাছে যাওয়ার আগে চৌধুরীকে যেতে হয় তাঁর মার কাছে। তিনি ডাকছেন, তারা, তারা, এদিকে আয়। (তারা ইউনুস চৌধুরীর ডাকনাম)

ইউনুস মার ঘরে যান।

'বউমা ভাত খাইতেছে না ক্যান। দুপুরে খায় নাই। বিকালে খায় নাই। অহনও দেখি ঘর থন বারাইতেছে না। ব্যাপার কী?'

আজাদের বাবা প্রমাদ গোনেন।

'যা দেখ বউয়ে কী চায়?'

চৌধুরী এবার মনে মনে একটু হাসেন। সাফিয়া আর কী চাইতে পারে! তার চাইবার কিছু থাকলে অবশ্যই তাকে তা তিনি দিতেন। সেটা অনেক বেশি সহজ হতো। কিন্তু তিনি জানেন সাফিয়া কিছুই চাইবে না। বরং সে জেদ ধরেছে নিশ্চয় না চাইবার জন্য।

আজাদ কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারছে মা তার রাগ করেছেন। সে আস্তে করে বাবা-মার ঘরের বাইরে গিয়ে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে কমিক্স পড়ায়। তাতে মন বসাতে না পেরে সে বের করে স্কুলে হোম-টাস্কের খাতা। বিছানায় বইখাতা ছড়িয়ে লিখতে থাকে।

চৌধুরী 'তাদের শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ান। 'কী ব্যাপার, শরীরটা কি খারাপ?'

আজাদের মা কথার জবাব দেন না।

'আজকে তো আমি তাড়াতাড়িই ফিরেছি, নাকি?'

আজাদের মা চুপ করে থাকেন।

'খুব খিদে পেয়েছে। আসো। ভাত দাও।'

আজাদের মা উঠে পড়েন। 'বাবুর্চি, টেবিলে সাহেবের খানা লাগাও নি?'

'আরে বাবুর্চি তো টেবিলে খানা লাগাবেই। তুমি না থাকলে আমি একা একা খাব নাকি?'

চৌধুরী টেবিলে বসেন। সাফিয়া কোনো কথা না বলে প্লেটে ভাত তুলে দেন।

'নাও। তুমিও বসো।' চৌধুরী বলেন।

সাফিয়া কথা বলেন না। স্বামীর সঙ্গে খেতে বসার কোনো লক্ষণও তাঁর মধ্যে দেখা যায় না।

'দুপুরেও নাকি খাও নাই?'

জবাব নাই।

'নাও। বসো। তুমি না খেলে আমি খাব না।'

চৌধুরী স্ত্রীর হাত ধরেন। সাফিয়া হাত শক্ত করে ফেলেন।

'থাকুক। বড় খিদে পেয়েছিল। আজকে আর খাওয়া হলো না।' ইউনুস চৌধুরী উঠে পড়ার ভঙ্গি করেন।

'বসেন। আপনি খাবেন না কেন?'

'তাইলে তুমিও বসো।'

'হাত ছাড়েন। আম্মা ওই ঘরে।'

'আম্মাই তো বেশি চিন্তা করছে। তুমি বসো।'

'না, আমি পরে খাব। বাসার আরো লোক খাওয়ার আছে।'

'বাসার আরো লোকদের নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি বসো।'

সাফিয়া খাতুন খেতে বসেন। কিন্তু তার মুখে অন্ন রুচছে না। তিনি শুধু ভাত নাড়েন-চাড়েন, খান না।

চৌধুরী বলেন, 'তোমার সমস্যাটা কী বলবে তো।'

'বলব। আপনি খেয়ে ওঠেন।'

ভাত খাওয়া হয়ে গেলে সাফিয়া স্বামীর জন্যে পান সাজিয়ে নিয়ে ঘরে যান। আস্তে আস্তে মুখ খোলেন, 'আজকে একটা ফোন এসেছিল। বলল, চৌধুরী সাহেব কী করে, কার কাছে যায়, কিছু জানেন? এক মহিলার কাছে...

সাফিয়া ডুকরে কেঁদে ওঠেন।

চৌধুরী বিপন্ন বোধ করেন। তিনি পরিস্থিতি সামলানোর জন্যই বোধহয় বলেন, 'আমাকে নিয়ে এসব কথা তোমাকে কে লাগিয়েছে। ছিছিছি। এত বড় মিথ্যা কথা বলতে পারল। তার মুখে পোকা পড়বে। আর তুমিও কেমন? তুমি আমাকে না জিজ্ঞাসা করে কে কী বলল না বলল সেইটাই মনে করে বসে আছো। আরে তোমার স্বামী বড়, না ফোনের লোক বড়। কে ফোন করেছে, নাম বলেছে? দাঁড়াও, তাকে আমি দেশছাড়া করব!'

'না, নাম বলে নি।'

'তাহলে তুমি কেন একটা অচেনা অজানা লোকের কথায় বিশ্বাস করলা? বলো।'

'আপনি এক মহিলার সাথে দেখা করতে যান না?'

'না।'

'আমার মাথা ছুঁয়ে বলেন।'

'তোমার মাথা ছুঁয়ে বলতে হবে না। আমি আমার মাথা ছুঁয়েই বলতে পারি। আমি যদি মিথ্যা কথা বলি তাহলে আমার মাথাতেই যেন বাজ পড়ে। মাথা হলো পবিত্র জিনিস। আল্লার কালামের মতোই শরিফ জিনিস।'

সাফিয়া বেগম স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর ধীর কিন্তু স্পষ্টস্বরে বলেন, 'আপনাকে একটা কথা বলে রাখি, আপনি যদি কোনো কিছু উল্টাপাল্টা করেন, আমি কিন্তু সোজা এই বাড়ি ছেড়ে আজাদকে নিয়ে চলে যাব, আর আমার মরা মুখটাও আমি আপনাকে দেখতে দেব না।'

বিদ্যুৎ-বাতির আলোয় সাফিয়ার মুখটাকে পিতলের তৈরি ভাস্কর্যের মতো কঠিন বলে মনে হয়। আর তাঁর কণ্ঠস্বর যেন ভেসে আসে কোনো গভীর কুয়ার তলদেশ থেকে। ইউনুস চৌধুরীর ছেলেবেলায় মেদিনীমণ্ডল গ্রামে কাঁঠালতলার পাকা ইঁদারায় পড়ে গিয়েছিল এক মহিলা, সম্ভবত ঝাঁপিয়েই পড়েছিল, ইঁদারার গভীর থেকে তার কণ্ঠস্বর যে রকম গমগম করে ভেসে এসেছিল, আজ সাফিয়ার গলায় তিনি যেন সেই সুর শুনতে পান। চুপ করে থাকেন কিছুক্ষণ। তখন এমন নীরবতা নেমে আসে যে, মাথার ওপরে ঘূর্ণমান ফ্যানের শব্দকেও প্রায় কর্ণবিদারী বলে ভ্রম হয়।

চৌধুরী বলেন, 'এইসব উল্টাপাল্টা চিন্তা করে তুমি তোমার মনটাকে বিষিয়ে রেখো না। তোমার মনে দুঃখ লাগে, এ-রকম কোনো কিছু আমি করব না।'

সাফিয়া বেগম স্বামীর কথায় আশ্বস্ত বোধ করেন। তিনি এশার নামাজ পড়ার জন্যে ওজু করবেন বলে ওঠেন।

আজাদের ঘরে উঁকি দেন। আজাদ বিছানার ওপরে বইখাতা ছড়িয়ে হোম-টাস্ক করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ইস। স্কুলটাতে এত পড়ার চাপ কেন? কত ইংরাজি বাঙলা বই। আজাদের বইপত্র গুছিয়ে রাখতে রাখতে সাফিয়া ভাবেন। ছেলেটা হাতমুখ না ধুয়েই শুয়ে পড়েছে। এতগুলো কাজের লোক। কিন্তু ছেলেটাকে একটু যত্নআত্তি করবে, তার লোক নাই। অবশ্য সাফিয়া বেগম ছেলের যত্নের ভার অন্যের ওপর ছেড়ে দিতে পছন্দ করেন না। আজকে দিতে হয়েছে, কারণ আজ তিনি রাগ করে ছিলেন। এখন রাগ কিছুটা কমেছে। মাথা ঠাণ্ডা হচ্ছে। ছেলেটাকে কি এরা ঠিকমতো রাতের খাবার খাইয়েছে। ছেলে তাঁর মাছ খেতে পছন্দ করে, কিন্তু মাছের কাঁটা বাছতে পারে না। ছেলের বয়স আর কত হবে? সে হিসাবে ভালোই লম্বা হয়েছে। বিছানায় এলিয়ে পড়া আজাদের শরীরটা দেখতে দেখতে সাফিয়া এক ধরনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। ছেলেটার হাত পা কীরকম ডাঙর হয়েছে! পরক্ষণেই তিনি মাশালা-মাশালা-বলে নিজের দুগালে দু বার করে ডান হাত বোলান। মায়ের নজর না আবার ছেলের গায়ে লেগে যায়। আস্তে আস্তে ছেলেকে ডাকেন, আজাদ, আজাদ, ঘুম, বাবা, ঘুমাবি, না উঠবি? ওঠ। হাতপা ধুস নি, বিকালে কী খেয়েছিস না খেয়েছিস, রাতেও তো খাওয়া দেখতে পারি নি, উঠে পড় বাবা। হোম-টাস্কের খাতা। বিছানায় বইখাতা ছড়িয়ে লিখতে থাকে।

চৌধুরী 'তাদের শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ান। 'কী ব্যাপার, শরীরটা কি খারাপ?'

আজাদের মা কথার জবাব দেন না।

'আজকে তো আমি তাড়াতাড়িই ফিরেছি, নাকি?'

আজাদের মা চুপ করে থাকেন।

'খুব খিদে পেয়েছে। আসো। ভাত দাও।'

আজাদের মা উঠে পড়েন। 'বাবুর্চি, টেবিলে সাহেবের খানা লাগাও নি?'

'আরে বাবুর্চি তো টেবিলে খানা লাগাবেই। তুমি না থাকলে আমি একা একা খাব নাকি?'

চৌধুরী টেবিলে বসেন। সাফিয়া কোনো কথা না বলে পেটে ভাত তুলে দেন।

'নাও। তুমিও বসো।' চৌধুরী বলেন।

সাফিয়া কথা বলেন না। স্বামীর সঙ্গে খেতে বসার কোনো লক্ষণও তাঁর মধ্যে দেখা যায় না।

'দুপুরেও নাকি খাও নাই?'

জবাব নাই।

'নাও। বসো। তুমি না খেলে আমি খাব না।'

চৌধুরী স্ত্রীর হাত ধরেন। সাফিয়া হাত শক্ত করে ফেলেন।

'থাকুক। বড় খিদে পেয়েছিল। আজকে আর খাওয়া হলো না।' ইউনুস চৌধুরী উঠে পড়ার ভঙ্গি করেন।

'বসেন। আপনি খাবেন না কেন?'

'তাইলে তুমিও বসো।'

'হাত ছাড়েন। আম্মা ওই ঘরে।'

'আম্মাই তো বেশি চিন্তা করছে। তুমি বসো।'

'না, আমি পরে খাব। বাসার আরো লোক খাওয়ার আছে।'

'বাসার আরো লোকদের নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি বসো।'

সাফিয়া খাতুন খেতে বসেন। কিন্তু তার মুখে অন্ন রুচছে না। তিনি শুধু ভাত নাড়েন-চাড়েন, খান না।

চৌধুরী বলেন, 'তোমার সমস্যাটা কী বলবে তো।'

'বলব। আপনি খেয়ে ওঠেন।'

ভাত খাওয়া হয়ে গেলে সাফিয়া স্বামীর জন্যে পান সাজিয়ে নিয়ে ঘরে যান। আস্তে আস্তে মুখ খোলেন, 'আজকে একটা ফোন এসেছিল। বলল, চৌধুরী সাহেব কী করে, কার কাছে যায়, কিছু জানেন? এক মহিলার কাছে...

সাফিয়া ডুকরে কেঁদে ওঠেন।

চৌধুরী বিপন্ন বোধ করেন। তিনি পরিস্থিতি সামলানোর জন্যই বোধহয় বলেন, 'আমাকে নিয়ে এসব কথা তোমাকে কে লাগিয়েছে। ছিছিছি। এত বড় মিথ্যা কথা বলতে পারল। তার মুখে পোকা পড়বে। আর তুমিও কেমন? তুমি আমাকে না জিজ্ঞাসা করে কে কী বলল না বলল সেইটাই মনে করে বসে আছো। আরে তোমার স্বামী বড়, না ফোনের লোক বড়। কে ফোন করেছে, নাম বলেছে? দাঁড়াও, তাকে আমি দেশছাড়া করব!'

'না, নাম বলে নি।'

'তাহলে তুমি কেন একটা অচেনা অজানা লোকের কথায় বিশ্বাস করলা? বলো।'

'আপনি এক মহিলার সাথে দেখা করতে যান না?'

'না।'

'আমার মাথা ছুঁয়ে বলেন।'

'তোমার মাথা ছুঁয়ে বলতে হবে না। আমি আমার মাথা ছুঁয়েই বলতে পারি। আমি যদি মিথ্যা কথা বলি তাহলে আমার মাথাতেই যেন বাজ পড়ে। মাথা হলো পবিত্র জিনিস। আল্লার কালামের মতোই শরিফ জিনিস।'

সাফিয়া বেগম স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর ধীর কিন্তু স্পষ্টস্বরে বলেন, 'আপনাকে একটা কথা বলে রাখি, আপনি যদি কোনো কিছু উল্টাপাল্টা করেন, আমি কিন্তু সোজা এই বাড়ি ছেড়ে আজাদকে নিয়ে চলে যাব, আর আমার মরা মুখটাও আমি আপনাকে দেখতে দেব না।'

বিদ্যুৎ-বাতির আলোয় সাফিয়ার মুখটাকে পিতলের তৈরি ভাস্কর্যের মতো কঠিন বলে মনে হয়। আর তাঁর কণ্ঠস্বর যেন ভেসে আসে কোনো গভীর কুয়ার তলদেশ থেকে। ইউনুস চৌধুরীর ছেলেবেলায় মেদিনীমণ্ডল গ্রামে কাঁঠালতলার পাকা ইঁদারায় পড়ে গিয়েছিল এক মহিলা, সম্ভবত ঝাঁপিয়েই পড়েছিল, ইঁদারার গভীর থেকে তার কণ্ঠস্বর যে রকম গমগম করে ভেসে এসেছিল, আজ সাফিয়ার গলায় তিনি যেন সেই সুর শুনতে পান। চুপ করে থাকেন কিছুক্ষণ। তখন এমন নীরবতা নেমে আসে যে, মাথার ওপরে ঘূর্ণমান ফ্যানের শব্দকেও প্রায় কর্ণবিদারী বলে ভ্রম হয়।

চৌধুরী বলেন, 'এইসব উল্টাপাল্টা চিন্তা করে তুমি তোমার মনটাকে বিষিয়ে রেখো না। তোমার মনে দুঃখ লাগে, এ-রকম কোনো কিছু আমি করব না।'

সাফিয়া বেগম স্বামীর কথায় আশ্বস্ত বোধ করেন। তিনি এশার নামাজ পড়ার জন্যে ওজু করবেন বলে ওঠেন।

আজাদের ঘরে উঁকি দেন। আজাদ বিছানার ওপরে বইখাতা ছড়িয়ে হোম-টাস্ক করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ইস। স্কুলটাতে এত পড়ার চাপ কেন? কত ইংরাজি বাঙলা বই। আজাদের বইপত্র গুছিয়ে রাখতে রাখতে সাফিয়া ভাবেন। ছেলেটা হাতমুখ না ধুয়েই শুয়ে পড়েছে। এতগুলো কাজের লোক। কিন্তু ছেলেটাকে একটু যত্নআত্তি করবে, তার লোক নাই। অবশ্য সাফিয়া বেগম ছেলের যত্নের ভার অন্যের ওপর ছেড়ে দিতে পছন্দ করেন না। আজকে দিতে হয়েছে, কারণ আজ তিনি রাগ করে ছিলেন। এখন রাগ কিছুটা কমেছে। মাথা ঠাণ্ডা হচ্ছে। ছেলেটাকে কি এরা ঠিকমতো রাতের খাবার খাইয়েছে। ছেলে তাঁর মাছ খেতে পছন্দ করে, কিন্তু মাছের কাঁটা বাছতে পারে না। ছেলের বয়স আর কত হবে? সে হিসাবে ভালোই লম্বা হয়েছে। বিছানায় এলিয়ে পড়া আজাদের শরীরটা দেখতে দেখতে সাফিয়া এক ধরনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। ছেলেটার হাত পা কীরকম ডাঙ্গর হয়েছে! পরক্ষণেই তিনি মাশাল্লা মাশাল্লা বলে নিজের দুগালে দু বার করে ডান হাত বোলান। মায়ের নজর না আবার ছেলের গায়ে লেগে যায়। আস্তে আস্তে ছেলেকে ডাকেন, আজাদ, আজাদ, ঘুম, বাবা, ঘুমাবি, না উঠবি? ওঠ। হাতপা ধুস নি, বিকালে কী খেয়েছিস না খেয়েছিস, রাতেও তো খাওয়া দেখতে পারি নি, উঠে পড় বাবা। হোম-টাস্ক কি বাকি আছে?

আজাদের ঘুম ভেঙে যায়। সে কেঁদে ওঠে। উম্‌ম্‌। আমাকে ঘুমাতে দাও।

'খিদে লাগে নি? কী খেয়েছিস না খেয়েছিস?'

'আরে ভাত খেয়েছি না। সরো তো।'

'হোমটাস্ক করেছিস?'

'ভোরে ডেকে দিও।'

'আচ্ছা ঘুমা। আমি একটু ভাত মেখে আনি।'

সাফিয়া বেগমের মন মানে না। তিনি আবার ডাইনিং টেবিলে যান। আজাদের ফুলওয়ালা প্লেটে ভাত বাড়েন। তরকারি নেন। রুই মাছের দুটো টুকরো নিয়ে তাড়াতাড়ি কাঁটা বাছতে লেগে পড়েন। তারপর ছেলের ঘরে এসে দেখেন সে ঘুম। দুটো বালিশ দেয়ালে দিয়ে তিনি ছেলেকে বিছানায় বসান।

ঘুমন্ত ছেলে বালিশের চেয়ারে বসে থাকে। দেখি বাবা হা কর তো বলে তিনি ছেলের মুখে ভাত পুরে দেন। ছেলে মুখে ভাত নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

পুরোনো গৃহপরিচারিকা জয়নব তাই দেখে বকতে থাকে, দ্যাখো তো আম্মাজানের কারবার। ছেলেটারে কেমনে খাওয়ায়। ও খাইছে না। আমগো সামনেই তো খাইল।

'নিজের হাতে আজাদ খেতে পারে? মাছের কাঁটা বাছতে পারে? কী যে বলো না তুমি?' মা পরিচারিকাকে বলেন।

কয়েক গ্রাস ভাত ছেলের মুখে তুলে দিয়ে তারপর প্রশান্তি আসে। এক গেলাস পানি একই কায়দায় খাইয়ে দিয়ে ছেলের মুখটা ভালো করে মুছে দেন তিনি। শেষে একটা ছোট বালতিতে করে পানি আর তোয়ালে আনান। খাটের একপাশে ছেলের দু পা ঝুলিয়ে দেন। তারপর বালতির পানিতে তার ছোট্ট পা দুটো ডোবান। নিজের হাত দিয়ে ডলে ডলে ছেলের পা দুটো তিনি পরিষ্কার করেন। বালতি মেঝেতে রেখে পা দুটো তোয়ালে দিয়ে মুছে দেন ভালো করে। ভেজা তোয়ালে ডলে ছেলের হাতদুটো আর মুখটা মুছে দিয়ে তারপর তিনি ক্ষান্ত হন। ছেলেকে ঠিকভাবে শুইয়ে দিয়ে কোলবালিশটা তার একপাশে যথাস্থানে রেখে ছেলের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকান। ছেলে তাঁর ঘুমের কোন অজানা দেশে! শেষে ডিম লাইট জ্বালিয়ে বাতি নিভিয়ে মা কক্ষত্যাগ করেন।

৭

আজাদ একটু একটু করে বড় হতে থাকে, আর ধীরে ধীরে হয়ে উঠতে থাকে দুষ্টের শিরোমণি। সিনেমা দেখার পোকা যেন সে। নাজ সিনেমা হলে ইংরাজি ছবি বেশি চলে। দেখতে যায় বন্ধু-বান্ধব মিলে। ছুটির দিনের মর্নিং শো প্রায় কোনোটাই বাদ যায় না। সম্প্রতি তারা একটা ছবি দেখেছে। তাতে পাত্রপাত্রীরা চোখ ঢেকে রাখে চামড়ার মুখোশে। ঢাকার একটা দোকানে সেই মুখোশ পাওয়া যাচ্ছে। বন্ধু-বান্ধব মিলে বেরিয়ে পড়ে সেই মুখোশ কিনতে। দোকানে গিয়ে এক ঢিলে দু পাখি শিকার। স্মোক গান পাওয়া যায়। বন্দুক, গুলি করলে ধোঁয়া বের হয় নল দিয়ে। বন্দুক আর মুখোশ কিনে ফেলে তারা। চলে আসে বাসায়। দরজা লাগিয়ে চলে খেলা। গান স্মোক খেলা। চোখে মুখোশ। তারপর এ ওকে ঘুসি মারে, ও একে। ঘুসি খেয়ে কেউ পড়ে যায়। কেউ বা পড়তে চায় না। চালাও গুলি। বন্দুকের মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। এই তুই মরা, মরা, তোকে তো আমি গুলি করেছি। কিসের। তার আগেই তোকে না আমি ফায়ার করলাম। না, আমি মরা না। খেলার নিয়ম-কানুন কেউ মানতে চায় না। গুলি খেয়েও উঠে পড়ে। একটা রেফারি থাকলে ভালো হতো। তবু খেলা চলে। হৈচৈয়ে ঘরের আশেপাশে কারো তিষ্ঠানো দায়। এরই মধ্যে আজাদের খালাত ভাই ছোট্ট জায়েদ আসে। দরজায় নক করে।

'কে?' আজাদ বলে।

'আমি জায়েদ।'

'কী চাস?'

'আমাকেও খেলায় নেও।'

'যা যা এটা বড়দের খেলা।'

'আমিও বড় হইছি।'

'হিহিহিহি। আরো বড়ো হ। তুই তো মার ইনফর্মার।'

'না, আমি আম্মারে কিছু কই না।'

'আমি আম্মারে কিছু কই না। কস। সেদিন যে স্কুল পালাইয়া স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে গেছলাম, তুই ছাড়া মারে কে লাগাইছে?'

'আমি না।'

'যা ভাগ, ডোন্ট ডিস্টার্ব। গেট লস্ট।'

জায়েদ বুঝতে পারে, এরা শুধু গান স্মোক খেলে না। অন্য কোনো ব্যাপার আছে। জানালার পর্দা তুলে দেখে, হ্যাঁ, গান স্মোকের আড়ালে বেশ চলছে সিগারেট খাওয়া। দাদা একটা করে টান দেয়, আর কাশে।

কামাল বলে, তুই তো ফল্স টান দিচ্ছিস। জেনুইন টান দে।

আজাদ বলে, সুয়ের আপঅন, জেনুইন টান দিচ্ছি।

'নাক দিয়ে স্মোক ছাড় তো!'

আজাদ নাক দিয়ে ধোঁয়া বের করার চেষ্টা করে। কাশি দিতে দিতে তার চোখ দিয়ে পানি এসে যায়।

জায়েদ দৌড় ধরে। আম্মাকে এই গুরুত্বপূর্ণ ইনফর্মেশনটা জানানো জরুরি। খালাকে আম্মা বলে ডাকে সে। সমস্যা হলো, দাদা সহজেই ধরে ফেলে ইনফর্মারটা কে! তা ধরে ফেলুক। দৌড়ে সাফিয়া বেগমের কাছে পৌঁছে যায় জায়েদ। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, আম্মা, আম্মা, দেইখা যান।

'কী?'

'আরে চলেন না ওই ঘরে। দাদায় কী করে?'

'কী করে?'

'সিগারেট খায়।'

'তুই কেমন করে বুঝলি!'

'আমি দেখছি।'

'আরে ওরা গান স্মোক খেলে। তার ধোঁয়া। যা তো। আমার কাজ আছে।'

'আরে না আমি নিজ চোখে দেইখা আইলাম। বগা সিগারেট খাইতেছে। আয়েন না।'

সাফিয়া বেগম ভাগ্নের হাত ধরে যান। জানালার কাছে যেতেই নাকে পান সিগারেটের গন্ধ। তিনি দরজায় ধাক্কা দেন। 'এই দরজা খোল।'

সর্বনাশ। মা এসে গেছে। মুহূর্তে স্থির হয়ে যায় কর্তব্য। তারা লুকিয়ে ফেলে যে যার সিগারেট। তারপর ভিজে বেড়ালের মতো মুখটি করে খোলে দরজা।

'ঘরে ধোঁয়া কিসের?' মা বলেন।

'গান স্মোক খেলছি না!' আজাদ জবাব দেয়।

'গন্ধ কিসের!'

'গান স্মোকের!'

'গান স্মোকের মধ্যে কি ওরা তামাক দিয়েছে?'

মা সিগারেট খোঁজেন। গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। মনে হয় এখনও ধোঁয়া উঠছে। কিন্তু জিনিসটা ওরা লুকিয়ে রেখেছে কোথায়? খোঁজ খোঁজ। শেষে পাওয়া গেল এক দুর্গম এলাকায়। হুঁকার নল ধরে যাত্রা শুরু করে অন্তিমে হুঁকার মধ্য থেকে বেরয় সিগারেট।

কিন্তু সেদিনও আজাদের মা মারেন নাই আজাদকে। কঠিন মহিলা ছিলেন তিনি। খুবই কঠিন। তা সত্ত্বেও নিজের ছেলের গায়ে কোনোদিন হাত তোলেন নাই সাফিয়া বেগম। বাচ্চাদের মারধর করা তার নীতি-বিরুদ্ধ ছিল।

কত কথা, কত স্মৃতি। হাতের তালু আবার ঘামতে থাকে জায়েদের। সমস্ত শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে, এত দাহ। আম্মাকে কবরে নামিয়ে রেখে এসে সে যেন আর শান্তি পাচ্ছে না একটুও। মোটরের গ্যারাজের কাজে যাওয়া হয় না তার ইদানীং। কিছুই ভালো লাগে না। শুধুই উত্তাপ। শুধুই উত্তাপ! বার-বার মনে হয় একাত্তরের আগস্টের সেই দৃশ্যটা, আজাদ দাদা দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে আছে, মগবাজারের বাড়িতে, ঘরভরা আজাদের খালাত ভাইবোন, মা তাদের পাতে ভাত তুলে দিচ্ছে, রাত্রিবেলা, ইলেক্ট্রিসিটির হলুদ আলোয় পুরোটা ঘরের সব কটা মানুষ যেন ভিজছে, কোনো প্রসঙ্গ ছাড়াই আজাদ বলে, মা, তুমি কিন্তু মা আমাকে কোনোদিনও মারো নাই...

ফরিদাবাদে এক চাচার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল আজাদ, জায়েদেরা। আজাদ তখন হয়তো সদ্যতরুণ, আর জায়েদ নিতান্তই বালক। ঠিক কোন সময়ের কথা, এতদিন পরে জায়েদ সেটা হুবহু মনে করতে পারে না। গ্রামে গিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ে মাঠে-ঘাটে প্রান্তরে। পুকুরপাড়, শ্মশানঘাট, বাজে পোড়া জামগাছতলা। একটা শীর্ণ নদীও বয়ে যাচ্ছে গ্রামের এক পাশ দিয়ে। আজাদের পায়ে জুতা। জায়েদেরও।

আজাদ বলে, দেখবি আমার জুতার কী রকম পাওয়ার! পকেট থেকে দিয়াশলাইয়ের কাঠি বের করে জুতায় ঘষতেই আগুন জ্বলে ওঠে। ঠোঁটের সিগারেটে তাই দিয়ে আগুন ধরিয়ে টানতে থাকে আজাদ। তারপর সিগারেটটা হাতে নিয়ে এক পশলা ধোঁয়া সে ছেড়ে দেয় জায়েদের মুখ বরাবর।

জায়েদ বলে, আমারে একটা কাঠি দেও। আমিও পারুম।

'কী পারবি?'

'আমার জুতা থাইকা আগুন জ্বালাইতে!'

'পারবি না!'

'পারুম।'

'আরে এটা জ্বালাতে শরীরে পাওয়ার লাগে। তাহলে জুতায় এই পাওয়ার আসে।'

'দেও না দাদা একটা কাঠি।'

'নে।'

আজাদ দিয়াশলাইয়ের অনেক কটা কাঠি তুলে দেয় জায়েদের হাতে। জায়েদ নিজের জুতার গায়ে কাঠি ঘষে। আগুন জ্বলে না। কাঠির মুখের বারুদ ক্ষয়ে যায়। কাঠি ভেঙে যায়। একটার পর একটা। না, কাঠি আর জ্বলে না।

'দাদা, ঘটনা কী? কও দেখি।'

'পাওয়ার রে। পাওয়ার। সিনেমায় দেখিস না। হিরোরা কেমনে পারে। একটা হিরো, কয়েকটা ভিলেনকে একাই মেরে ছাতু বানায়। কেমন করে? শরীরে পাওয়ার থাকে তো তাই। আমার শরীরে সেই রকম পাওয়ার আছে।'

নাজ সিনেমা হলের শিক্ষা এসব। মর্নিং শোর।

ফরাশগঞ্জের বাসাতেও তো জাহানারা ইমাম আসতেন। রুমী আসত। জামী আসত। প্রথম দিন যেদিন জাহানারা ইমামকে দেখল জায়েদ, সেদিনটার কথা তার খুব মনে আছে। হারানো সুর নামে একটা ছবি দেখতে সে ঢুকেছিল গুলিস্তান হলে। তাতে অভিনয় করেছেন সুচিত্রা সেন। ছবি দেখে কেবল সে ফিরে আসছে ফরাশগঞ্জের বাসায়। হলের মধ্যে অন্ধকার। আবার বৃষ্টির দৃশ্যও ছিল। জায়েদের ধারণা বাইরেও খুব অন্ধকার নেমে এসেছে আর বৃষ্টি এসে গেছে। মেটিনি শো ছবি ভাঙলে গ্রীষ্মের এই দিনে সে দেখতে পায় বাইরে এখনও সূর্যের আলো। পুরো ব্যাপারটায় কেমন ধন্দ লাগে তার। আর ছবিটাও বড় আবেগ জাগানিয়া। সবটা মিলে একটা ঘোরের মধ্যে ছিল জায়েদ। নবাবপুর রোড ধরে

হাঁটতে হাঁটতে দুপাশের রিকশার ঘন্টির আওয়াজ মাথার মধ্যে যেন ঝিঁঝিপোকার ডাকের মতো অবিশ্রান্ত বলে মনে হয়। ফরাশগঞ্জের বাসায় ফেরে সে। কনে-দেখা হলুদ আলো পড়েছে বাড়ির দোতলা তিনতলায়। জায়েদের পুরো ব্যাপারটা অবাস্তব লাগছে। সদর দরজা পেরিয়ে বৈঠকখানায় যেতেই তার চক্ষুস্থির। আরে আরে হারানো সুর ছবির নায়িকা এখানে বসে আছে কেন? সে চোখ ডলে। না, সুচিত্রা সেনই তো। সে কলতলায় যায়। চোখ ধোয়। আবার উঁকি দেয় বৈঠকখানায়। নাতো, কোনো ভুল নাই। সুচিত্রা সেন তাদের বাসায়। আসা অসম্ভব নয়। এদের বাসায় নানা রকমের বড় বড় মানুষেরা আসে।

তখন সে পাশের ঘরে মামা-চাচাদের ফিসফাস শুনতে পায়। সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেস এসেছেন তাঁর দুই ছেলে নিয়ে। আজাদ দাদার তিনতলার ঘরে যায় জায়েদ। দেখতে পায় হেড মিস্ট্রেসের দুটি ছেলেকে। বড়টা রুমী। আজাদ দাদার চেয়ে লম্বায় একটু ছোট। আরেকটা জামী। সে তার (জায়েদের) চেয়ে একটু ছোট হতে পারে।

কিছুক্ষণের ভেতরেই তারা ছাদে গিয়ে খেলতে আরম্ভ করে। বাড়ির আরো ছেলেমেয়েরা তাদের সাথে যোগ দেয়। ওপেনটি বায়োস্কোপ, নাইন টেন তেইশকোপ, সুলতানা বিবিয়ানা, সাহেব বাবুর বৈঠকখানা, মেম বলেছেন যেতে... আমার নাম রেনুবালা, গলায় আমার মুক্তার মালা।

আজাদ আর রুমী পরস্পরের হাত ধরে তোরণের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আজাদ দাদা করে কী, পুরো ছড়াটা বলে না, যেই মেয়েকে পছন্দ হয়, তার গলাতেই মুক্তার মালা না হলেও তার হাতের মালা পরিয়ে দেয়। তখন মেয়েরা 'হয় নাই, চোট্টামি করছে' বলে চেঁচাতে থাকে। রুমী বলে, এই আজাদ বারবার তুমি ছড়াটা ভুলে যাচ্ছ কেন? নাও, এবার পুরোটা ঠিকমতো বলো।

ওপেন্টি বায়োস্কোপ

নাইন টেন টুয়েন্টিথ্রি কোপ...আজাদ বলতে শুরু করে।

এই কী বলো? রুমী বলে। তেইশ কোপ তো।

'নাইন টেনের পরে টুয়েন্টি থ্রি হওয়া উচিত না? ইংরেজির সাথে আবার বাংলা আসে কী করে?' আজাদ হাসে।

কাজী কামালের মনে সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের সহপাঠী হিসেবে আজাদের স্মৃতি উদিত হয় কেমন ছাড়া-ছাড়া ভাবে। হয়তো স্মৃতি মাত্রই তাই। আজকে কে বলতে পারবে গতকাল ২৪ ঘণ্টায় প্রতিটা মিনিটে সে কী করেছে, কী ভেবেছে? কী করেছে গত একবছরে, রোজ? আজাদের সঙ্গে একই স্কুলে একই সাথে পড়বার স্মৃতির সবই যে নিখাদ ভালোবাসা আর বন্ধুত্বের, তাও কিন্তু নয়। আজাদ যে ভয়াবহ বড়লোকের ছেলে ছিল, একেক দিন একেকটা পোশাক পরে আসত, আসত ভীষণ দামি গাড়ি চড়ে, তার পকেটে সব সময় টাকা-পয়সা থাকত, এ-সব নিয়ে কাজী কামালের ছোটবেলায় একটা অব্যাখ্যাত শ্রেণীহিংসাও হয়তো ছিল। তবুও আজাদকে পছন্দ না করেও তাদের নিম্নমধ্যবিত্ত দলের কোনো উপায় ছিল না। কারণ আজাদ তাদের সিনেমা দেখাত। সিনেমা দেখার একটা প্রবল ঝোঁক ছিল আজাদের। আর বন্ধুদের দেখানোর বেলাতেও তার কোনো কার্পণ্য ছিল না। আজাদের সঙ্গেই সে দেখেছিল মৌলবিবাজারের ভেতরে তাজমহল সিনেমা হলে দি ওল্ডম্যান এন্ড সি। বুড়ো জেলে একটা বিরাটাকায় মাছ ধরার জন্যে সংগ্রাম করছে, এই সংগ্রামে সে কিছুতেই হার মানবে না-দেখে ভালোই লেগেছিল কামালের। তখন টিকেটের দাম ছিল কম, মর্নিং শোতে বারো আনা হলেই ডিসিতে ছবি দেখা যেত। কামালরা ছবি দেখলে কোন ক্লাসে দেখত, সেটা বড় ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আজাদের কাছে এগুলো অনেক বড় ব্যাপার ছিল। সে কখনও থার্ড ক্লাসে ছবি দেখেও নাই। দেখায়ও নাই। লায়ন, রূপমহল, মুকুল, মায়া-এসব সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখা চলত। তবে নাজে আসত ভালো ভালো ইংরেজি ছবি।

আজাদদের বাসায় যাওয়াটাও একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল তার সহপাঠীদের জন্যে। কারণ তার মা খাওয়াতে খুব পছন্দ করতেন। খালাম্মা সেধে সেধে একদম পেট পুরে খাওয়াতেন। নানা পদের খাবার। সেই লোভেও অনেক সময় যাওয়া চলত আজাদদের বাড়িতে। সে ফরাশগঞ্জের বাড়ি হোক, আর নিউ ইস্কাটনের বাড়িই হোক।

আজাদ যে পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল, তা নয়। তবে খারাপ সে ছিল না। পরীক্ষায় কখনও ফেইল করেনি। আবার ফার্স্ট সেকেন্ডও হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য ভালো করেছিল রহমতউলা-স্যারের ক্লাসে। তিনি নিতেন আজাদদের হাতের লেখা ভালো করার ক্লাস-পেনম্যানশিপ ক্লাস। একটা চার্ট ঝোলানো থাকত এই ক্লাসে, আমেরিকান স্টাইলে বাঁকা বাঁকা হরফে তাতে ইংরেজি বর্ণমালা লেখা। কলম না তুলে তেরছা করে এ থেকে জেড পর্যন্ত লিখতে হতো। কোনো অক্ষরের সময়ই কলম তোলা যাবে না। রহমতউলা-স্যারের নিজের হাতের লেখা ছিল অতি চমৎকার। দেখে মনে হতো সার্টিফিকেটের লেখা নিশ্চয় এই স্যারের কাছ থেকে লিখিয়ে নেওয়া হয়। হাতের লেখার এই ক্লাসে আজাদ খুব ভালো করত। প্রায়ই ভেরি গুড পেত আজাদ, তার কপিতে।

আজাদের এই ভালো ইংরেজি লেখাটা শেষ পর্যন্ত কাজে লেগেছিল তার মৃত্যুর মাত্র দিন সাতেক আগে। সে জর্জ হ্যারিসনের বাংলাদেশ গানটা কপি করে নিয়েছিল নিজের জন্যে, আর তখন রুমী, জুয়েল, কামাল, বদি তাকে অনুরোধ করেছিল তাদেরকেও একটা করে কপি দেবার জন্যে। আজাদ ছবিও ভালো আঁকত। মধু মোল্লা-নামের এক আর্টের শিক্ষক তাকে ছবি আঁকা শেখাতে আসতেন বাসায়। তাঁর কাছে শিখে শিখে আজাদ একটা ছোটখাট আর্টিস্ট হয়ে গিয়েছিল। বিজি চৌধুরী স্যার শুক্রবার স্কুল ছুটির পর আলাদাভাবে বসাতেন ড্রয়িঙের ক্লাস। এই ক্লাস করতে চাইলে স্যারের কাছে গিয়ে নাম লেখাতে হতো। আজাদও নাম লিখিয়েছিল। কিন্তু সে ক্লাস করতে চাইত না। বলত, আরে রাখ রাখ এ সময়টা ক্রিকেট মাঠে না-হলে সিনেমা হলে কাটায়া আসাটাই তো বেশি লাভের ব্যাপার। বিজি চৌধুরী স্যার বছরে দুবার ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। পুরস্কার থাকত খুবই আকর্ষণীয়। সেই পুরস্কারের লোভে হোক, অথবা নিজের প্রতিভা যাচাই করে নেওয়ার খাতিরে হোক, আজাদ ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় একবার অংশ নিয়েছিল। ওর ছবিটা ভালো হয়েছিল। আর ও পেয়েছিল ৮০ তে ৭৫। আর প্রতিদ্বন্দ্বী কাশেম পেয়েছিল ৮০ তে ৬০। কিন্তু স্যার প্রথম পুরস্কার দিলেন কাশেমকে, তার কারণ হিসেবে স্যার বলেছিলেন বাকি ২০ মার্কস হলো উপস্থিতির জন্যে। এতে কাশেম ২০-এ ২০ পেয়েছে। আজাদ পেয়েছে ০। ২য় পুরস্কার পেয়ে আজাদ বেশি খুশি হয়েছিল, কারণ প্রথম পুরস্কারটা ছিল রঙের বাক্স, আর ২য়টা ছিল একটা খেলনা গাড়ি। ও ঠোঁট উল্টে বলেছিল, আরে কালার বক্স আমার বহুত আছে।

আজাদের আরেক সহপাঠী কামরান আলী বেগের মনে পড়ে যায়, ক্লাসে সূত্রধর স্যার একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, এয়ার-বাস কী? ঢাকা টু ঈশ্বরদী তখন এয়ার-বাস চলতে শুরু করেছে। স্যার এই ব্যাপারটাই বোঝাচ্ছিলেন। আজাদ স্যারের কথা শুনছিল না। সে ব্যস্ত ছিল পার্শ্ববর্তী সহপাঠীর সঙ্গে কাটাকুটি খেলায়। স্যারের নজরে পড়ে যায় সে। স্যার জিজ্ঞেস করেন, আজাদ, ওঠো। কী করছিলে?

'কিছু না স্যার।'

'আমি কী পড়াচ্ছি, শুনছিলে?'

'জি স্যার।'

'আচ্ছা বলো তো এয়ার-বাস কী?'

আজাদ উসখুস করে। ঠিক এই সময় পিয়ন আসে কী একটা নোটিস নিয়ে। স্যার সে-নোটিসটা পড়ে তাতে স্বাক্ষর করে পিয়নকে বিদায় করেন। ইত্যবসরে আজাদ পেছনে বসা বেগকে জিজ্ঞেস করে ফিসফিসিয়ে, এই এয়ার-বাস কী রে?

বেগ বলে, আরে এয়ার-বাস বুঝলি না? আকাশ দিয়ে বাস ওড়ে। তার দরজায় থাকে কন্ডাক্টর। সে বাসের গায়ে চাপড় মেরে বলে, আইসা পড়েন ডাইরেক্ট সদরঘাট। তার দরজায় ঝোলানো থাকে দড়ির সিঁড়ি। প্যাসেঞ্জাররা সেই সিঁড়ি দিয়ে তাতে উঠে পড়ে।

পিয়নকে বিদায় করে সূত্রধর স্যার আবার গর্জন করে ওঠেন, হ্যাঁ, আজাদ বলো, এয়ার-বাস কী?

আজাদ বলতে শুরু করে, আকাশ দিয়া বাস যায় স্যার, দরজায় থাকে দড়ির সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি দিয়া প্যাসেঞ্জার উঠিয়া থাকে...

পুরো ক্লাস হেসে গড়িয়ে পড়ছে। স্যার হাসবেন না কাঁদবেন, বুঝতে পারছেন না। শেষে হাসি চেপে বলেন, দাঁড়িয়ে থাকো। ঘণ্টা না বাজা পর্যন্ত বসবে না।

৮

শহরের মুক্তিযোদ্ধা আর আজাদের বন্ধুবান্ধবদের মনে পড়ে যায় যে, আজাদের মার দুঃস্বপ্নের দৃশ্যটাই শেষতক ইউনুস চৌধুরীর জীবনে বাস্তব রূপ লাভ করেছিল। এখান থেকে ওখান থেকে কৃষ্ণের ষোলশ, গোপিনী না হলেও চৌধুরীর জীবনে নারী-ভক্তের উপস্থিতি সাফিয়া বেগম টের পেতে শুরু করেন।

এরই মধ্যে একজন ছিলেন যিনি চৌধুরীর আত্মীয়া, বিবাহিতা, আর সম্পর্কে তাঁর বড় ভাইয়ের স্ত্রী। তাঁর সঙ্গে মেলামেশাটা সাফিয়া বেগম একদমই সহ্য করতে পারতেন না।

মহিলা নিউ ইস্কাটনের বাসায় একবার বেড়াতেও এসেছিলেন। অতিথি-বৎসল সাফিয়া বেগম সব ধরনের অতিথির ঝামেলা হাসিমুখে সহ্য করলেও এই মহিলাকে সহ্য করতে পারেন নি। সম্ভবত তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাঁকে ভবিষ্যতের অশনি সংকেত জানান দিচ্ছিল।

সাফিয়া বেগম স্বামীকে বলেন, এই মহিলাকে আপনি আমার বাসা থেকে যেতে বলেন। আমি আর এক মুহূর্তও তাকে এই বাড়িতে দেখতে চাই না।

চৌধুরী সাহেব তখন তরলের গুণে বেশ উচ্চমার্গে অবস্থান করছিলেন। তিনি বলেন, কেন? থাকতে পারবে না কেন?

'কারণ সে মহিলা ভালো না। তার স্বভাব চরিত্র চাল-চলন আমার ভালো ঠেকছে না।'

'কিন্তু আমার কাছে ভালো ঠেকছে।'

'তা তো ঠেকবেই। আপনার সাথে তার কী সম্পর্ক, আমি বুঝি না। ছিছিছি। উনি না আপনার সম্পর্কে ভাবি হয়?'

'নিজের তো আর ভাবি না।'

'নিজের ভাবি না হলেই আপনি একটা ছেলের বাবা হয়ে আরেকটা ছেলের মায়ের সাথে সম্পর্ক রাখবেন?'

'কী সম্পর্ক?'

'তা আমি কী জানি?'

'তাহলে কথা বলো কেন?'

'আপনি তাকে বের করে দেবেন, এই হলো আমার শেষ কথা!'

'যদি বের করে না দেই।'

'তাহলে আমি বের করে দেব। সে এখানে এসেছে কোন অধিকারে?'

'তুমি অধিকারের কথা জিজ্ঞাসা করো। তাহলে আমি তাকে অধিকার দিব। সে এখানে থাকবে আমার স্ত্রীর অধিকার নিয়ে।'

'খবরদার। এই কথা শোনার আগে আমার মরণ হলো না কেন?'

'আমার হক আছে, আমি চারটা পর্যন্ত বিবাহ করতে পারি। তুমি তো শরিয়ত মানো, নামাজ রোজা ইবাদত বন্দেগি করো, তুমি আমার হক মানবে না?'

'না। মানব না। শরিয়তে আছে চারটা বিয়ে করা যাবে। কিন্তু চার বউকে একদম এক সমান নজরে দেখতে হবে। কাউকে এক সরিষা পরিমাণ বেশি বা কম ভালোবাসা যাবে না। আবার একটু কম বা বেশি অপছন্দও করা যাবে না। সেটা কারো পক্ষে করা সম্ভব না। কাজেই দুই বিয়ে করা ধর্মের মতে উচিত না।'

'তুমি বেশি বোঝো? তুমি জানো আমার পায়ের নিচে তোমার বেহেশ্‌ত।'

'যে স্বামী স্ত্রীর হক আদায় করতে পারে না, তার পায়ের নিচে বেহেশ্‌ত থাকতে পারে না।'

'কথা পেঁচিও না। আমি ওকে বিয়ে করবই।'

'আপনি ওই মহিলাকে বিয়ে করলে আমার মুখ আর জীবনেও দেখবেন না। বড় ভাইয়ের বউকে বিয়ের কথা ভাবে, আমি কি আজরাইলের পালায় পড়েছি।'

'আমি তোমাকে আরো গয়না দেব। তোমার নামে একটা জাহাজ লিখে দেব।'

'আপনার গয়নায় আমি থুতু দেই।'

'কী বললে তুমি?'

'আপনেরে মিনতি করে বলি। আপনি ওই মহিলাকে ছাড়েন। এই বাড়ি-টাড়ি সব আমি আপনার নামেই লিখে দেব। তবু পাগলামি ছাড়েন।'

'না, আমি ওকে বিবাহ করবই।'

'তাহলে আপনি আমার মরা মুখ দেখবেন।'

সাফিয়া বেগম কেঁদে-কেটে অন্য ঘরে চলে যান। পাশের ঘরে আজাদ। সে সব কথা শুনছে। তার মাথা গরম হচ্ছে। অথচ ঠিক করতে পারছে না সে কী করবে। মা-বাবা ঝগড়া করছেন। বাবা আরেকটা বিয়ে করতে চাইছেন। বাড়িতে এইসব হতে থাকলে তার বুঝি কষ্ট হয় না? তার বুঝি খারাপ লাগে না? তার বুঝি ইচ্ছা হয় না নিজের ওপরে শোধ নিতে। তার কান দুটো গরম হয়ে ওঠে। সে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে জোরে গান ছেড়ে দেয়। শক্তিশালী গানের যন্ত্র মাথায় তোলে পুরোটা বাড়িকে।

মহিলাকে চৌধুরী আপাতত বিদায় করেন ইস্কাটনের বাসা থেকে।

কিন্তু তাঁর জীবন থেকে নয়। মধ্যখানে কিছুদিন চৌধুরী ব্যয় করেন তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের আঞ্জাম সম্পন্ন করতে। তাঁর বৃদ্ধ পিতা আর মাতার অনুমতি আদায় করেন দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে। আজাদের দাদা-দাদি বিয়ের অনুমতি দিতে খুব বেশি কুণ্ঠা দেখান না। ছেলে তাঁদের শিক্ষিত হয়েছে, বড় হয়েছে, আর টাকাকড়ি আয়-উন্নতি করেছে কত! তার তো একাধিক স্ত্রী থাকতেই পারে। মহিলার দিক থেকেও আইনগত প্রস্তুতির ব্যাপার ছিল। তাঁকে প্রথম স্বামীর কাছ থেকে ডিভোর্স নিতে হয়। তারপর চৌধুরীর কয়েকজন অতি ঘনিষ্ঠ নিকটাত্মীয় আর বন্ধুর উপস্থিতিতে মগবাজারের এক আত্মীয়ের বাসায় একরাতে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।

রাত তখন একটার মতো বাজে। সাফিয়া বেগমের বিশ্বস্ত পরিচারিকা এসে খবর দেয়, আম্মাজান, আব্বায় আরেকটা বিয়া কইরা বউ নিয়া এ বাড়িতেই আইছে।

সাফিয়া বেগম মুহূর্তখানেক স্তব্ধ হয়ে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। মুহূর্তখানেকই শুধু। তখন পুরোটা পৃথিবী নৌকার মতো একবারের জন্য দোল খেয়ে ওঠে। তারপর স্থির হয়। তিনি পরিস্থিতি অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। তাঁর সমস্ত শরীর সংকল্পে নড়ে ওঠে। মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত গলিত আগুনের ধারা বয়ে যায়। তিনি কর্তব্য স্থির করেন। পরিচারিকাকে বলেন, আজাদকে এখানে আসতে বলো। তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রতিজ্ঞার ধাতব টঙ্কার।

আজাদ আসে। তার মাথার চুল এলোমেলো, চোখের নিচে কালির আভাস, পরনে নিদ্রাপোশাক। সে নিচের পাটির দাঁত ওপরের পাটির সামনে আনছে।

মা বলেন, আমি এখন এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আর কোনোদিন আমি তোর বাবার মুখ দেখব না। তুই কি এই বাড়িতে থাকবি, না আমার সাথে যাবি?

আজাদের সাত-পাঁচ ভাবার দরকার নাই। সে বলে, তোমার সাথে যাব।

'চল। বইপত্র গুছিয়ে নে। তাড়াতাড়ি কর। ৫ মিনিট টাইম দিলাম।'

আজাদ তার ঘরে যায়। তার জিনিসপত্র গোছাতে থাকে। স্কুলের ব্যাগে বইপত্র গোছানোই আছে। কিন্তু তাই তো সব নয়। কত কাপড়চোপড়। কতশত গল্পের বই, কমিক্সের বই। খেলনা শতপদের। ক্যামেরা, আর আছে সত্যিকারের একটা রিভলভার। তাদের একটা বন্দুকের দোকানও আছে। সেখান থেকে রিভলভারটা সে নিয়েছে, তার নামেই লাইসেন্স করে।

আজাদ কোনটা রাখবে, কোনটা নেবে! রিভলভারটা সে সঙ্গে নেয়। এটা এই গণ্ডগোলের সময়ে কাজে লাগতে পারে। সে আর তার মা একা বের হচ্ছে। রাত্রির এই ঘন অন্ধকারের অজানা পেটের ভেতরে ঢুকে যাবে তারা। কোথায় যাবে, কী হবে, সবই অনিশ্চিত। তার টেপ রেকর্ডারে রুমীর কণ্ঠে একটা কবিতার আবৃত্তি টেপ করা আছে। বীরশিশু। মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে, মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে, তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে, দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে...এমন সময় হারেরেরেরে, ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে...ওই ডাকাতদলের হাত থেকে মাকে কে রক্ষা করেছিল। তার ছেলেই তো।

পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে,

'ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে।'

আর আজাদের মার যদি কিছু হয়! কে তাঁকে বাঁচাবে বিপদ-আপদ থেকে! আজাদকেই তো দায়িত্ব নিতে হবে।

আজাদ তার স্কুলের ব্যাগের মধ্যে রিভলভার আর বুলেট তুলে নেয়।

সাফিয়া বেগম এই বাড়ির কোনো কিছু সঙ্গে নেবেন না। যাকে বলে এক বস্ত্রে যাওয়া, তাই তিনি যাবেন। কিন্তু তাঁর বাবার দেওয়া গয়নাগুলো আলমারিতে একটা আলাদা বাক্সে তোলা আছে। এগুলো না নেওয়াটা উচিত হবে না। এগুলো চৌধুরীর নয়। আর তাছাড়া আজাদ থাকবে তাঁর সঙ্গে। তাকে তো মানুষ করতে হবে। পড়াতে হবে। খাওয়াতে হবে। পরাতে হবে।

তিনি আলমারি খোলেন। রাশি রাশি গয়নার মধ্যে থেকে কেবল নিজের পিতৃদত্তটুকুন একটা পুটলিতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। 'বাদশা, গাড়ি বের করো।'

বাদশা বাড়ির ড্রাইভার। বেগম সাহেবার নির্দেশে সে গাড়ি বের করে। পোর্চে রাখে।

আজাদ আর তার মা বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। বাড়ির কাজের লোক, আশ্রিতজন, আত্মীয়-স্বজন সব নীরবে তাকিয়ে থাকে তাদের চলে যাওয়ার দিকে। তাদের মাথার ওপর থেকে যেন ছায়া সরে যাচ্ছে।

পরিচারিকা জয়নব কেঁদে ওঠে। সাফিয়া বেগম চাপা গলায় তাঁকে ধমকে দেন, 'পাড়ার লোকদের রাতের বেলায় জাগিয়ে তুলবি নাকি? বাড়িতে কি লোক মারা গেছে? চুপ।'

আজাদ আর তার মা বারান্দা পেরোয়। বারান্দার চারদিকে লাইট। আজাদের পায়ের কাছে নিজের অনেকগুলো ছায়া তাকে ঘিরে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। ছায়াগুলোর দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। টমি, স্প্যানিয়েল কুকুরটা, কী করবে বুঝে উঠছে না। একবার আজাদের কাছে আসছে, একবার ভেতরে ঢুকছে। আজাদ সেদিকে তাকাবে না। তারা গিয়ে গাড়িতে ওঠে। গাড়ি স্টার্ট নেয়। জীবনে শেষবারের মতো সাফিয়া বেগম তাঁর নিজ নামে রেজিস্ট্রিকৃত ইস্কাটনের রাজপ্রাসাদতুল্য বাড়িটা ছেড়ে চলে যান।

গাড়ি ইস্কাটন থেকে বেরিয়ে অগ্রসর হতে থাকে ফরাশগঞ্জের দিকে। রাতের রাস্তাঘাট দেখতে অন্য রকম লাগে। রাস্তা জুড়ে নেড়ি কুকুরদের রাজত্ব। সেকেন্ড শো সিনেমা দেখে দর্শকেরা ফিরছে। গাড়ি গিয়ে ফরাশগঞ্জের বাসার সামনে থামে। এ বাসাটায় এখন সাফিয়া বেগমের নিজের ছোটবোন শোভনা আছে ছেলেমেয়ে নিয়ে। আছে জায়েদ, চঞ্চল, মহুয়া, টিসু, কচি প্রমুখ আজাদের খালাত ভাইবোনেরা। এদের বাবা আবার সম্পর্কে চৌধুরীর ভাই হয়। জিনিসপত্র নিয়ে আজাদ নামে। মার সঙ্গে তেমন কিছু নাই। শুধু একটা ছোট্ট থলে ছাড়া। ড্রাইভার বলে, আম্মা, আমি কি থাকব? মা মাথা নেড়ে না বলেন। আজাদ ডোরবেল টিপলে দরজা খুলে যায়। খালা দরজা খোলেন। তিনি বলেন, এত রাতে যে বুবু? সাফিয়া বেগম তাঁর প্রশ্নের জবাব দেন না। সিঁড়ি ভেঙে সোজা ওঠেন তিনতলার একলা ঘরটায়। এটা আগে ছিল আজাদের ঘর। তিনি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন।

এরপর ৫ দিন তিনি এই ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখেন। একটা বারের জন্যও দরজা খোলেন না।

তাঁর ছোটবোন শোভনা, বোনের ছেলেমেয়েরা আর আজাদ প্রথম দিন দুপুর থেকে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে। তিনি স্পষ্ট গলায় বলেন, এই, দরজায় ধাক্কা দিবি না। সবাই সবার নিজেদের কাজে যা।

সাফিয়া বেগমের কণ্ঠস্বরে কী একটা ক্ষমতা ছিল, কেউ আর তাকে জ্বালাতন করে না। সবাই নিচে নেমে যায়।

পরের দিন আবার সকালে সবাই চিন্তিত উদ্বিগ্ন মুখে তিনতলার ঘরের সামনে জড়ো হয়। তারা দরজায় ধাক্কা দিতে আরম্ভ করলে তিনি আবার শান্ত কিন্তু গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, এই বলেছি না, দরজায় ধাক্কা দিবি না।

সবাই আবার নেমে যায়।

তৃতীয়দিন সকালে ফের সবাই ভীষণ চিন্তিত হয়ে সাফিয়া বেগমের বন্ধ দরজার সামনে অবস্থান নেয়। জায়েদের মা আজাদকে শিখিয়ে দিয়েছেন, বল, তুমি কিছু খাবে না? না খেয়ে মরে যাবে? তাহলে আমি বাঁচব কাকে নিয়ে? আমাকে দেখবে কে? আজাদ এত কিছু বলতে পারে না। শুধু বলে, মা কিছু খাবা না? না খেয়ে মরবা নাকি?

মা বলে, না খাব না। খিদে পায় নি। খিদে লাগলে নিজেই খাবার চেয়ে নেব।

চতুর্থ দিনে সবাই ভাবে, সাফিয়া বেগম নিশ্চিত মরতে যাচ্ছেন। জায়েদের মা বলেন, বুবু, তুমি কি আত্মহত্যা করবা? তাইলে তো তোমার দোযখেও জায়গা হবে না।

সাফিয়া বেগম বলেন, না আমি মরব না। একটা আজরাইলের জন্য আমি মরব না।

'ঘর থেকে বার না হও, কিছু একটা খাও। জানলা দিয়া ভাত দেই।'

সাফিয়া বলেন, 'তুই বেশি কথা বলিস। চুপ থাক।'

ওই দিন রাতেই চৌধুরী সাহেবের গাড়ি দেখা যায় ফরাশগঞ্জের বাসার সামনে। জায়েদ এসে খবর দেয় আজাদকে, দাদা, আপনের আব্বায় আইছে।

আজাদ তখন তার সঞ্চয় থেকে তার জিনিসটা বের করে। রিভলভার। এটা সে সঙ্গে এনেছিল ভবিষ্যতে কোনো না কোনো কাজে লাগতে পারে, এ আশায়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে কাজে লেগে যাবে, সে বুঝতে পারে নাই। সে রিভলভারের মধ্যে গুলি ভরে। তারপর রিভলভারটা হাতে নিয়ে তিনতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়ায়।

চৌধুরী নিচের তলার ঘর পর্যন্ত ঢোকেন। তাঁকে গৃহবাসীরা সাবধান করে দেয়, যেন তিনি ওপরে না ওঠেন। তাঁকে আরো বলা হয়, তিনি যদি ওপরে ওঠার চেষ্টা করেন, তাহলে আজাদের হাতের অস্ত্র গর্জে উঠতে পারে। সে তার মাকে পাহারা দিয়ে রেখেছে।

চৌধুরী ফিরে যান।

বদ্ধ ঘরের জানালার অন্যপাশ থেকে ঘটনা বিবৃত করা হয় সাফিয়া বেগমকে। সাফিয়া বেগম সব শোনেন। পঞ্চম দিন সকালে তিনি বন্ধ দরজা খুলে দেন।

জায়েদের মা তাঁর জন্যে ভাত আনেন। তরকারি আনেন। তিনি বলেন, মাছ-মাংস কেন এনেছ? এই সব নিয়ে যাও। খালি একটু ডাল-ভাত দাও। আর শোনো, আমাকে একটা শাদা শাড়ি দাও। আমার স্বামী তো আর আমার কাছে জীবিত নাই। আমি কি আর রঙিন শাড়ি পরতে পারি!

বাড়ির পরিচারিকারা আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসে যে বড়আম্মার পোষা জিন আছে। তারাই তাঁকে এ পাঁচদিন খাবার সরবরাহ করেছে। না হলে পাঁচ পাঁচটা দিন একটা দানা মুখে না দিয়ে কেউ বাঁচতে পারে!

এরপরের তিনটা বছর তিনি কারো সাথে বলতে গেলে কথাই বলেন নাই।

৯

চৌধুরী সাহেব এতদূর পর্যন্ত ভাবতে পারেন নাই। কেই বা ভাবতে পেরেছে? আজাদের মা কঠিন মহিলা, কিন্তু তিনি যে হিরার চেয়েও কঠিন, পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন পদার্থের চেয়েও কঠিন, সেটা একটু একটু করে উদ্ঘাটিত হতে থাকে। এবং যতই দিন যায়, তখন আগের উপলব্ধিটাও যথেষ্ট ছিল না বলে মনে হয়। চৌধুরী সাহেব ভেবেছিলেন, আজাদের মা তাঁর দ্বিতীয় বিয়েটা মেনে নেবে। কেন নেবে না? তাকে তিনি অর্থে-অন্নে-বস্ত্রে রানীর হালেই রাখতে পারেন। তার বদলে এক বস্ত্রে বের হয়ে আজাদের মা কি ভিখিরিনীর মতো করে জীবন যাপন করতে পারবে? আজাদই কি পারবে এই রাজৈশ্বর্য ছেড়ে গিয়ে দীনহীন জীবন বেছে নিতে? নিশ্চয় পারবে না। তাদের ফিরে আসতেই হবে।

দিন যায়। চৌধুরীর মনোবাঞ্ছা পূরণ হয় না। আজাদের মার নমনীয় হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তিনি তাঁর অর্থসাহায্য গ্রহণ করা তো দূরের কথা, মুখটা পর্যন্ত দেখতে নারাজ।

আজাদ স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দেয়। তার কিছু ভালো লাগে না। বাবার কাছ থেকে যে-মাসোহারা পায়, সেই সময়ে সেই মাসোহারা তার পক্ষে অধঃপাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। মা তার এই মাসোহারার টাকা থেকে কিছুই নেবেন না, একটা পয়সা না, একটা দানা না। সে বন্ধুদের নিয়ে সিনেমা দেখে। গল্পের বই কেনে ইচ্ছামতো। সন্ধ্যার সময় রেস্টুরেন্টে বসে আড্ডা মারে। তার বন্ধুরা খেলাধুলা করে। সৈয়দ আশরাফুল হক, কাজী কামাল, ইব্রাহিম সাবের, রউফুল হাসান। তাদের সাথে সেও কখনও কখনও যায় মাঠে। সারা দুপুর ক্রিকেট খেলে। প্রায় প্রতিটা ইংরাজি ছবি দেখে। মাঝেমধ্যে চলে যায় শিকার করতে। সব হয়, শুধু স্কুলে যাওয়ার বেলায় তার দেখা নাই।

প্রথম প্রথম বহুদিন সে যায় নাই ইস্কাটনের বাসায়। মাসোহারার টাকা আনার জন্যে ওই বাসায় সে পাঠিয়ে দিত জায়েদকে। তার বইপত্র আর কত সংগ্রহের জিনিসপাতি সবই তো পড়ে আছে ইস্কাটনের বাসায়। কয়েক মাস পর থেকে সেসব আনতে মাঝেমধ্যে আজাদ যায় সেখানে। দেখা হয় নতুন মার সঙ্গে।

ভদ্রমহিলাও এক অদ্ভুত সংকটেই পড়েছেন। ভালোবেসে, মোহগ্রস্ত হয়ে, দিওয়ানা হয়ে-যেভাবেই হোক আত্মসংবরণ করতে না পেরে তিনি আগুনের টানে পতঙ্গের মতো ছুটে চলে এসেছেন চৌধুরীর ঘরে। তাঁর অতীতকে অবলীলায় ত্যাগ করে। এটাও কি একটা ত্যাগস্বীকার নয়? কিন্তু এ বাড়িতে পরিবেশ তেমন অনুকূল নয়। বাড়ির চাকর-বাকরেরা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না। আত্মীয়স্বজনরা তাঁর দিকে কেমন রোষের দৃষ্টিতে তাকায়। তিনি চান সবার চিত্ত জয় করতে। কিন্তু সে চেষ্টা সুদূরপরাহত বলে মনে হয়।

আজাদ এ বাসায় এলে তিনি চেষ্টা করেন তাকে পটানোর। বলেন, কী খাবে? কী লাগবে? কিছু কিনে দেব?

আজাদ তাঁর কথার জবাব দেয় না। গোঁ ধরে থাকে। বেশি পীড়াপীড়ি করলে বাসা থেকে চলে যায়।

যেমন মা তেমনি ছেলেরে বাবা!

চৌধুরীর দ্বিতীয় বিয়ের ৫ মাসের মাথায় ফরাশগঞ্জের বাড়িতে একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে। জায়েদের সে-সময়টা এখনও মনে আছে। সে খুবই ছোট তখন। বালক বয়স। শেরে বাংলা ফজলুল হক মারা গেছেন। সমস্ত প্রদেশে শোকের ছায়া। এদিকে ফুটো পয়সা উঠে যাচ্ছে। প্রবর্তিত হচ্ছে নয়া পয়সা। জায়েদ নয়া পয়সার হিসাব শিখছে কাগজকলম নিয়ে। কাগজে ফুটো পয়সা আর নয়া পয়সা গোল গোল করে এঁকে এঁকে তাকে শিখতে হচ্ছে ৬ পয়সায় এক আনা, ১২ পয়সায় দুই আনা, ৫০ পয়সায় আট আনা। ১০০ পয়সায় ১ টাকা। এই হিসাবের ফেরে পড়ে একদিন সে মুশকিলেও পড়েছিল, তার মনে আছে। আট আনা হলে হয় ৫০ পয়সা। সে এক আনা এক আনা করে ৮ আনা জোগাড় করেছে। একটা ৫ পয়সা আরেকটা ১ পয়সা মানে এক আনা। এভাবে আটবার । তাহলে তো আটআনাই হলো। একটা সিনেমার টিকেটের দাম আটআনা। কিন্তু সিনেমা হলে গিয়ে দেখা গেল পয়সা কম পড়ে গেছে। কারণ একটা ১ পয়সা পকেটের কোন ফাঁক দিয়ে গেছে পড়ে। আর ৬ পয়সা করে আট আনায় হয় ৪৮ পয়সা। এক পয়সা পড়ে যাওয়ায় তার কাছে আছে ৪৭ পয়সা। হলের কাউন্টার ছিল ফাঁকা। টিকেট বিক্রেতা বুড়োটা বলে, তিন পাইসা কম। টিকেট নেহি মিলে গা। এক পয়সা কম কী করে তিন পাইসা কম হলো, জায়েদ বুঝতে পারে না।

ঠিক সেই সময় হঠাৎ বাসায় চিলাচিলি;-জায়েদের মা মইরা যাইতেছে।

মা কেন মারা গেল, কীভাবে, জায়েদ সেই রহস্য আজো ভেদ করতে পারে না। তবে তার মৃত্যুটা স্বাভাবিক ছিল না, আজ তার মনে হয়। তার বাবা আর চৌধুরী ছিল ভাই আর বন্ধু। আর তার মা আর আজাদের মা ছিল বোন আর হরিহর আত্মা। আজাদের মাকে বশীভূত করার জন্যে হয়তো কেউ প্রয়োজন মনে করেছিল তাঁকে একলা করে ফেলার। হয়তো সেজন্যেই জায়েদের মাকে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হয়েছে। এ সবই আজ জায়েদের সন্দেহ হয়। তখন সে ছিল অনেক ছোট। বালক মাত্র। কিছু বুঝতে পারে নাই। শুধু মনে আছে সে গিয়ে দেখতে পায় মা শুয়ে আছে আর তার শরীরটা সম্পূর্ণ নীল। আর এরপরে বহুদিন জায়েদ সবকিছুকে নীল দেখত। তার মনে আছে, আম্মা মানে আজাদ দাদার মা নিজহাতে গোসল করালেন মাকে, কাফনের কাপড় পরালেন। সেই কাফনের কাপড়টাকে পর্যন্ত নীল দেখাচ্ছে। আগরবাতি জ্বলছে। তা থেকে বেরুচ্ছে নীল রঙের ধোঁয়া। ভাইবোনেরা, আত্মীয়স্বজন মহিলারা কাঁদছে। কিন্তু আম্মা কাঁদছেন না। তিনি কাফন পরানো শেষে কোরান শরিফ নিয়ে বসলেন।

তাঁর এককোলে জায়েদের ৯ মাস ৭ দিন বয়সের ছোট ভাই লিমন। তারপর এক সময় মাকে নিয়ে যাবার জন্যে খাটিয়া তোলা হয় চার জনের কাঁধে। জায়েদকেও বলা হয়, বাবা, তোমার মা যাইতাছে, তুমিও একটু কাঁধ লাগাইবা নি? সে তো তখন অন্য বাহকদের বুক সমান। সে কী করে কাঁধ দেবে, সে কিছুই বুঝতে পারে না। শুধু দেখতে পায় নীল রঙের খাটিয়ায় নীল কাফনে মোড়ানো তার মা যায়।

আজাদের মার ঘাড়ে এসে পড়ে ছোট্ট লিমন আর জায়েদ, মহুয়া, চঞ্চল, কচি, টিসু-বোনের ছেলেমেয়েরা। আর এদের বড় ভাই আজাদ। জায়েদের বাবাও এই বাড়িতে আসা আর খোঁজখবর করা ছেড়ে দেয়। তিনিও অন্য কোথাও অন্য কোনো মধুকুঞ্জের সন্ধান পেয়ে গেছেন কিনা, জায়েদ ছিল ছোট, সে বুঝতে পারে না। আজাদের মা কথা বলেন না, কিন্তু ছেলেমেয়েদের বুক দিয়ে আগলে রাখেন।

জায়েদের মা মারা যাবার পরে আজাদের মা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন, নিরবলম্বও। কিন্তু তিনি ভেঙে পড়েন না। মচকানো তো দূরের কথা।

ইউনুস চৌধুরীর পক্ষ থেকে আবার মীমাংসার প্রস্তাব পাঠানো হয় সাফিয়া বেগমের কাছে। তাঁকে সসম্মানে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, এ গ্যারান্টি দেওয়া হয়। কিন্তু আজাদের মা রাজি হন না। তাঁর জবান, এক জবান। তিনি চৌধুরীকে তো আগেই বলে দিয়েছিলেন চৌধুরী যদি ওই বিয়ে করেন, তবে তাঁর মরা মুখটাও চৌধুরী দেখতে পাবেন না। এই কথার কোনো নড়চড় তাঁর জীবদ্দশায় তো হবেই না, মৃত্যুর পরেও হবে না। সাফিয়া বেগমের এ কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল।

চৌধুরী ক্ষিপ্ত হন। সমস্তটা ঢাকা শহর তাঁর হাতের মুঠোয়। তিনি ইচ্ছা করলে এই ঢাকা শহরটার যাকে ইচ্ছা তাকে কিনে ফেলতে পারেন। প্রদেশের গভর্নর তাঁর বন্ধু, সেক্রেটারিরা তাঁর গেলাস-বান্ধব। হুজ হু-তে তাঁর নাম উঠেছেঃ আ জমিনডার ফ্রম বিক্রমপুর। আর কিনা একটা ছোটখাটো মহিলা তাঁর কথা শুনছে না। এত জিদ! এত জিদ! এখন তো সার্বক্ষণিক পরামর্শদাত্রী কুটনি বোনটাও নাই। তাহলে সে কেন আসে না? চৌধুরীর পানাসক্তি আরো বেড়ে যায়।

আজাদের মা সাধারণত কথা বলেন না। কিন্তু একদিন তিনি আজাদকে বলেন, বাবা, কথা আছে, আয়। বস।

আজাদ মার কাছে যায়। বিছানায় বসে।

'তুই নাকি স্কুল ছেড়ে দিয়েছিস?'

আজাদ উত্তর দেয় না।

'কাল থেকে আবার স্কুল যাবি।'

'এখন আর যাওয়া যাবে না। পরীক্ষা দেই নাই। টিউশন ফি দেই না কয়মাস। নাম কেটে দিয়েছে।'

'তাহলে তুই কী করবি? মূর্খ হয়ে থাকবি?'

আজাদ চুপ করে থাকে।

মা বলেন, তুই ছাড়া আমার আছে কে? আমি তো মরেই যেতাম। বেঁচে আছি কেন? তোকে মানুষ করার জন্যে। তুই যদি মানুষ না হবি, তাহলে আমি আর বাঁচি কেন?

আজাদ কেঁদে ফেলে। আসলেই তার খুবই অনুশোচনা হচ্ছিল কদিন থেকে! কী করছে সে? সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে আজো ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে অন্ধ পিটার, হাত দুটো সামনে মেলে ধরে হাতড়ে হাতড়ে পথ হাঁটে যে পিটার, সেও তার কাজ ঠিকভাবে করে চলেছে, ওই তো এখনও ঘণ্টাধ্বনি আসছে স্কুল থেকে, কত কষ্ট করেই না ঘণ্টাটা দড়ি টেনে টেনে রোজ তোলে পিটার, অথচ সে কিনা চোখ থাকতেও পথ খুঁজে পাচ্ছে না। পড়াশোনা বাদ দিয়ে কী করবে সে?

সে বলে, আমার ফ্রেন্ডদের সাথেই আমি মেট্রিক পাস করব।

মা জিজ্ঞেস করেন, কেমন করে?

'প্রাইভেটে এই বছরই ম্যাট্রিক দিব।'

মার মুখে মৃদু একটা হাসি ফুটে ওঠে।

আজাদ মার কাছে কথা দিয়েছে, বন্ধুদের সঙ্গেই সে এই বছরে মেট্রিক পাস করবে। এ-কথা তো তাকে এখন রাখতেই হবে। আরপি সাহার স্কুল থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে নাম তালিকাভুক্ত করায় সে। তারপর ধুমসে পড়া শুরু করে। বই কেনে। টিউটর রাখে। মা তাঁর সোনার গয়নার সঞ্চয় ভেঙে টিউটরের টাকা যোগাড় করেন। বাবার মাসোহারা থেকেও তো টাকা ভালোই আসে। আজাদের বন্ধুরা অবাক হয়ে যায়। বড়লোকের বখে যাওয়া ছেলে পেয়ে যারা এতদিন তার কাছে ঘুরঘুর করত, তাদের সঙ্গ এখন আর ভালো লাগে না আজাদের। তারাও পরিস্থিতি বুঝে বিকল্পের সন্ধানে কেটে পড়ে। পরীক্ষার সময় নিকটবর্তী হয়। একদিন আজাদ এসে কদমবুসি করে মাকে। মা, দোয়া করো। টাঙ্গাইল যাচ্ছি। পরীক্ষা শেষ করে তারপর আসব।

মা ছেলের মাথায় হাত রাখেন। তাঁর ছেলে ম্যাট্রিক দিচ্ছে। এই দুঃখের দিনে এটা কত বড় আনন্দের সংবাদ। তিনি ছেলেকে কাঁধে ধরে দাঁড় করিয়ে দেন। ছেলের মাথায় হাত রাখেন। বলেন, আমার দোয়া তো আছেই। ইনশালাহ্ তুই ভালোভাবে পাস করবি।

ছেলের মুখের দিকে একবার অলক্ষ্যে তাকান মা। ছেলের নাকের নিচে গোঁফের রেখা। কণ্ঠস্বর ভাঙা ভাঙা। মুখে একটা দুটো ব্রণ। চুলে আবার একটুখানি টেরির লক্ষণ। ছেলে তাঁর বড় হয়ে যাচ্ছে। হোক! তাই তো তিনি চান। এই ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে এই পৃথিবীর বুকে দাঁড় করাতে পারলেই তাঁর সব কষ্টের অবসান হবে। তিনি আলাহতালার কাছে আর কিছু চান না।

'কী মা, কী ভাবো?'

ছেলের প্রশ্নে সংবিৎ ফিরে পান মা। আলাহ্ বলে একটা গোপন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন। বলেন, তোর কিছু লাগলে আমাকে বল।

'আমার আবার কী লাগবে? যা লাগে সবই তো কিনেছি। প্রাকটিক্যাল খাতা কিনলাম, টেস্ট পেপার কিনলাম। বাদ তো রাখি না কিছু।'

'তুই ভালো করে পাস কর। তোকে কম্পিট স্যুট বানিয়ে দেব।'

'আরে আমি কম্পিট দিয়া কী করব?' আজাদ হাসে। মনে মনে খুশি হয়। মায়ের মনোভাবটা সেও বোঝে, তারা এখন বাবার সাহায্য ছাড়া বেশ অর্থকষ্টের মধ্যে আছে, এটা তিনি বাইরের কাউকে বুঝতে দিতে চান না। বাইরের লোকদের কাছে তারা মাথাটা উঁচু করেই রাখতে চায়।

আজাদ পাস করে সেকেন্ড ডিভিশনে। রেজাল্টের দিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। রেজাল্ট দেখার জন্য তারা যায় বোর্ড অফিসে। দেয়ালে রেজাল্ট শিট টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকজন ছাতা মাথায় তাই দেখছে। তার সঙ্গে ফারুক নামের আরেকজন বন্ধু টাঙ্গাইল গিয়েছিল পরীক্ষা দিতে। দুইজনে দুরুদুরু বক্ষে গিয়ে একদৌড়ে দেয়ালের পাশে সারি সারি কালো ছাতাগুলোর নিচে ঢুকে পড়ে। আজাদের খুবই ভয় লাগছিল। নিজের জন্য নয়। মার জন্য। যদি সে ফেইল করে, মা বড় আঘাত পাবেন। এটা কেবল তার ম্যাট্রিক পাস করা বা ফেইল করার ব্যাপার নয়, মার ব্যক্তিগত জেদের লড়াইয়ের প্রশ্ন। সে ফেইল করলে তার বাবা কী হাসিটাই না হাসবে! মার বুকে সেই বিদ্রূপটা কী ভয়ঙ্কর শেল হয়েই না বিদ্ধ হবে! কোথায় রোল তার? থার্ড ডিভিশনের ঘর দেখে। পাওয়া যায় না। আজাদ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে! তার শ্বাস ঘন হয়ে ওঠে। সে বার বার জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে থাকে। এটা কি হতে পারে, সে ফেইল করবে? জিওগ্রাফি এক্সামটা তত ভালো হয় নাই, তাই বলে ফেইল। শেষে মরিয়া হয়ে তাকায় সেকেন্ড ডিভিশনের ঘরে। বিড়বিড় করে পড়ছে ইন্নালিলাহে....রাজেউন, কোনো কিছু হারিয়ে গেলে খুঁজে পাবার দোয়া, ওই তো

রোল নম্বর আরপি ৩৬৩৪। সেকেন্ড ডিভিশনের ঘরে। ওহ! মা! সে ছুটতে থাকে। তার সাথের বন্ধুটির রেজাল্ট কী তা না জেনেই। তাকে সঙ্গে না নিয়েই। বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে।

তার বন্ধুটি, ফারুক, এই কথা আর কোনোদিন ভুলতে পারবে না।

মা, মা, মা কোথায়, কয়তলায়, মা, কচি মা কোথায়, মহুয়া মা কোথায়, মা। আজাদ দৌড়ে যায়, মার ঘরে মা নাই। কোথায় গেছে, ওজু করতে, কই? এই যে মা, আমার রেজাল্ট হইছে, আমি পাস করছি, সেকেন্ড ডিভিশন, আজাদ মাকে কদমবুসি করতে যায়, মা তাকে টেনে তোলেন, আলহামদুলিল্লাহ, তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন, না, তার চোখে হাসি ঝিলিক দেয় না, না তার চোখে অশ্রু ঝরে না, তিনি নিজেকে সামলে নেন। তিনি শান্তস্বরে বলেন, তুই তো পাস করবি, তোর ব্রেন ভালো না!

আজাদ বোকার মতো হাসে। মা যে কী বলে! আরেকটু হলে তো গিয়েছিলই।

'শোন তুই এক কাজ কর, ১০ সের মিষ্টি কিনে আন। মরণচাঁদ থেকে কিনিস, আজেবাজে মিষ্টি কিনবি না।' তিনি তাঁর ড্রয়ারের কাছে যান। টাকা বের করেন। 'মিষ্টি কিনে নিয়ে ইস্কাটন যাবি, তোর দাদির হাতে দিবি, দাদিকে সালাম করবি, দাদার হাতে দিবি, দাদাকে সালাম করবি। বুঝিয়ে বলবি, কিসের মিষ্টি।'

আজাদ অবাক হয়। সে ভাবতেও পারে নাই, মা তাকে ইস্কাটন যেতে বলতে পারেন।

আজাদ মিষ্টির দোকানে যায়। সঙ্গে জায়েদ। মিষ্টির দোকানে বসেই জায়েদ কয়েক পদের মিষ্টি সাবাড় করে। কয়েক সের মিষ্টি কেনে তারা। মিষ্টির ঠোঙা নিয়ে তারা প্রথমে আসে ফরাশগঞ্জের বাসায়। মাকে প্রথমে মিষ্টিমুখ করানো দরকার। মা তো কোনো কিছু খেতেই চান না। আমিষ খাওয়া ছেড়েছেন সেই যে ইস্কাটন ছাড়ার পর থেকে, আর ধরেন নাই। মা, একটু খাও। এই বাসার জন্যে একটু মিষ্টি কিনলাম। বুঝলা না, ওই বাসার আগে তো এই বাসার লোকদের মিষ্টিমুখ করানো দরকার।

মা মিষ্টি দেখে মুখ সরিয়ে নেন। নারে, খেতে ইচ্ছা করে না।

'অল্প খাও। অল্প।' আজাদ নাছোড়।

মা একটুখানি মিষ্টি মুখে দেন। বলেন, এই দুটো ঠোঙা রেখে দে। পাড়াপড়শিদের দিতে হবে। ভালো খবর। সবাই জানুক। আর এখানে কত? ১০ সের। এগুলো নিয়ে ইস্কাটনে যা। আজকে সবার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলবি। আজকে আমাদের হাসার দিন।

১০ সের মিষ্টি নিয়ে আজাদ ইস্কাটনের বাসার সামনে নামে। কতদিন পরে এ বাড়িতে আসা হলো তার। এটা যে তাদের বাড়ি, অনভ্যাসে সেটা মনেও হয় নাই এ কদিন। আশ্চর্য। না, সে হরিণগুলোর দিকে তাকাবে না, রাজহাঁসগুলোর দিকে না, তার স্প্যানিয়েল ডগি টমির দিকে না।

সে সোজা দাদা-দাদির ঘরে যায়। দাদির সামনে মিষ্টির প্যাকেটগুলো রাখে। দাদিকে সালাম করে। 'আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। তার মিষ্টি রেখে গেলাম।'

'এতগুলা মিষ্টি আনা লাগে। খালি টাকা খরচ।' দাদি বলেন।

'আর নাই তো। রেজাল্ট হয়েছে তো, সবাই মিষ্টির দোকানে ভিড় করছে। যা পেয়েছি এনে দিলাম। কম হলে বলো। কালকে আরো এনে দেব।'

'দুরো আভাগা। আমি কী কই, হে কী বুঝে।'

বাসার বাবুর্চি, কাজের লোক, পরিচারিকারা সবাই আড়ালে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করে ঘটনাটা। আজকে কেন ভাইয়া এতদিন পরে এ বাড়িতে এল। তাহলে কি বেগম সাহেবা ফিরে আসবেন আবার?

তারা উঁকিঝুঁকি দিয়ে ঘটনার তাৎপর্য বুঝে ফেলে। ছোট সাহেবে মেট্রিক পাস দিছে।

ছোটমার কাছে খবর যায়। ছোট সাহেবে আসছে। মিষ্টি আনছে মেলা। উনি ম্যাট্রিক পাস দিছে।

বেরিয়ে যাবার পথে ছোটমার সাথে দেখা হয় আজাদের। তিনি হাসিমুখে বলেন, বাবা, তুমি পাস করেছ, আমি খুব খুশি হয়েছি। বসো। একটু মিষ্টি খেয়ে যাও।

আজাদ তাঁকে আগে থেকেই চেনে। বড়মা বলে তাঁর কাছ থেকে আগে আদরও নিয়েছে। আজকে তার কেমন যেন লাগে। কিন্তু তার মনে হয়, মা যে আজকে এ বাড়িতে মিষ্টি দিয়ে পাঠিয়েছেন, এ তো তার বিজয় উদযাপন করবার জন্যই। অসুবিধা কী ছোটমার কথা শুনতে!

আজাদ বসে। ছোটমা বলেন, তুমি কোনদিকে যাবা এখন?

এই তো গু লিস্তানের দিকে।

আমিও ওই দিকে যাচ্ছি। তুমি আমার সাথে চলো।

না আমি একলাই যেতে পারব।

আরে না চলো তো।

ছোটমা গাড়ি বের করেন। নিজেই তিনি ড্রাইভ করছেন। আজাদকে পাশে বসান। মহিলার পাশে বসে তার নিজেকে সিনেমায় দেখা কোনো চরিত্র বলে মনে হয়। ঢাকার রাস্তায় মহিলারা সাধারণত গাড়ি চালায় না। ইনি চালাচ্ছেন। দুপাশের লোকেরা বেশ কৌতূহল নিয়েই তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ছোটমা গু লিস্তানের আগে বিজয়নগরের ভোগ দোকানের সামনে গাড়ি থামান। বলেন, আসো। তুমি না লং পে-পছন্দ করো। তোমাকে লং পে-কিনে দেই।

'না লাগবে না।'

'আরে আসো তো।'

আজাদ ভাবে, ছোটমাকে জব্দ করব। যত এলভিস প্রিসলি আছে, সব কিনব। দেখি কী করে।

দোকানে ঢুকে একটার পর একটা এলভিস প্রিসলি নামাতে থাকে আজাদ। দুহাত ভরে যায়। দোকানদাররা বিস্মিত। ছোট মা অবিচলিত। কত দাম এসেছে?

দোকানি দাম হিসাব কষতে গিয়ে গলদঘর্ম। দেড় হাজার রুপিয়া বেগম সাব।

ছোটমা ব্যাগ থেকে চেক বের করে খসখস করে সিগনেচার করে দেন।

আজাদ মনে মনে খুশি হয়। এই রেকর্ডগু লো তার খুব প্রিয়। এগু লো সে অনেকবার যোগাড় করতে চেয়েছে। শুধু জায়েদকে দিয়ে ও বাসা থেকে তার নিজের রেকর্ড পেস্নয়ারটা আনিয়ে নিতে হবে। তবে মাকে এ ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না। ব্যাপারটা স্ট্রেইট চেপে যেতে হবে।

১০

ইউনুস চৌধুরী আজকে বাসাতেই বসেছেন সন্ধ্যাটা যাপন করতে। বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করেছে বাইরে। তিনি বাগানে বসেছেন গার্ডেন-চেয়ার নিয়ে। বেয়ারা তৎপর। বরফ আসছে। পানীয় ঢালা হচ্ছে। চৌধুরীকে আজ সঙ্গ দিচ্ছেন তার বন্ধু খালাত ভাই রতন চৌধুরী। আকাশের গায়ে একটা প্রায় পূর্ণ চাঁদ। ইউনুস চৌধুরী তার দিকে তাকিয়ে আছেন। রাত দশটার পরে তাঁর নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তিনি নিজের চুল ধরে নিজেই টানতে থাকেন।

'রতন।'

'ভাইজান।'

'সাফিয়া কি আমার বাধ্য হবে না?'

'ভাইজান।'

'আমার ছেলেকে কি আমি আর ফিরে পাব না?'

'আপনার তো আরেকটা ছেলে হয়েছে ভাইজান। ছোট ভাবি তো মা হয়েছেন!'

'কিন্তু আমার আজাদকে কি আমি পাব না?'

'আজাদ তো আপনার আছেই ভাইজান। ও তো ম্যাট্রিক পাস করেই এসেছিল। বাপকে কি কোনো ছেলে ভুলতে পারে? রক্তের টান বংশের ধারা কোথায় যাবে?'

'কিন্তু সারেঙের মেয়েটা কি আমার কথা শুনবে না?'

'শুনবে। শুনবে।'

'কবে?'

'কোনো বাঘই তো প্রথমে বশ মানে না। সার্কাসের বাঘের কথা বলছি। বাঘকে ধরে ইলেক্ট্রিক পাওয়ারঅলা চাবুক দিয়ে ভয় দেখানো হয়। আঘাত খেয়ে খেয়ে তারপর বাঘ বশ মানে।'

'বাট হোয়েন উইল শি গিভ ইন?'

'টুডে অর টুমরো।'

'তোমার টুডে কবে আসবে?'

'টুমরো।'

'তোমার টুমরো কবে আসবে। দি ডে আফটার টুমরো?'

'ভাইজান। এক কাজ করেন। ফরাশগঞ্জের বাসা থেকে ওদের উৎখাত করে দেন।'

'বলো কী? আজাদ আমার ছেলে না?'

'আজাদকে বলেন এ বাসায় এসে থাকতে।'

'সাফিয়াও তো আমার ওয়াইফ।'

'তাকেও তো আমরা এ বাসায় এসে থাকতে বলছি।'

'তুমি বলছ বাসা থেকে তাড়িয়ে দিলে তারা নরম হবে।'

'অবশ্যই। তেজ কমে যাবে।'

'কীভাবে তাড়াব? আজাদ তো রিভলভার নিয়ে আমাকে মারতে আসবে। ছেলেটা একদম মা-নেওটা হয়েছে। আনলাইক মি।'

'আপনার বাবা-মাও তো আপনার সাথেই আছে। আপনি তাদের যথেষ্ট ভক্তি করেন।'

'করি। জন্মদাতা বাপ, জন্মদাত্রী মা। না করে পারব। কিন্তু সে তো বাপ মানে না।'

'মানে। তবে মাকে বেশি মানে।'

'শোনো। আই এম এ জমিনডার ফ্রম বিক্রমপুর। আমার টাকা আছে। আমার পাওয়ার আছে। আমার মেয়েমানুষ থাকবে। থাকবে না?'

'জি!''

'জমিদারদের মেয়েমানুষ থাকত কিনা!'

'হক সাহেব তো জমিদারি রাখল না। কৃষক প্রজা পার্টি করল।'

'এখন হক সাহেব কোথায়? হয়ার ইজ হি নাউ!'

'ভাইজান আর খাবেন না। ওঠেন।'

'আরে নাইট ইজ স্টিল ইয়ং। বসো বসো।'

'ভাবি রাগ করবেন।'

'কেন করবে। সে জেনেশুনে আমার কাছে এসেছে। শোনো। আজাদকে বলে দাও সে জমিদারের ছেলে। তারও চালচলন হবে জমিদারের মতো।'

'সে তো জমিদারের ছেলে না। সে ইঞ্জিনিয়ারের ছেলে।'
'কিসের ইঞ্জিনিয়ার? আই এম নো মোর ইঞ্জিনিয়ার।'
'দেন ইউ আর আ বিজনেসম্যান। সদাগর। আপনার ফিউডাল নেচার তার রক্তে যাবে কেন?'
'বুর্জোয়ারাও ধোওয়া তুলসিপাতা নয়। ক্যাপিটালিজম মানে হচ্ছে পাপ। তুমি পাপি। আমি পাপি।'

'আপনি পাপি। আমি না।'
'কী! চোপ শালা! আয়ুব খানের পাকিস্তানে কোনো পাপ নাই। নো ওয়াইন। নো ক্রাইম। চোপ শালা।'
'এই শালা বলবি না শালা!'
গার্ডেন চেয়ার উল্টে পড়ে। গেলাস কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে চোপ শালা চোপ শালা বলে চলেন। বেয়ারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।
চাঁদের নিচ দিয়ে মেঘেরা এমনভাবে উড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে চাঁদটাই দৌড় ধরেছে। বাগান জুড়ে নানা মৌসুমী ফুলে সুঘ্রাণ। দুজন মধ্যবয়স্ক লোক গালাগালি ছেড়ে এখন গলাগলি করে দাঁড়িয়ে আছে।

১১

আজাদ আইএ পড়ার জন্যে ভর্তি হয় সিদ্ধেশ্বরী কলেজে। কলেজে পড়ে, নাজ কিংবা গুলিস্তান হলে ছবি দেখে, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়। সে খুবই ভক্ত এলভিস প্রিসলির। ছোটবেলা থেকেই খুব কমিকস পড়ে। বড় হতে হতে সাহিত্যের প্রতি তার আগ্রহ জন্মে। প্রচুর উপন্যাস পড়েছে, বাংলা উপন্যাস, ইংরাজি উপন্যাস। এরমধ্যে মিলস এন্ড বুন থেকে শুরু করে পেঙ্গুইন ক্লাসিক্স। লরেন্স থেকে টলস্টয় ডস্টয়ভস্কি পর্যন্ত। বঙ্কিম থেকে শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ।
সিনেমা দেখতে গেলে তার সঙ্গী হয় জায়েদ। অন্য বন্ধুরাও হয় কখনও কখনও। তবে তার আশ্চর্য লাগে বড়লোক বন্ধুদের। আজাদরা ফরাশগঞ্জের বাড়িতে চলে আসার পর তার অনেক বড়লোকের ছেলে বন্ধু তাকে এড়িয়ে চলে। যেন তার সঙ্গে মিশলে তাদের জাত চলে যাবে। আশ্চর্য তো।
জায়েদের মা নাই। তারা পাঁচ পাঁচটা বাচ্চা এ বাড়িতেই থাকে। সাফিয়া বেগমকেই সব দেখাশোনা করতে হয়। তাদের খাওয়া-দাওয়া, পড়াশোনার খরচের ব্যাপার আছে। সাফিয়া বেগমকে একটু একটু করে গয়না বিক্রি করে টাকা পয়সা যোগাড় করতে হয়।
এর মধ্যে আজাদ বাবার কাছ থেকে তার মাসোহারা পায়। মাসে মাসে টাকাটা ওঠাতে যায় জায়েদ। জায়েদও স্কুলে যায়। লেখাপড়া করে। তবে পড়াশোনার দিকে তার তেমন মনোযোগ নাই।
একদিনের ঘটনা। বাসায় চাল নাই। হঠাৎ রাতে চাল শেষ হয়ে গেছে। রাতের বেলা আজাদের আরেক খালা এসেছে, আরো অতিথি এসেছে। অতিরিক্ত রাঁধা হয়ে গেছে। কিন্তু কেউ খেয়াল করে নাই। সকালবেলা চাল কিনতে হবে। রেশনের দোকানে যেতে হবে। আজাদের মার কাছে নগদ টাকা নাই। রেশনটা না তুললে আবার দোকান থেকে বেশি দাম দিয়ে কিনতে হবে। আর নাহলে দুপুরে আজকে হাঁড়ি উঠবে না চুলায়।
আজাদের মা বলেন, জায়েদ কী করি, বল তো!
জায়েদ বলে, আমার কাছে কিছু টাকা জমানো আছে। আমি রেশন নিয়া আসি।
আপনি পরে দিয়েন আম্মা।
তাইলে তাই কর।

জায়েদের কিন্তু ভরসা আজাদ। আজাদের কাছে হাতখরচের টাকা থাকে। সেখান থেকে ধার নিতে হবে। তবে সেটা আম্মাকে জানানো যাবে না। চৌধুরীর টাকা শুনলে আম্মা সেই টাকায় কেনা অন্ন স্পর্শ করবেন না।

জায়েদ গিয়ে ধরে আজাদকে। দাদা, কিছু টাকা ধার দেও তো।

'কত?'

'দেও না।'

'কী করবি? সিনেমা দেখবি?'

'না। বাজার সদাই করব।'

ÔAv"Qv Pj| GK RvqMvq UvKv cvB| Z‡j Awb|Õ

AvRv` Avi Rv‡q` †ei nq| Avjx bv‡g GK‡jv‡Ki Kv‡Q AvRv‡`i gv‡mvnvivi UvKv _v‡K| †mLvb †_‡K wKw¯‡Z wKw¯‡Z UvKvUv †Zvjv nq| Z‡e G gv‡mi †kl wKw¯i UvKvUv Avjx wVKg‡Zv †`q bvB| Rv‡q`‡K Ah_v †Nvivi‡"Q|

Avjx e‡mwQj Mw`‡Z| AvRv`‡K †`‡L ZU¯ nq| GB †Pqvi †`| Av‡i g‡Q †`| fvBqv e‡mb| Kx Lv‡eb? Pv AvbvB| †jg‡bW Lv‡eb?

UvKvUv `vI| hvB Mv|

১০০ টাকা পাওয়া যায়। নিয়ে আজাদ আর জায়েদ বের হয়। সদরঘাট থেকে বাংলাবাজার। বটগাছটার নিচে একটা বড় বইয়ের দোকান। হিউবার্ট নামে এক এংলো-ইন্ডিয়ান এটা চালান। আজাদকে দেখেই তিনি গুড মর্নিং বলে ওঠেন।

আজাদও গুড মর্নিং বলে সম্ভাষণের জবাব দেয়।

নয়া বই আসিয়াছে স্যার। হিউবার্ট বলেন।

আজাদ বই দেখায় মগ্ন। কী সব ইংরেজি বই। জায়েদ বইগুলোতে কোনো মজা পায় না। দাদা, যাইবা না, চলো।

যা, তুই ওই হোটেলে মাটন কাটলেট ভাজতেছে, খেয়ে আয় যা। নে, টাকা নে। জায়েদ তো খুশিতে লাফাতে লাফাতে বাতাসের আগে আগে ছুটে যায়।

এদিকে আজাদ বইয়ের মধ্যে মজা পেয়ে গেছে। সে একটার পরে একটা বই নামাচ্ছে। একটা মোটা ছবিওয়ালা বই পেয়ে সে পাগলের মতো খুশি হয়। দেখেন তো এই কয়টার দাম কত হয়?

দাম একশ টাকা ছাড়িয়ে যায়।

'আচ্ছা তাহলে এটা বাদ দেন। এখন দেখেন'-আজাদ একটা বই বাদ দিয়ে বাকিগুলো এগিয়ে দেয়।

'ওয়ান হান্ড্রেড ফোর'-হিউবার্ট বলেন।

আজাদ পকেট হাতড়ে খুচরো বের করে দাম মিটিয়ে দেয়।

জায়েদ আসে।

আজাদ তার হাতে বইয়ের বোঝা ধরিয়ে দিয়ে বলে, নে। যাই গা। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

তারা বাসায় ফেরে রিকশায়। জায়েদ বইগুলো দাদার ঘরে নামিয়ে দেয় । তারপর বলে, টাকা দেও।

'কিসের টাকা?'

'রেশন আনুম না?'

'ও। রেশনের টাকা। কত লাগে?'

'৫০ টাকা দেও।'

'অতো টাকা তো এখন নাই।'

'আরি এখনই না পাইলা!'

'হাতে করে কী আনলি!'

'বই।'

'বই কিনতে টাকা লাগে না?'

'এত টাকার বই তুমি আনলা!'

'তুইই তো বেটা বয়ে আনলি। দেখলি না কত ভারি।'

'অহন। আইজকা রেশন না আনলে তো ল্যাপস হইয়া যাইব।'

'আরে কিসের ল্যাপস হইব। কালকে আনিস।'

'আজকা খাইবা কী! চাউল নাই।'

'দোকান থেকে দুই সের চাউল কিনে আন। টেবিল ক্লথটার নিচে দেখ খুচরা পয়সা আছে। ঝাড় ঝাড়। দেখলি। নে। আজকার দিনটা পার কর। কালকের চিন্তা কাল।'

খুচরা পয়সা একসঙ্গে করে কম টাকা হয় না। জায়েদ বলে, চলব। কিন্তু তোমার মতোন পাগল দেখি নাই। চাউল কেনার টাকা যোগাড় কইরা কেউ বই কিনে?

আজাদ হাসে। 'আর তুই কী করেছিস। চাউল কেনার টাকা দিয়ে কাটলেট খেয়েছিস। ছি।'

জায়েদ লজ্জা পায়। সে দোকানের দিকে দৌড় ধরে। আজাদ হাসে। কিন্তু তার বুকের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম বেদনাও যেন সুচের মতো ফুটছে। আজকে মাকে চাউল কেনার টাকার কথাও ভাবতে হচ্ছে। অথচ মার নামে এই ফরাশগঞ্জের বাড়িটা, ওই ইস্কাটনের বাড়িটা। পৃথিবীটা কি একটা নাগরদোলা? মানুষ আজ ওপরে তো কাল নিচে! নিয়তির হাতের পুতুল মাত্র! তাদের ম্যাট্রিকের বাংলা ব্যাকরণে একটা সমাস পড়তে হয়েছে। রাজভিখিরি। যিনিই রাজা তিনিই ভিখিরি। বা রাজা হইয়াও যিনি ভিখিরি। তার মা কি তাই? যিনিই রানী তিনিই ভিখিরিনী!

এইসব হতাশা থেকেই বোধকরি আজাদ সিগারেটটা মজবুত-মতো ধরে ফেলে। তবে সে খায় সবচেয়ে দামি সিগারেট, বিদেশি ব্রান্ডের সিগারেট। চৌধুরী সাহেবের রক্তের ধারা আর যাবে কোথায়? আজাদ সিগারেট কেনার জন্যে স্টেডিয়ামে মোহামেডান ক্লাবের উল্টা দিকে রহমত মিয়ার বিখ্যাত দোকানে যায়, বিদেশী সিগারেট কেবল ওই দোকানেই পাওয়া যায় ঢাকায়। আড়াই টাকা দামের এক প্যাকেট সিগারেট কেনার জন্যে আড়াই টাকার ট্যাক্সি ভাড়া দিতে তার কার্পণ্য নাই।

সিদ্ধেশ্বরী কলেজ থেকে আজাদ আইএ পরীক্ষা দেয়। সেকেন্ড ডিভিশনে পাসও করে। এবার সে পড়বে কোথায়?

ঢাকার পরিস্থিতি বেশি সুবিধার নয়। ছাত্ররা নানা রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে জড়িত। তারা এখন তৎপর সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলন নিয়ে। সারাদেশে হরতাল পালিত হচ্ছে। শোভাযাত্রা-সমাবেশ এসব তো আছেই। তার ওপর বছরের শুরুতেই ঢাকায় সংঘটিত হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এখন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ছাত্ররা আবার সংগঠিত হচ্ছে। তাদের স্মৃতি থেকে দু বছর আগে ১৭ সেপ্টেম্বরে শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে হরতাল, মিছিলে গুলি, টিয়ারগ্যাস, লাঠিচার্জ, একজনের শাহাদত বরণ-এসব মুছে যায় নাই।

আজাদ একদিন আড্ডা দিতে গিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। কাদের যেন কর্মসূচি ছিল সেদিন, ওরা জানত না। মিছিল হচ্ছে, হঠাৎই শুরু হয় পুলিশের একশন। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। পালাতে গিয়ে একটা ড্রেনের মধ্যে পড়ে পা মচকে যায় আজাদের। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে আসে বাসায়।

জায়েদ এসে বলে, দাদা, পা টিপা দিমু।

'আরে না। মাথা খারাপ। তুলা দিয়ে নাড়লেও মরে যাব। উফ্ কী ব্যথা রে।'

'দাদা, এক কাম করি, কাইলকা যাই ইস্কাটনে, চৌধুরী সাবরে কই দাদার পাও ভাইঙা গেছে, ট্রিটমেন্ট করান লাগব, মালপানি ছাড়েন।'

'ভালো বুদ্ধি বের করেছিস তো। হ্যাঁ। কালকে যাবি।'

জায়েদ পরের দিন গিয়ে হাজির ইস্কাটনের বাসায়। দারোয়ান পথ আটকে দাঁড়ায়। কই যাইবেন?

'চৌধুরী সাবের লগে দেখা করুম।' জায়েদ বলে।

'ক্যান?'

'ছোট সাবে পাঠাইছে। হের পা ভাইঙা গেছে। হেই খবর দিতে হইব।'

দারোয়ান গেইট ছাড়ে। ভেতরে গিয়ে সে দাঁড়ায় চৌধুরী সাহেবের কাছে।

'সালামালেকুম খালু।'

'ওয়ালাউকুম। ক্যান আইছ?'

'আজাদ দাদা পাঠাইছে। হের পাও ভাঙছে।'

'পা ভেঙেছে। কী করে ভাঙল?'

'ইউনিভার্সিটিতে গেছল। গণ্ডগোল লাগছে। হে বেকায়দায় পইড়া পাও ভাইঙা ফেলাইছে।'

চৌধুরী সাহেবের ফরসা মুখটা সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে যায়। কিছুক্ষণ ভেবে তিনি বলেন, আজাদরে কও এই বাসায় এসে থাকতে!

'কমু নে। আইব না। আপনেরে টাকা দিবার কইছে।'

চৌধুরী সাহেব ভেতরে যান। জায়েদ বৈঠকখানায় দাঁড়িয়েই থাকে। টমি এসে তার গা শোঁকে। পরিচিত গন্ধ পেয়ে লেজ নাড়ে। একটু পরে কদম আলী এসে হাত বাড়িয়ে দেয়। তার হাতে টাকা।

জায়েদ জিজ্ঞেস করে, কত?

'এক হাজার। গইনা লও।'

জায়েদ টাকাটা গোনে। তারপর খুশি মনে বেরিয়ে যায়। আজাদ দাদার কাছ থেকে আজ মোটা অঙ্কের ভেট আদায় করা যাবে। অন্তত চার দিন সিনেমা দেখা যাবে ডিসিতে।

রাত্রিবেলা ঢাকা ক্লাবে আবার ইউনুস চৌধুরীর প্রথম পত্নীর জন্যে শোক উথলে ওঠে। তিনি গেলাসের পরে গেলাস উজাড় করতে করতে সামনে বসা এআই খানকে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা বলেন তো সাফিয়া বেগম কবে আমার পায়ের কাছে এসে পড়বে?

এআই খানের অবস্থাও তখন খারাপ। তিনি বলেন, পায়ের কাছে কেন পড়বে? হোয়াই এট দি ফিট। নো। ইউ হ্যাভ গট হার হেভেন আন্ডার ইয়োর ফিট। ইউ শুড নট এলাউ হার এনটারিং ইন টু দি হেভেন সো ইজিলি।

'সে তো কিছুতেই আমার কাছে আসছে না। একটা মহিলার কেন এত তেজ? কেন? আমি কী দেই নি তাকে? বাড়ি তার। ছেলে তার!'

এআই খান বুদ্ধি দেন, শোনেন, তার ছেলেকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন। সেন্ড হিম টু করাচি। মেক হার আইসোলেটেড। দেন শি উইল গিভ ইন। শি মাস্ট।

এরই মধ্যে আজাদের মায়ের কোল থেকে দু বছর বয়সী জায়েদের ছোট্ট ভাইটিকে এক রকম প্রায় কেড়েই নিয়ে গেছেন জায়েদের বাবা। বাচ্চাটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন গ্রামের বাড়িতে। সেই বাচ্চা মারা গেছে। সেই শোকে জায়েদ আর তার ভাইবোন আর আজাদের মা খুবই ভেঙে পড়েছে। একটা বাচ্চা যখন বাড়িতে থাকে, সে পুরোটা বাড়ি জুড়ে থাকে। এই বাড়িতেও লিমন ছিল সবার কোল জুড়ে। সে চলে

যাবার পরেই সবার মন ছিল খারাপ। তার ওপর সে মারা গেছে, এই খবর শুনে সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। বাসার ঠিকে ঝিটা পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে ওঠে, বাচ্চাটারে এইখান থাইকা নিয়া গিয়াই মাইরা ফেলল। কেমন পাষাণ বাবারে।

আজাদকে ঢাকা থেকে সরিয়ে দেওয়ার বুদ্ধিটা চৌধুরী সাহেবের মাথায় খেলে যায়। আজাদকে ঢাকায় রাখা যাবে না। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়ার পরিবেশ নাই। সক্ষম লোকের ছেলেমেয়ে কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে? আজাদকে করাচি পাঠাতে হবে। তাতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। ছেলেটার ভালো হবে। এই গণ্ডগোলের বাইরে থেকে সে ভালো করে লেখাপড়া করতে পারবে। তার জীবনের নিরাপত্তা থাকবে। আবার মায়ের কাছ থেকে ছেলেকে আলাদা করা যাবে। তখন দেখা যাবে, মা কী করে একা ঢাকায় থাকে। এখন আমি আজাদকে যে মাসোহারা দেই, সেটা নিশ্চয়ই আজাদ তার মা আর তার খালাত ভাইবোন পঙ্গপালের পেছনে ব্যয় করে। এটাও বন্ধ হবে। ছেলেকে করাচিতে যে খরচ পাঠাব, সেটা নিশ্চয় সে আর মার পেছনে ব্যয় করতে পারবে না।

চৌধুরী সাহেব আজাদের এক মামাকে ফোন করে আনান। তাঁকে আজাদ ডাকে পাতলা মামা বলে। বিক্রমপুরে যেহেতু বেশির ভাগ বিয়েই অত্মীয়দের মধ্যে হতো, কাজেই পাতলা মামা আবার পাতলা চাচাও হয়। চৌধুরী সাহেব আজাদের মার কাছে পাঠিয়ে দেন এই পাতলা মামাকে।

পাতলা মামা হাজির হন ফরাশগঞ্জের বাসায়। দেখা করেন সাফিয়া বেগমের সঙ্গে। তাঁকে বলেন, বুবু, ছেলে তো শুনছি আইএ পাস করছে। খুব খুশির খবর। আলহামদুলিল্লাহ। এবার ছেলেকে পড়াবা কই!

সাফিয়া বেগম বলেন, আজাদ তো বলে ঢাকা ইউনিভার্সিটিত পড়বে। সে তো সারাদিন ওই দিকে ঘুরঘুর করে।

পাতলা মামা বলেন, না না না না। এইখানে আজাদের থাকাটা ঠিক হবে না। বিশেষ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়া একদম অনুচিত হবে। দেশের পরিস্থিতি ভালো না। আরো খারাপ হবে। ভদ্রলোকের ছেলেরা তো ঢাকায় পড়ে না।

'তাহলে তারা কই কই পড়ে?' আজাদের মার চোখেমুখে উদ্বেগ!

পাতলা মামা একটা পানের খিলি মুখে পুরে বুড়ো আঙুলে চুন লাগিয়ে সেটা নিজের জিভে লাগান। তারপর আঙুলে লেগে থাকা চুনের অবশিষ্টটা গোপনে টেবিলের নিচে মুছতে মুছতে বলেন, করাচি। ভদ্রলোকের ছেলেরা পড়ে করাচিতে।

সাফিয়া বেগমের মুখটা সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে পড়ে। এই কথা তাঁর প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ। করাচিতে ছেলেকে পাঠিয়ে তিনি একা একা কী করে থাকবেন? আর খরচই বা আসবে কোত্থেকে?

পাতলা মামা বলে চলেন, 'করাচিতে পড়ার খরচ যা লাগে, তাতো আজাদের বাবার কাছ থাইকাই আদায় করা যাবে। আপনি আজাদের বাবার কাছ থাইকা দূরে সইরা আসছেন, তাই বইলা তো বাবার ওপর থাইকা আজাদের হক চইলা যায় না। আর মাসের হাতখরচ অর বাবা অরে যা দেয়, তা একটু বাড়ায়া দিলেই তো আজাদের করাচির খরচ হইয়া যায়।'

আজাদের মা তাঁর ভাইয়ের এ প্রস্তাবটা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন। আসলেই এখানে থাকলে আজাদের লেখাপড়া হবে না। এমনিতে তার বন্ধুবান্ধব বেশি। তাদের সবার স্বভাব-চরিত্র যে এক রকম তা নয়। তার ওপর আবার দেশের যা পরিস্থিতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্নিগর্ভ হয়ে আছে। ছেলেকে করাচি পাঠানোই ভালো। তিনি বলেন, পাঠাতে পারলে তো খারাপ হতো না। কিন্তু আমার পক্ষে কারো কাছে কোনো সাহায্য চাওয়া সম্ভব না।

তাইলে আমি এরেঞ্জ করি-পাতলা মামা বলেন, চৌধুরী এতে আপত্তি করবে বইলা মনে হয় না।

পাতলা মামা আজাদের করাচি যাওয়ার সব ব্যবস্থাই পাকাপোক্ত করে ফেলেন।

আজাদের পাতে ভাত তুলে দিচ্ছেন মা। আজাদ ভাতের দলা ভাঙছে। মা বলেন, দুপুরে খেয়েছিস কই?

'খাইছি। পপুলার হোটেলে।'

'হোটেলে মোটেলে খেয়ে পেটে গ্যাস্ট্রিক বানাবি?' তিনি ছেলের পাতে শাক তুলে দিতে দিতে বলেন।

'না। রোজ খাই নাতো!'

'লেবু দিয়ে শাক দিয়ে ভাতটা মেখে খা। শাকের মরিচটা একটু ডলে নে।'

'ঝাল খেতে পারি না।'

'তাহলে। হোটেলের লাল ঝোল খাস কেমন করে?'

ছেলে খায়। মা তাকিয়ে তাকিয়ে তার খাওয়া দেখেন। টমেটো দিয়ে ধনে পাতা দিয়ে রুই মাছের ঝোল করেছেন। ছেলের পাতে তুলে দিতে দিতে বলেন, শোন তোর করাচি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি। তোকে ১০/১৫দিনের মধ্যে রওনা হতে হবে।

'বলো কী তুমি। তোমাকে ছেড়ে আমি যেতে পারব না'-আজাদ বলে।

'কয় কী পাগলে! তোকে যেতেই হবে। তুই ওখানে বিএ-এমএ পড়বি, ডিগ্রি নিবি, দেশে ফিরে এসে চাকরি করবি, নাহলে ব্যবসা করবি, তখন আমার মনে শান্তি আসবে। আমি বেঁচে আছি তো তোকে মানুষ দেখে যাব বলে। আরেকটু ভাত দেই?'

'কেন, এইখানে আর লোকের ছেলেমেয়ে পড়ছে না?'

'পড়ুক। লোকের কথা আর আমার কথা এক না। লোকের কি আর আমার মতন একটা মাত্র ছেলে? আর কেউ নাই! জামাই নাই। ভাই নাই। বাপ নাই। মা নাই!'

'সেই জন্যেই তো আমি যেতে চাই না।'

'সেই জন্যেই তোকে তাড়াতাড়ি পাঠাতে চাই। এইখানে ইউনিভার্সিটি গিয়ে কেমন পা ভেঙে এসেছিস। আর না। ভাত খাওয়ার মধ্যে আবার পানি খাস কেন? খাওয়া শেষ করে খা।'

মায়ের জিদের কাছে পরাভব মানতে হয় আজাদকে।

পাকিস্তান এয়ার লাইন্সের টিকেট তার জন্যে কেনা হয়।

দাদা চলে যাচ্ছে। জায়েদের খুব মন খারাপ। সে আজ আর স্কুলে যাবে না। সে দাদার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আম্মা সকালবেলা স্কুলে যাবার সময় জায়েদের কোনো তৎপরতা না দেখে জিজ্ঞেস করেন, কীরে, তুই ঢিলা মেরে বসে আছিস কেন? স্কুল তো লেট হয়ে যাবি।

'স্কুল যামু না।' জায়েদ বলে।

'কেন যাবি না কেন?'

'দাদার লগে লগে থাকুম।'

'দাদা কি সকালে যাচ্ছে নাকি! তুই স্কুল থেকে এসেও তো দাদার সঙ্গে থাকতে পারবি! যা, স্কুল যা।'

'দাদা আমারে যাইতে নিষেধ করছে।'

দাদা ব্যাগ গোছাচ্ছে। কাপড়-চোপড়। শেভিং ক্রিম, ব্রাশ, সেফটি রেজর। বইপত্র। এলভিস প্রিসলির রেকর্ডটা। জায়েদ বলে, রেকর্ড লইয়া কী করবা দাদা? পেল্লার পাইবা কই?

'করাচি কি গ্রাম নাকি?' আজাদ জবাব দেয়।

'নাজে তো ভালো সিনেমা আসতেছে। দেখবার পারবা না।'

'করাচিতেও সিনেমা হল আছে।'

'থাকুক। বাংলা বই তো আর চলব না। সুচিত্রা উত্তমের বই কই দেখবা?'

'ওইখানেও নিশ্চয় চলবে। নাইলে আর কী! তুই দেখিস।'

'ক্যামনে দেখুম। পয়সা দিব কে?'

'তোকে মাসে মাসে আমি সিনেমা দেখার টাকা পাঠিয়ে দেব। এই শোন, তোর কলম লাগবে। ধর।'

আজাদ তার ড্রয়ারে রাখা কতগুলো কলম মুঠো করে জায়েদকে দেয়। জায়েদ না লাগব না বলে নেয়। ড্রয়ারে আরো কতোগুলো মূল্যবান সম্পদ আছে। একটা চাকু, এটা দিয়ে আম কাটা যাবে, একটা ঘড়ি, দাদা এটা পরে না, চাবিও দেয় না বহুদিন, আরো না জানি কত কিছু।

'কীরে ড্যাবড্যাব করে কী দেখিস?' আজাদ বলে।

'ঘড়িটা নষ্ট নাকি! চাবি দেও না কদ্দিন। আমার কাছে রাইখা যাও। ডেলি চাবি দিমু নে। ভালো থাকব।'

'তোকে দিলে বেচে দিয়ে সিনেমা দেখবি।'

'এত দামি ঘড়ি। মাথা খারাপ, নাকি পেট খারাপ?'

'তাইলে যা এটা তোকে দিয়া দিলাম।'

'চাকুটা কী করবা? ধার দেওন লাগব না!'

'এটা দিলে তোর দশ আঙুল কেটে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। এইটা দেওয়া যাবে না।'

দুটো পেবয় আছে। এগুলো ড্রয়ারে চাবি দিয়ে লুকিয়ে রাখতে হবে। না হলে জায়েদের হাতে পড়ে গেলে মুশকিল।

'জায়েদ যা, ঘর ছাড়।'

'ক্যান। তোমার লগে থাকুম বইলা স্কুল গেলাম না। আর আমারে তুমি বাইর কইরা দেও।'

'আরে হতভাগা। বের করে দিচ্ছি নাকি। দুইটা মিনিট একটু ঘরের বাইরে যা না। দুইটা মিনিট।'

মা এক সময় রাঁধতে ভালোবাসতেন। এখনও বাসেন হয়তো। কিন্তু সামর্থ্য তো নাই। রান্না করতে হলে বাজার করতে হয়। কে বাজার করবে? টাকা আসবে কোত্থেকে? কিন্তু আজকে মা অনেক কিছু রাঁধতে বসে গেছেন। ছেলে তাঁর যা কিছু খেতে ভালোবাসে, তার সব। পোলাওয়ের চেয়ে তার শাদা ভাত পছন্দ বেশি। ইলিশ মাছ সর্ষে দিয়ে। চিংড়ির মালাইকারি। গোরুর মাংস ভুনা। মুরগির দোপিঁয়াজা। একটু আলু ভর্তা। দুটো বেগুন ভাজি। মসুরের ডাল। আহা ছেলে আজ তাঁর দূরে চলে যাচ্ছে। এটা তো শুধু পড়তে ক মাস কী ক দিনের জন্যে চলে যাওয়া নয়, এ হলো জীবন থেকেই চলে যাওয়া। বিদেশে ছেলে যাবে পড়তেই বটে, কিন্তু বিএ এমএ পাস করে সে কি আর ফিরে আসবে, কার ছেলেই বা ফিরে আসে, ফিরে এলেও সে কি আর আগের ছেলে থাকে, অন্য রকম হয়ে ফেরে, তার মাথার মধ্যে তখন অন্য আকাশ, অন্য জগত, সে কি আর মায়ের বুকে ফিরে আসে? মাকে জড়িয়ে ধরে? জ্বর হলে মা মা বলে বিলাপ করে? মাথার চুলে মায়ের আঙুলের বিলির জন্যে কাতর হয়ে পড়ে? ছেলের সঙ্গে মায়ের তখন অপার ফারাক, দুজনের দুই জগত, ছেলে তখন অচেনা, তাকে ডাকে বাইরের জগত, সে তখন কাজের মানুষ, আর তার যেটুকু ভালোবাসা, যেটুকু স্নেহ, তা থাকে অন্যের জন্যে, অন্য নারী, অন্য কাজ, অন্য দরজা, অন্য আকাশের জন্যে। মার চোখ ভিজে আসতে চায়, কারণ তিনি পেঁয়াজ কাটছেন, এ ছাড়া আর কিছু নয়। আর কোনো কারণ থাকতে পারে না।

'মা, আমি একটু বাইরে গেলাম'–আজাদ বলে।

'আবার কই যাস? দুপুরে বাসায় খাস বাবা।'

'আচ্ছা।'

'আচ্ছা না। তোর জন্য আমি রাঁধতে বসেছি। অবশ্যই খাবি।'

'কী কী রাঁধছ?'

'খেতে বসলেই দেখতে পাবি।'

'আচ্ছা আসব 'খন।'

দুপুর গড়িয়ে যায়। আজাদ ফেরে না। মার মন খারাপ। জায়েদ মাতৃহারা গোবৎসের মতো বাড়ির এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। তার বাঁ হাতে ঘড়ি। ঘড়িটা চলছে। কানের কাছে নিয়ে সে টিকটিক শব্দ শোনে।

আজাদ ফেরে বিকালে। 'মা, খিদা লাগছে। খাবার দাও।'

'দেওয়াই আছে। আয়। বস। হাত ধুয়ে আয়'-মা বলেন।

'তুমি খেয়েছ?'

'আমার খাওয়া। আমি এই সব খাই?'

'না খেলে। ভাত তো খাও। এতবেলা না খেয়ে আছো। নাও। তুমিও নাও। জায়েদ খেয়েছে? ডালু খেয়েছে?'

'হ্যাঁ। ওদের খাইয়ে দিয়েছি।'

'ভালো করেছ। জায়েদ এই জায়েদ, আয় ব।' আজাদ উচ্চৈঃস্বরে বলে।

জায়েদ আসে। 'আমি খাইছি। প্যাট ফুইলা আছে।'

'আরে আবার ব। ল। ব। যা হাত ধুয়ে আয়। জলদি। জলদি।' জায়েদ না করতে পারে না। সত্যি তার পেটে কোনো জায়গা নাই। তবু দাদার পাশে বসার এ সুযোগ। আরেকটু কাছে থাকার সুযোগ! সে কি ছাড়তে পারে? সে বসে পড়ে।

মা আজাদের পাতে ভাত তুলে দেন। আজাদ অন্যমনস্ক। সে থালার ভাত এককোণে পালা করে। মা পাতে লেবু তুলে দিলে সে লেবু চিপতে থাকে। রস বেরিয়ে তার চোখে যায়। সে বাঁ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ ঘসে। মা পেন্টে আলুভর্তা তুলে দেন। সে ভালো করে না মেখেই গাপুসগুপুস করে ভাত মুখে তোলে।

মা বলেন, আস্তে আস্তে খাও বাবা। ভালো করে মেখে খাও। কোথায় থাকবে, না থাকবে, কী খাবে, না খাবে, ভাত তো পাবেই না, রুটি পাবে।

আজাদ মুখ তুলে মার মুখে দিকে তাকায়। 'আরে না। ভাত পাওয়া যাবে।'

জায়েদ বলে, করাচিতে নাকি খুব ভালো কাবাব হয়। আস্ত খাসি আগুনে পুড়ায়া কাবাব বানায়। দাদা আরাম কইরা খাইতে পারব।

আজাদ হাসে। 'খাসির ভুড়ি কি বের করে নেয়, না পেটের ভিতরেই থাকে!'

মা বলেন, আজাদ। শোনো। মনে রেখো, তুমি করাচি যাচ্ছ পড়তে। পড়াশুনাটা ঠিকমতো করবে। কষ্ট হলেও পড়াশুনাটা শেষ করবে। বিদেশে নানা কষ্ট হয়। কিন্তু পড়তে গেলে কষ্ট করতেই হবে। মনটা উতলা করবে না। ধ্যান ধরে পড়বে। আমাদের জন্য চিন্তা করবে না। আমরা আলাহ্‌র ইচ্ছায় ভালো থাকব। চিঠি লিখবে।

আজাদ বলে, মা শোনো। তোমাকে একটা কথা বলি। আমি করাচি যেতে রাজি হয়েছি কেন জানো। রেজাল্ট ভালো করার জন্য। এখানে তো বন্ধুবান্ধব বেশি হয়ে গেছে। ওখানে তো আর কেউ থাকবে না। খেলা নাই, আড্ডা নাই। খালি পড়া। দেখো, আমি যদি ফার্স্টক্লাস না পেয়েছি...

'খাও বাবা। খাও।' মা একটা মুরগির রান তুলে দেন ছেলের পাতে।

সন্ধ্যার পরে রুমী আসে। সৈয়দ আশরাফুল আসে। ফারুক আসে। ইব্রাহিম সাবের আসে। তারা তিনতলায় আজাদের ঘরে গল্পগুজব করে। হাসিঠাট্টা আমোদে মেতে ওঠে। ফারুক বলে, দোস্তো,

পাকিস্তানী মেয়ে পাইলে প্রথমে গায়ে পানি ছিটাইবা। যদি দেখো ঝাইড়া দৌড় দিতাছে, তাইলে যাইতে দিও। পিছনে পিছনে দৌড়াইও না। আর যদি দেখো পানি সহ্য করতে পারে, তাইলে কাছে যাইও। নাইলে বুঝলা না একমাস গোসল করে না, গায়ে গন্ধ করব।

বন্ধুরা সবাই রাতে এখানে ভাত খায়। আজাদের মা অনেকদিন পরে তাঁর বাসায় বাইরের লোকদের আপ্যায়ন করেন। অথচ আগে প্রায় প্রতিদিনই কাউকে না কাউকে দাওয়াত করে খাওয়াতেন। ইস্কাটনের বাসা থেকে বেরিয়ে আসার পরে সেটা আর করা হয় না।

জায়েদ কিন্তু এতলোকের উপস্থিতি পছন্দ করছে না। একটু পরে দাদা চলে যাবে এয়ারপোর্টের উদ্দেশে, এখন কি সে দাদাকে একটু একা পেতে পারত না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মা বলে, বাবা, রাত কোরো না, দিনকাল ভালো না, বিসমিলাহ করে বের হয়ে যাও। তাড়াতাড়ি এয়ারপোর্টে গিয়ে বসে থাকতে তো অসুবিধা নাই।

আজাদ বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে বন্ধুরা। মা, জায়েদ, চঞ্চল, টিসুকে কোলে নিয়ে মহুয়া এরাও আসে রাস্তায়। আরেক খালাত ভাই ডালু আসে। তার হাতে আজাদের সুটকেস।

একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। আজাদের বন্ধু ফারুকের গাড়ি।

মা বলেন, ঠিক আছে বাবা, আসো। দেখে শুনে যাও। টিকেট ঠিকমতো রেখেছ তো?

'জি রেখেছি।' আজাদ বলে।

'আলাহ্র নাম নিয়ে রওনা দাও।'

আজাদ মাকে কদমবুসি করে। মার বুকের ভেতর থেকে কান্না উগরে আসতে চাইছে। চোখের পানি বাধ মানতে চাইছে না। কিন্তু তিনি বাইরে থেকে তার কিছুই বুঝতে দেন না। মুখটা হাসি হাসি করে রাখেন। তাঁকে দেখলে বোঝার উপায় নাই যে ভেতরে তাঁর ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

আজাদ গাড়িতে ওঠে। তার বন্ধুদেরও কেউ কেউ। গাড়ির হেড লাইট জ্বলে ওঠে। শব্দ করে স্টার্ট নেয় গাড়িটা। একটু একটু করে এগুতে থাকে। তারপর পেছনের লাল লাইট দেখিয়ে এক সময় সেটা অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন ঝপ করে এই জায়গাটায় একটা নিস্তব্ধতা এসে ভর করে। ডালু কোনো কথা বলে না, জায়েদ কোনো কথা বলে না, চঞ্চল কোনো কথা বলে না, টিসু না, বোনেরা না, মা না। তারা ঘরের ভেতরেও যায় না। আবার রাস্তার দিকে তাকিয়েও থাকে না। কয়েকটা মুহূর্ত শুধু, কিন্তু সে মুহূর্ত কয়েকটাই অনন্তকালের মতো সরণী জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আলাহ মাবুদ-আজাদের মার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যাবার পরে সবাই ঘরে ফিরে আসে।

১২

আজাদ নাই। সে করাচির উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছে। উড়োজাহাজ তাকে নিয়ে চলে গেছে ওই আকাশের ওপর দিয়ে। এ-তো যে সে কথা নয়। এতো মাওয়া বা বিক্রমপুর যাওয়া নয় যে বেলাবেলি চলে আসা যাবে। ইচ্ছা করলেই তো হুট করে চলে আসা যাবে না। পূর্বপাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান, মধ্যখানে অন্যদেশ, হাজার মাইলের ব্যবধান। ওখানকার ভাষা আলাদা, খাবার আলাদা, চালচলন আলাদা। পাসপোর্ট লাগে না হয়তো, কিন্তু আলাদাই তো দেশ। একা ছেলে তাঁর কোথায় থাকবে, কী খাবে? অসুখ-বিসুখ হলে তাকে কে দেখবে?

মা সারাদিন ডাকপিয়নের জন্য পথ চেয়ে থাকেন। ছেলের কোনো কুশল যদি পাওয়া যায়! নফল রোজা রেখেছেন তিনি। বাসার সবাই, তাঁর ভাগ্নে-ভাগ্নিরা, তাঁর বড় বোনের ছেলে ডাল্লু, সবাই তাঁকে দেখলেই গম্ভীর হয়ে যায়। এ হয়েছে আরেক মুশকিল।

তিনি প্রথমে গুনতেন ঘণ্টা। এই তো এখন আজাদ প্লেনে। এই তো এখন আজাদ করাচি পৌঁছেছে ইনশালাহ। তারপর তো তিনি আর বলতে পারেন না, আজাদ কোথায় কার কাছে গিয়ে উঠেছে। তখন তিনি বলতেন, ১২ ঘণ্টা হলো আজাদ গেছে। ১৮ ঘন্টা হলো আজাদ ঢাকা ছেড়েছে। তারপর এল দিন গণনার পালা। আজ দুদিন হলো আজাদ করাচিতে। তাহলে চিঠি আসে না কেন? ও যদি গিয়ে পৌঁছেই একটা চিঠি লেখে, তাহলে কালকের প্লেনে চিঠিটা কি ঢাকায় আসতে পারে না? তাহলে পিয়ন কেন আজও চিঠি দিল না। একদিন, দুদিন, তিনদিন, চারদিন।

চারদিন পরে চিঠি আসে। একটা চিঠি।

পিয়ন এসে দরজায় কড়া নাড়তেই ছুটে যান সাফিয়া বেগম। এর আগেও অনেকবার পিয়ন এসেছে ভেবে তিনি ছুটে ছুটে গেছেন। কিন্তু এ ও এসেছে। পিয়ন আসে নাই। এবার সত্যি পিয়ন। সাফিয়ার বুক ধড়পড় করে। তিনি চিঠি হাতে নিয়ে খামটাই উল্টেপাল্টে দেখেন। বাই এয়ার মেইল।

তার আজাদের হাতের লেখা।

TO
Mrs. Safia Begum
61 B. K. Das Road
Farashganj
Dacca—1
East Pakistan

খামটা তিনি ছিঁড়বেন কী করে? ভেতরে আজাদের লেখা চিঠিটা যদি ছিঁড়ে যায়। খানিকক্ষণ তাঁর নিজেকে হতবুদ্ধি লাগে। তারপর তিনি আলোর বিপরীতে ধরেন খামটা। ভেতরের চিঠিটার অবস্থানটা বোঝা যায়। তিনি একপাশ দিয়ে খামটা যত্ন করে ছেঁড়েন। তাঁর সমস্তটা শরীর কাঁপছে।

১১-৮-৬৪
Karachi
মা,

আমার ভালোবাসা গ্রহণ করিও। আশা করি ভালই আছ। আমি সুস্থভাবেই করাচী পৌঁছেছি। এয়ারপোর্টে ডলদাদা এবং তার দুই বন্ধু ছিল। এখন আমি 'প্যালেস হোটেলে' আছি। গতকাল ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম। ইউনিভার্সিটি করাচী শহর থেকে ১৫-২০ মাইল দূরে। হোস্টেল দেখলাম ভালই কিন্তু খুব কড়া। হোস্টেলের গেট লোহার তৈরি এবং খুব উঁচা। পাশে খুব ছোট। দেওয়ালগু লি খুব উঁচা এবং দেওয়ালের উপরে ভাংগা কাঁচ বসান। এখন সকাল ৮টা বাজে, ৯টার সময় ডল আসবে এবং পরে ইউনিভার্সিটিতে যাব ভর্তির ব্যাপারে। যা হোক, আমার জন্য তুমি চিন্তা করো না। তুমি নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিও। এখন আর সময় নেই, পরে আরো চিঠি লিখে সব জানাব। আশীর্বাদ করো যেন আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়।

ইতি তোমার
আজাদ

এই ঠিকানায় চিঠি দিও

Azad.
C/O Q. B. Islam
19-F Block 6
P E C H S
KARACHI- 19

মা ঘুরেফিরে কয়েকবার চিঠিটা পড়েন। তারপর বড়বোনের ছেলে ডালুকে ডেকে পড়তে দেন চিঠিটা। জায়েদ এসে তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, আজাদ দাদার চিঠি সেও পড়বে।

জুরাইন গোরস্তানে আম্মাকে শুইয়ে রেখে এসে, জায়েদের দিনগুলি এলোমেলো হয়ে যায়। কী কঠিন মহিলা ছিলেন তিনি, আজাদের মা। তাঁর সমস্ত ব্যথা, সমস্ত দুঃখ তিনি একাই পুরোটা জীবন বহন করে গেছেন। সুখের সংসার ছাড়ার দুঃখ, মুক্তিযুদ্ধে নিজের ছেলেকে হারানোর দুঃখ। কিন্তু তিনি কোনোদিনও চান নাই, এসব কথা মানুষ জানুক, এসব নিয়ে লেখালেখি হোক। জাহানারা ইমাম এসেছিলেন অনেকবার, আপা, আপনার জীবনের কথা বলেন, এসব লিখে রাখা দরকার। তিনি রাজি হন নাই। জায়েদকে বলে গেছেন, খবরদার, আমার ছবি কাউকে দেবে না। জায়েদ আম্মার ছবি কাউকে দেবে না। এ সত্যি। কিন্তু আরো কিছু জিনিস তো আছে তার কাছে। যেমন আছে করাচি থেকে মাকে লেখা আজাদ দাদার চিঠি।

জায়েদ তার বাক্সে হাত দেয়। চিঠিগুলো বের করে। আপন মনে পড়ে। পড়ে কাঁদে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। কী করবে এখন এসব নিয়ে সে।

করাচি থেকে লেখা আজাদ দাদার প্রথম চিঠিটা এতদিন পরে পড়ে নানা কথাই মনে হয় জায়েদের। আজাদ কথাটার অর্থই তো স্বাধীন। আর দ্যাখো, তার আজাদ দাদা করাচিতে তার হোস্টেল দেখে প্রথমেই যেটা লক্ষ করল, তা হলো চারদিকের দেওয়াল উঁচু, দেওয়ালের ওপরে কাচ বসানো, গেট লোহার আর পাশে ছোট। আশ্চর্য না? তার স্বাধীনতা যে এ হোস্টেলে থাকলে চলে যাবে, এটাই ছিল তার প্রথম চিন্তা।

এই চিঠি যে-তারিখে লেখা, ঠিক তার দুদিন পরের তারিখের আরেকটা চিঠি বের হয়। এ চিঠিতে আজাদ মাকে জানায়, ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির ব্যাপার প্রায় পাকা, ইউনিভার্সিটিতে বেশ কিছু বাঙালি ছেলে আছে, আর মার প্রতি অনুরোধ জানায় চিন্তা না করার জন্যে, শরীরের প্রতি যত্ন নেবার জন্যে, একটা চাকর রাখার জন্যে, তার জন্যে দোয়া করার জন্যে।

এ চিঠিতে আর পরের চিঠিগুলোতে আজাদ বার-বার বলেছে, এবার সে ফার্স্ট ক্লাস পেতে চায়, যাতে সে পড়াশোনা করে মানুষের মতো মানুষ হয়ে মার মুখে হাসি ফোটাতে পারে।

এদিকে মা ছেলের জন্যে পাঠিয়েছেন সন্দেশ। আজাদ সেটা নিজে খেয়েছে, খাইয়েছে আশেপাশের অনেক ছাত্রকে। তারা সবাই সন্দেশের প্রশংসা করেছে। চিঠিতে আজাদ সে-কথা লিখতে ভোলে নাই।

আজাদ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। তার নিজের নামে বরাদ্দ করা হোস্টেলের সিটে উঠেছে।

একদিন গভীর রাতে তার ঘুম ভেঙে যায়। তার রুমমেট আরো তিনজন। তারা ঘুমাচ্ছে। এদের একজন সিন্ধি, একজন হিন্দু, আরেকজন করাচির। এদের প্রত্যেকের বাবা দ্বিতীয়বার সৎকার্য করেছে। চারজন একই রকম ভাগ্যওয়ালা মানুষ যে কীভাবে একত্রিত হলো, আলাহ জানে।

আমি এখন এই করাচির হোস্টেলে, আজাদ ভাবে। আর জানি না, ঢাকায় মা কী করছে-সে বিড়বিড় করে। তার ইচ্ছা করছে বিছানা ছেড়ে উঠে বসে আলো জ্বালিয়ে চিঠি লিখতে বসে। কিন্তু তা

উচিত হবে না। এতরাতে আলো জ্বালালে রুমমেটদের অসুবিধা হবে। কালকে ভোরে উঠে সে লিখতে বসবে চিঠি। অনেক বড়ো চিঠি লিখবে মাকে। কী লিখবে সে?

মা, এখানে আমি ভালই আছি। কোনো গণ্ডগোল নাই। ভালো ইউনিভার্সিটি আর সুশৃঙ্খল পরিবেশ।

তবে দূরে থাকি বলে, একা থাকি বলে, খুব ছোটখাটো বিষয়ের জন্যে মনটা মাঝেমধ্যে কেমন করে ওঠে। যেমন ধরো ভাত। এমন তো না যে ঢাকায় থাকতে রোজই ভাত খেতাম। রুটি-তন্দুরি মোগলাই দিয়ে দুতিনদিন পার যে কখনও করিনি, তেমন তো নয়। কিন্তু করাচিতে এসে ভাত জিনিসটা হোস্টেলের ডাইনিং-এ খেতে পাচ্ছি না, ভাত খাবার জন্যে তিন মাইল দূরে ইস্ট পাকিস্তান হোটেলে যেতে হবে, এটা যেন সহ্য হয় না। এখন মনে হয়, তুমি যে ভাত রাঁধতে, তাতে বলক উঠত, সুন্দর মাড়ের গন্ধ বেরুত, সেই গন্ধটাও কত সুন্দর ছিল। শুধু একটু ভাতের গন্ধের জন্যও মনটা খারাপ করে মা। একই রকম মনটা আকুল হয়ে ওঠে একটু বাংলায় কথা বলার জন্য, বাংলায় কথা শোনার জন্য। আমাদের হোস্টেলে যে কজন বাঙালি ছেলে আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি, তারা এখন একসঙ্গে হবার জন্য, এক সাথে চলার জন্য, একটু বাংলায় কথা বলার জন্য, একটু বাংলা কথা শোনার জন্য আকুপাকু করি। রাস্তায় যদি কোনও পূর্বপাকিস্তানের ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে দেখা হয়, যদি তার সঙ্গে উর্দুতে কথা বলে খানিকক্ষণ পথ চলার পরে জানতে পারি সে বাঙালি, কী আনন্দটাই না হয়। তার সাথে বেমালুম তখন বাংলা কথা বলা শুরু করে দিই। মনে হয় সাত জনমের আপন একজনকে পেলাম। এখন মনে হচ্ছে, বাঙালি আমরা আরেক জাতি। ওরা পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দুওয়ালারা আরেক জাতি। মুসলমান হলেই জাতি এক হয় না।

এক যে হয় না, সেটা ওদের আচার-আচরণেও টের পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে আমার এক বন্ধু পেয়ে গেছি, রাওয়ালপিন্ডি বাড়ি, হিজাজি খান। সে খুব ভালো ছেলে। আমাকে খুবই পছন্দ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলব, পুরো পূর্বপাকিস্তান সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের লোকদের ধারণা হয় খুব খারাপ, নয়তো ধারণাই নাই। ওরা আমাদের মুসলমানও ভালোমতো মনে করে না, মানুষও ঠিক মনে করে কিনা, সন্দেহ। পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছি শুনলেই নানা রকমের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে।

আর আছে নানা রকমের বৈষম্য। পশ্চিম পাকিস্তানে না এলে বোঝা যাবে না, বাঙালিদের ওরা কতভাবে বঞ্চিত করে রেখেছে। এডমিনস্ট্রেশনে বাঙালি নাই বললেই চলে, সেনাবাহিনীতেও বাঙালি কম নেওয়া হয়। বার্ষিক বাজেটে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে বরাদ্দ অনেক বেশি। আমাদের ঢাকার সাথে ওদের করাচির তুলনা করলে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আর বৈষম্য চোখে পড়ে।

আমার সাথে একটা মেয়ের বন্ধুত্ব হয়েছিল। পাঞ্জাবি মেয়ে। তবে মোহাজের। ইন্ডিয়ান পাঞ্জাব থেকে এসেছে ৪৭-এর পরে। একদিন কতগুলো পাঞ্জাবি এসে বলল, খবরদার, বাঙালি হয়ে পাঞ্জাবি মেয়ের সাথে মিশবি না। তারা সবগুণ্ডা ধরনের ছেলে।

আমার ইচ্ছা হলো কষে মার লাগাই। ঢাকা হলে আমার সাথে কেউ এ রকম বাজে ব্যবহার করলে আমি কী করতাম তুমি কল্পনা করতে পারো। মেরে সব কটার চামড়া খুলে ফেলতাম। কিন্তু বিদেশ বলে কিছুই করতে পারলাম না। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছি। মাঝেমধ্যে মনে হয়, কিসের পড়াশোনা, দেশে ফিরে যাই।

করাচি আর যাই হোক, দেশ নয়, বিদেশ।

আমি শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়ে এই বিদেশে থাকা আর অপমান সহ্য করার কষ্ট করছি। দোয়া করো যেন তাড়াতাড়ি পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে তোমার কষ্ট দূর করতে পারি।

এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে আসে। আজানের ধ্বনি শোনা যায়। আজাদ ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালবেলা ক্লাস। ক্লাস থেকে ফিরে এসে সে মাকে চিঠি লিখতে বসে যায়। চিঠি লেখার জন্য নীল রঙের প্যাড কিনে রেখেছে সে। নীল রঙের কালিতে লেখেঃ

মা,

চিঠি লিখতে দেরি হয়ে গেল বলে কিছু মনে করো না। কারণ একদম সময় পাই নাই। এখানে সবাই সব সময় ব্যস্ত থাকে। আমি এখন হোস্টেলে ভালই আছি। আমাদের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। আমি এখনও রীতিমতো পড়া শুরু করি নাই। আমরা তিনজন এক রুমে থাকি। এখানকার খাবার জিনিস মোটেই ভাল না। এখানে অনেক পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি ছেলে আছে এবং আমাদের আলাদা বাংলা সমিতি আর ক্লাব আছে। এখানকার মাস্টারেরা খুব ভাল। এখানে নিয়ম করেছে যে ক্লাসে মাস্টারেরা উর্দুতে পড়াবে। কিন্তু আমাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হবে আশা করি। উর্দুর জন্য খুব অসুবিধা হচ্ছে। দোয়া করো যেন অসুবিধা না হয়। আর তোমার শরীর কেমন আছে। নতুন কোনো খবর থাকলে বলো। চিঠির উত্তর দিও। এখন আসি। আমার জন্য চিন্তা করো না।

ঠিকানা

Magferuddin Ahmed Chowdhury
BLOCK 2 Room No 28
KARACHI UNIVERSITY HOSTEL
KARACHI 32

রাতের বেলা মনে মনে লেখা চিঠিতে সে কত কথাই না লিখেছিল। আর এখন দিনের আলোয় যখন সত্যি সত্যি মাকে সে চিঠি লিখতে বসেছে, তখন কিন্তু আর অত কথা লেখা হয় না। সংক্ষেপে গুছিয়ে, মা যেন আহত না হন, এমন কায়দা করে চিঠিটা লিখতে হয়। মানুষের মনের কথা আর মুখের কথাই এক হয় না, মনের কথা আর চিঠির কথা এক হওয়া তো আরো অসম্ভব।

চিঠি পেয়ে মা চিন্তিত হন। আজাদ লিখেছে, ওখানকার খাবার খুব খারাপ। কত খারাপ? হায়। আমার ছেলে ভাত পছন্দ করে। করাচিতে এখন সে ভাত পাবে কোথায়? মাছ পাবে কোথায়? আর দ্যাখো, তিনি নিজে কত রাঁধতে পছন্দ করেন। কতজনকে রেঁধে রেঁধে এই জীবনে খাইয়েছেন। আর তাঁর নিজের ছেলে ভাতের জন্যে আনচান করছে। তাঁর দুঃখের যেন সীমা-পরিসীমা থাকে না। আবার তিনি শাসন করেন নিজের মনকে। আজাদ করাচি গেছে পড়তে, ভালো রেজাল্ট করতে, ভাতমাছ খেতে নয়। বিদেশে গেলে কষ্ট তো হবেই। মহানবী (দঃ) বলেছেন, জ্ঞানার্জনের জন্য সুদূর চীনদেশে হলেও যাও। আরব দেশ থেকে চীনদেশে কেউ গেলে চাইনিজ খাবার দেখলে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তবু তাকে যেতে হবে। কষ্ট স্বীকার করতে হবে। কারণ সে গেছে এলম্ তালিম করতে।

আর দ্যাখো তো কাণ্ড। ওরা নাকি উর্দুতে পড়াবে। উর্দু তো ছেলে আমার একদমই জানে না। কেন বাবা ইংরেজিতে পড়াতে পারো না? আজাদ খুব ভালো ইংরেজি জানে।

এইসব সাতপাঁচ ভাবেন আর তিনি লেগে যান চাল কুরে আটা বানাতে। তাঁর সঙ্গে যোগ দেয় বাসার আর মেয়েরা। উরুনগাইনে ভেজা চাল গুঁড়ো করা চলে। বেরিয়ে পড়ে শাদা আটা। তারপর সেই আটা নিয়ে সাফিয়া বেগম বসে যান পিঠা বানাতে। বাঙালি পিঠা।

মা এখন তক্কে তক্কে থাকেন, কে কখন করাচি যাবে। তার হাত দিয়ে তিনি পিঠাটা, মিষ্টিটা পাঠিয়ে দেন। পিঠা খেয়ে আর বন্ধুদের খাইয়ে ছেলে চিঠি লেখে, মা তোমার পিঠা খেয়ে আমার বন্ধুরা কত

প্রশংসাই না করেছে। সেই চিঠি পড়ে মার মন প্রশান্তিতে ভরে যায়। যাক, ছেলে তাঁর পিঠা খেয়েছে, আর শুধু খায় নাই, বন্ধুবান্ধবদের খাইয়েছে। আর ওরা, মাউড়ারা তাঁর বাঙালি পিঠার প্রশংসা করেছে।

১৩

প্রবাসে গেলে বাঙালি মাত্রেরই যা হয়, ভাষা আর ভাতের জন্যে হা-পিত্যেশ করা, তা তো আজাদেরও বেলায়ও ঘটে। অন্য লক্ষণটাও বাদ থাকে না। সমিতি করা। বাঙালি সমিতি করা।

আর এই সব সাংগঠনিক কাজে যুক্ত থাকায় আজাদের আরেকটা লাভ হয়। করাচিতেই এক বাঙালি মেয়েকে তার ভালো লেগে যায়। একই ইউনিভার্সিটিতে পড়ে মেয়েটা।

বাঙালি সমিতির অনুষ্ঠানে মেয়েটা গান গেয়েছিল। আধুনিক গান। সাতটি রঙের মাঝে আমি মিল খুঁজে না পাই, জানি না তো কেমন করে নিজেকে সাজাই। সাদা রঙের জামা, সে তো ভালো নয়, হলুদ না হয় নীলে কেমন জানি হয়!

মেয়েটা পরে এসেছিল শাড়ি। কপালে দিয়েছিল টিপ। আজাদের চোখে লেগে গিয়েছিল সে। আজাদ সুযোগ খুঁজছিল মেয়েটার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করার। সুযোগ সহজেই মিলে যায়। অনুষ্ঠানশেষে ছিল চা-পর্ব। হলঘরের পেছন দিকে বড় টেবিলে চায়ের কাপ আর কেৎলি সাজানো। পিরিচে পিরিচে বিস্কিট আর সামুচা। অনুষ্ঠান শেষ হলে সবাই এক সঙ্গে উঠে পড়ে চায়ের টেবিলের দিকে যাত্রা শুরু করলে খানিকটা মানবজট লেগে যায়। আজাদ কিন্তু প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়ে না চায়ের কাপের দিকে। তার নজর শাড়ি পরা গায়িকাটির ওপরে। সে যখন যাবে, আজাদও তখন যাবে টেবিলের দিকে। ভিড় এড়াতে মেয়েটা দর্শক চেয়ারেই বসে থাকে। তার মাথার ওপরে একটা সিলিং ফ্যান ঘুরছে। মেয়েটার চুল সেই বাতাসে উড়ছে। আজাদ এগিয়ে যায় তার কাছে, গলার স্বর ঠিকমতো বেরুতে চাইছে না, একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে যথাসম্ভব স্মার্টভাবে সে বলে, আপনি গাইলেন, আপনি জানেন না কেমন করে কী দিয়ে সাজবেন, কিন্তু খুব সুন্দর করে সেজেছেন।

মেয়েটা সপ্রতিভ। হাত দিয়ে উড়ন্ত কেশদাম শাসন করতে করতে সে বলে, ওমা। গাইলাম গান, প্রশংসা করলেন সাজের। ব্যাপার কী? গান বুঝি ভালো হয় নি?

'আরে না। গানও ভালো হয়েছে। বোঝেনই তো, কতদিন পরে নিজের দেশের গান শুনলাম। আপনি কি ফার্স্ট ইয়ারে?'

'হ্যাঁ। আপনি?'

'সেকেন্ড ইয়ার চলছে। কেমন লাগছে?' আজাদ বলে।

'উর্দু বুঝতে কষ্ট হচ্ছে।'

'আমারও খুব হয়। স্যাররা ভালো পড়ায়, কিন্তু কেন যে উর্দুতে পড়ায়, বুঝি না। ইংলিশে পড়ালে কিন্তু বুঝতাম। চা নেবেন না?'

'নেব। ভিড়টা একটু কমুক।'

'চলেন। এখন নেওয়া যাবে।'

মেয়েটা ওঠে। হাতব্যাগটা কাঁধে ঝোলায়।

'ঢাকায় কোথায় বাসা আপনার?' আজাদ জিজ্ঞেস করে।

'পুরানা পল্টন।'

'পুরানা পল্টন কোন বাসাটা বলেন তো!'

'ওই যে পানির ট্যাঙ্কটা আছে না, ওখানে।'

'ও।'

'আপনাদের বাসা কোথায়?'

আজাদ বিপদে পড়ে। কোন বাসার কথা বলবে। শেষে বলে, ফরাশগঞ্জ। আজাদ কেৎলি থেকে চা ঢালে পেয়ালায়। মেয়েটিকে এগিয়ে দেয়। নিজে নেয় এক কাপ। তারপর দুজনে এক কোণে দাঁড়িয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে থাকে।

আর বেশি গল্প করা যায় না। অন্য ছাত্ররা এসে পড়ছে। চা নিয়ে সামুচা নিয়ে আশেপাশে দাঁড়িয়ে পড়ছে। মেয়েটাও তার পরিচিত জন, ক্লাসমেটদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করছে। আজাদ চায়ের কাপ হাতে তার বন্ধুদের দিকে এগিয়ে যায়।

বাশার, রানা, কায়েসরা সব একসঙ্গে। তাদের সঙ্গে গল্পগুজবে নিজেকে নিয়োজিত করে সে।

বাশার বলে, আজাদ, তোমার সাথে আগে থেকেই আলাপ ছিল নাকি মিলির?

আজাদ বলে, হ্যাঁ। ওই তো পুরানা পল্টনে বাসা। আপনি চিনবেন।

বাশার বলে, আমি চিনব কী করে! টাঙাইলে বাড়ি হলে না চিনতাম।

আজাদ বলে, আমি ওদের বাসায় আগেও গেছি। ওর মাকে খালাম্মা বলে ডাকি!

মেয়েটা কাছে আসে। আজাদ বলে, শোনেন, আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই, ইনি হলেন আবুল বাশার, আর ইনি হলেন রানা। আর ইনি মিলি। খুব ভালো গান করেন। ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছেন।

মিলি বলে, তাতো হলো। কিন্তু আপনি তো আপনার নামটাই বললেন না। নিজের পরিচয়টা আগে দেন।

'আমার নাম আজাদ।'

'ঠিক আছে। আপনার নামটা জানার জন্যই আমি আবার এদিকটায় এলাম।'

মিলি চলে যায়। রানা আজাদের গায়ে চাপড় মেরে বলে, তুমি তো দেখি এক নম্বরের গুলবাজ, উনি তোমার নামই জানেন না, আর বলছ বাসায় অনেকবার গেছ।

'গেছি। কিন্তু ও আমার নাম ভুলে গেছে।'

মিলির সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে, কথা হওয়ার পরে, আজাদের নিজেকে কেমন যেন তুচ্ছ লাগতে শুরু করে। মনে হয়, এ জীবনের কোনো মানে নাই। মনে হয়, ইস আবার যদি তার দেখা পাওয়া যেত। আবার কবে বাঙালি সমিতির অনুষ্ঠান হবে? সে মনে মনে মিলির সঙ্গে কথা বলে। রাতের বেলা বই নিয়ে পড়ছে, খানিকক্ষণ পরে হুঁশ হয়, আসলে সে পড়ছে না, মিলির কথা ভাবছে। সে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে নিজের অজান্তেই খুঁজতে থাকে মিলিকে। ইস, যদি আরেকবার মিলির দেখা পাওয়া যায়।

দেখা না পাওয়ার কোনো কারণ নাই। ওদের ক্লাস যেখানে হয় সেখানে দুএকবার ঘুরঘুর করতেই মিলিকে করিডোরে দেখতে পাওয়া যায়। কী আশ্চর্য মেয়েটা তার চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আজাদের বুক কাঁপতে থাকে।

'কেমন আছেন?' আজাদ গলায় যথাসম্ভব জোর এনে বলে।

মিলি চোখ তুলে তাকায়। বাংলায় তার সঙ্গে কথা বলে কে রে? আরে এতো সেদিনের ছেলেটা। বাহবা। আজকে তো আরো চমৎকার ড্রেস পরে এসেছে। মিলি মনে মনে তারিফ করে।

'ভালো। আপনি ভালো?' মিলি বলে।

'আছি। আপনার আরো ক্লাস আছে?'

'না। ক্লাস শেষ। বাসায় চলে যাব।'

'বাসাটা কোনদিকে যেন?'

'পিইসিএইচ। আমার খালার বাসা। ওদের সঙ্গে থাকি আমি।'

'আরে ওদিকে তো আমিও যাব। ওখানে আমার এক বোনের দেওর থাকেন।'

'চলেন তাহলে। আমি একটা বাস ধরব।'

'আমিও।'

'বাসস্টপে দুজন গিয়ে দাঁড়ায়। আজ রোদটা ভীষণ চড়া। মিলি বলে, আমি যদি ছাতা বের করি, আপনি মাইন্ড করবেন না তো?'

'না। মাইন্ড করব কেন! রোদ লেগে আপনার রং ময়লা হলে তো জাতীয় ক্ষতি!'

'মানে?'

'মানে বাঙালি মেয়ে তো এখানে বেশি নাই। আপনি আছেন। আপনাকে দেখতে সুন্দর লাগলে আমরা সব বাঙালি ছেলেরাই সেটা নিয়ে গর্ব করতে পারি। আপনার রং যদি একটু রোদে পুড়ে যায়, তাহলে সেটা আমাদের ন্যাশনাল লস না!'

'আপনি তো বেশ সুন্দর করে কথা বলেন। মেয়ে-পটানো কথা। কার কাছ থেকে শিখেছেন?'

'মনে হয় জন্মগত প্রতিভা।' আজাদ হাসতে হাসতে বলে বটে, তবে তার এই প্রতিভাটার জন্য সে তার জন্মদাতা পিতাকেই কৃতিত্ব দিতে প্রস্তুত আছে।

দুজনে এক বাসে ওঠে। গল্প করতে করতে যায়। একই স্টপেজে নামে তারা। মিলি বলে, আপনি কোনদিকে যাবেন?

আজাদ বলে, 'এই তো এই রাস্তা। সামনের দুটো লেন পরেই বাসাটা।' আজাদ তাড়াতাড়ি করে যাহোক একটা কিছু বলে।

মিলি বলে, আমি তো যাব উল্টো পথে। আসবেন আজকে আমাদের বাসায়?

মনে মনে আজাদ বলে, যাব, একশবার যাব, মুখে বলে, 'না, আজ না। আরেকদিন। আসি, না?'

তারপর সামনে গিয়ে একটা বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে, চুপিসারে তাকিয়ে থাকে মিলির চলে যাওয়ার দিকে, তার মনে হয়, প্রতিটা পদক্ষেপে মেয়েটা সমস্তটা পথকে ধন্য করে দিয়ে চলে যাচ্ছে, তার মনে হয়, ওই পথের ধুলোগুলোও কতটা ধন্য হয়ে যাচ্ছে তার পদস্পর্শ পেয়ে। মিলি অদৃশ্য হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সে উল্টো পথে হেঁটে আবার ফিরে যায় বাসস্টপেজে। কিসের বোন, আর কিসের দেবর?

আবার বাঙালি সমিতির অনুষ্ঠান করার জন্য আজাদ মরিয়া হয়ে উঠেছে। আসলে এই সুযোগে সে যেতে চায় মিলিদের বাসায়। তাকে অনুষ্ঠানে গান গাইতে বলতে। তাছাড়া একটা কোরাসও রাখা উচিত। ধনধান্যপুষ্পভরা গানটা হতে পারে। তা কোরাস গাইতে হলে তো রিহার্সাল লাগবে, নাকি!

এইসব ছুতোয় আজাদকে যেতে হয় মিলির বাসায়। মিলির খালার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। খালা জানতে চান আজাদের সম্পর্কে। তার বাবার নাম। আজাদ জানায়। সঙ্গে সঙ্গে মিলির খালা ঝলমলিয়ে ওঠেন: ইউনুস চৌধুরীর ছেলে তুমি? বাপরে!

আজাদ চলে গেলে খালা শতমুখে বলতে থাকেন, উরে বাবা। মিলি তুই জানিস না ওরা কত বড়লোক।

মিলি রোজ ক্লাস শেষে বাঙালি সমিতির রিহার্সালে আসে। আজাদ মিলিদের ক্লাসের সামনে থেকে তাকে নিয়ে আসে। মিলির রিহার্সাল শেষ হলে তাকে বাস-স্টান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দেয়।

বাশার, রানা, কায়েস-আজাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আজাদকে ধরে। আজাদ, তুমি তো কিলা-ফতে করে দিয়েছ, আমাদের খাওয়াও।

খেতে চাইলে খাবে। এর সাথে অন্য কোনো কিছুকে মিলিও না। আজাদ জবাব দেয়।

মিলিও না মানে কী? রানা বলে, মিলিও না নয়, কথাটা হবে মিলি ও হ্যাঁ।

খাওয়ানোর বেলায় মায়ের মতোই দিলদরিয়া আজাদ। সোৎসাহে বন্ধুদের নিয়ে যায় গ্রান্ড জাহাঙ্গীর হোটেলে। কাবাব-তন্দুর খাইয়ে দেয় ভরপেট।

মাকে চিঠি লিখে মিলির কথা জানায় আজাদ। মা ছাড়া এ পৃথিবীতে কে আছে আর তার! তাঁকে তো অবশ্যই তার জীবনের সব কথাই বলতে হবে।

মা মনে মনে খুশিই হন। ছেলের বউয়ের জন্য তিনি অনেক ভরি গয়না আলাদা করে রেখে দিয়েছেন। এগুলো বউয়ের হাতে দিতে পারলে না তাঁর শান্তি!

কিন্তু একদিন হঠাৎ করেই ক্লাসে আসা বন্ধ করে দেয় মিলি। আজাদ যায় মিলির খালার বাসায়। মিলির খালা বলেন, মিলির তো বিয়ে হয়ে গেছে। হঠাৎই ভালো সম্বন্ধ এসেছে। বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। ছেলে বাঙালি। লাহোরে পোস্টিং।

'আশ্চর্য তো। মিলি আমাকে কিছুই বলল না।'

'বলবে কী করে? ও জানে নাকি! আমরাই জানি না।'

ব্যাপার আজাদ এটুকুনই শুধু জানতে পারে। বেশি কিছু নয়। কিন্তু এর-ওর মাধ্যমে আজাদের বন্ধুরা জেনে যায়, আজাদের বাবা যে দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন, এই খবর, আর তার বাবার সঙ্গে আরো আরো মেয়ের সম্পর্ক আছে এ ধরনের গুজব মিলিদের বাসায় গিয়ে পৌঁছেছিল। মিলির বাবা-মা তাই চান নাই আজাদের সঙ্গে মিলির কোনো সম্পর্ক হোক। সে কারণেই তড়িঘড়ি করে মিলিকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজাদকে জানতেও দেওয়া হয় নাই।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ বেধে যায়। করাচিতে ব্ল্যাক আউট হয় মাঝেমধ্যেই। আজাদের এই অন্ধকার সহ্য হয় না। অন্ধকার হলেই তার মনে পড়ে যায় মিলির কথা। মেয়েটা তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলত। তার দুচোখে সে দেখতে পেয়েছিল মুগ্ধতা। এমন কি আজাদের মধ্যে কী কী দেখে সে পটে গেছে, এসব নিয়েও সে কথা বলেছিল। তাহলে সে হঠাৎ এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারল! মেয়ে মাত্রই কি অভিনেত্রী! শুধু মিলি প্রসঙ্গ নয়, তার খারাপ লাগে যখন মনে পড়ে পরীক্ষার রেজাল্ট। পরীক্ষা সে তত খারাপ দেয় নাই, কিন্তু তার রেজাল্ট তেমন ভালো হয় নাই। এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। স্যাররা কি বাঙালি বলে তাকে কম নম্বর দিয়েছেন? এটা কি হতে পারে! তাও কি হয়! তার খারাপ লাগে। চারদিকে অন্ধকার। ইন্ডিয়ান বিমান আসবে, এই ভয়ে। মরার বিমান আসে না কেন? কেন মাথায় বোমা মেরে সব কিছু ধ্বংস করে দেয় না! একটা মোমবাতি জ্বালাবে নাকি সে? না। জ্বালাবে না। এই অন্ধকারই তার ভালো লাগে।

আজাদ নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে আরো বেশি করে বাঙালি সমিতি আর বাংলা ক্লাবের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে ফেলে।

পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর ভারত-বিরোধিতার ধুয়া তুলে রেডিওতে রবীন্দ্রসংগীত থেকে শুরু করে হিন্দু লেখকদের গান প্রচার করা, দেশে ভারতীয় বই আমদানি করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হতে থাকে। সিনেমা হলে আর আসবে না উত্তম-সুচিত্রার ছবি। এরই প্রেক্ষাপটে আসে ২১শে ফেব্রুয়ারি। পূর্ব পাকিস্তানে ২১শে ফেব্রুয়ারি মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে শুনতে পেয়ে করাচিতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি ছেলেরা বাঙালি সমিতির মাধ্যমে জোরে-শোরে ২১শে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান পালন করে। দুদিন অনুষ্ঠান হয়। একদিন ছিল আলোচনা অনুষ্ঠান। আরেকদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুদিনই অনুষ্ঠান শুরু হয় আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গান দিয়ে।

আজাদ এ অনুষ্ঠান নিয়ে একটু বেশিই মাতামাতি করে। ক্লাস করার সময় তো সে পায়ই না, মাকে চিঠি লেখার সময়ও সে করে উঠতে পারে না। পরে, ২৬ ফেব্রুয়ারিতে সময় করে নিয়ে মাকে সে লেখেঃ

মা,

চিঠির উত্তর দিতে অনেক দেরি হয়ে গেল। মাফ কোর। একে ত পরীক্ষা কাছে অর্থাৎ ১২ জুন শুরু হবে। এদিকে ২১ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি সমিতির দুইটা ফাংকশন করতে হয়েছে। তাই চিঠি লেখার এমনকি ক্লাস করার সময় পাই নাই। যা হোক আমি এখন ভালই আছি। পড়াশুনা শুরু করি নাই। করবো। দোয়া করো। তুমি কেমন আছ, চিঠির উত্তরে জানাইও। খাওয়া-দাওয়া ঠিক মত করো। এবং বসন্তের টিকা মনে করে নিও।

আর সেই যে একটি মেয়ের কথা লিখেছিলাম ওর বিয়ে হয়ে গেছে। জীবনের একটা বিরাট দিক আমি হারালাম আর পাব না। আমি বুঝতে পারছি না আমার সব ব্যাপারে কপাল খারাপ! জীবনে শান্তি বোধ হয় মৃত্যু পর্যন্ত পাব না। দোয়া করো যেন কিছু মনে শান্তি পাই। চারদিক থেকে অশান্তি আমাকে ঘিরে রেখেছে। যা হোক এখন আসি।

ইতি তোমার আজাদ

এ চিঠির জবাবে মা লেখেন, ফাংশান নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার দরকার নাই। আজাদকে তিনি মনে করিয়ে দেন, করাচিতে তাকে পাঠানো হয়েছে লেখাপড়া করার জন্য। ভালো রেজাল্ট করার জন্য। অন্য কোনো কিছু করে সে যেন সময় নষ্ট না করে। মা আরো লেখেন, পড়াশোনা করে মানুষ হয়ে তুমি মাকে খাওয়াবে পরাবে ভালো রাখবে, এ আশায় আমি তোমাকে পড়তে বলছি না। তোমার নিজের জন্যই তুমি পড়াশোনা করবে। ভালো রেজাল্ট করবে। মানুষের মতো মানুষ হবে। মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

১৪

চৌধুরী সাহেব আজাদকে করাচি পাঠিয়েছিলেন আসলে দুটো উদ্দেশ্যে। এক: ছেলের ভালো লেখাপড়া হোক। দুই: আজাদের মা দুর্বল হোক। প্রথমটা হয়তো ভালোই চলছে, কিন্তু দ্বিতীয়টা? সাফিয়া বেগম কি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করবে না! তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করবে না! ফরাশগঞ্জের বাসা থেকে এসে এই ইস্কাটনের বাসায় উঠবে না! তাহলে কীভাবে তাকে বশ্যতা স্বীকার করানো যায়? তাঁর কুবুদ্ধিদাতারা পরামর্শ দিল, এই সুযোগ, আজাদের মাকে ফরাশগঞ্জের বাসা থেকে উচ্ছেদ করে দিন। বাসা ভাড়া নিয়ে থাকুক ঢাকায়, সব তেজ গলে পানি হয়ে যাবে। বাপ বাপ করে চলে আসবে আপনার পা ধরে ভিক্ষা মাগতে। ও ভেবেছে কী! সম্পত্তিগুলো সব ওর নামে বলে ওগুলোর মালিক ও হয়ে গেল। ও যা খুশি তা করতে পারবে। ওকে একটু বোঝানো দরকার যে ঢাকা শহরটা এখনও চৌধুরীর কথায় চলে। চৌধুরী যা চাইবে, তাই হবে।

চৌধুরী এক রাতে আসেন ফরাশগঞ্জের বাসায়। নিচের ঘরে বসেন। আজাদের মা তখন এশার নামাজ পড়া শেষে তেলাওয়াত পড়ছিলেন। তাঁর কাছে দৌড়ে যায় জায়েদ। আম্মা আম্মা, আজাদ দাদার আব্বা আইছে।

'কে?'

'চৌধুরী সাবে।'

'কেন এসেছে? তাকে যেতে বল। তুই বের হ ঘর থেকে। আমি দরজা আটকে দেব। তুই গিয়ে বল আমি দেখা করব না।'

জায়েদ নিচে নামে। চৌধুরী সাহেবকে জানায় সাফিয়া বেগমের বক্তব্য: এক্ষুন আপনেরে চইলা যাইতে কইছে, ঘরে খিল দিছে, আর কইছে জীবনেও আপনের মুখ দেখব না।

চৌধুরী বলেন, 'জায়েদ, শোনো, আজাদের মাকে বলো, ৭ দিন সময় দিলাম, ৭ দিনের মধ্যে আমার সাথে দেখা করে আমার পায়ে ধরে মাফ না চাইলে আমি এই বাড়ি থেকে সবাইকে তাড়িয়ে দেব। বুঝলে?'

জায়েদ চুপ করে থাকে।

'বোঝো নাই। তোমার আম্মাকে বলবা আমার সাথে দেখা করে মাফ চাইতে। না হলে এ বাসা থেকে বের করে দেব।' চৌধুরী সাহেব গটগট করে চলে যান।

আজাদের মা সব শুনতে পান জায়েদের কাছ থেকে। কিন্তু তিনি অনন্যোপায়। কী করবেন? চৌধুরীর সাথে দেখা করার প্রশ্নই আসে না। মাফ চাওয়া? জীবন থাকতে নয়। আর এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়া? যেতে হলে যাবেন।

আজাদকে খবর পাঠানো যায়। সেটাও উচিত হবে না। কারণ তার পরীক্ষা চলছে।

একদিন সত্যি সত্যি গুণ্ডাপাণ্ডা চলে আসে ফরাশগঞ্জের বাসায়। এ বাসা ছাড়তে হবে। আজই। এখনই।

আজাদের মা রুখে দাঁড়ান, ফাজলামো পেয়েছ তোমরা, এটা আমার বাসা, কেন আমি বাসা ছাড়ব, ছেড়ে পাঁচ পাঁচটা ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় যাব?

গুণ্ডারা বলে, এটা যে আপনার বাড়ি, কোনো প্রমাণ আছে?

প্রমাণ তো সাফিয়া বেগম সঙ্গে রাখেন নাই। ইস্কাটনের বাড়ি, এ বাড়ি, গেণ্ডারিয়ার আরো আরো সম্পত্তি সব তাঁর নামে। এটা তিনি জানেন। কিন্তু দলিল তো একটাও তাঁর কাছে নাই। আর এদিকে গুণ্ডারাও কোনো কথা শুনছে না। তারা জিনিসপত্র ধরে একটা একটা করে নিচে রাস্তায় নামিয়ে দিচ্ছে। আজাদের মার মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। কিন্তু মাথা গরম করলে তো চলবে না। উপায় একটা বের করতে হবে। তিনি বের হন। পাশের একটা বাসায় গিয়ে ফোন করেন পুলিশের ডিআইজি আলম সাহেবকে। আলম সাহেব লোক ভালো, তাঁর পূর্বপরিচিত, আর তাঁর গত ক বছরের দুর্দিনে তিনি মাঝেমধ্যে এসে খোঁজখবর নিয়ে গেছেন। আলম সাহেবকে পাওয়া যায়। তিনি ঘটনা শোনেন। এক্ষুনি কী করা যায় তার উপায় করবেন বলে আশ্বাস দেন। কিন্তু তাঁর পক্ষেও বেশি দূর তৎপরতা করা সম্ভব হয় না। ইউনুস চৌধুরীর সখ্য গভর্নর মোনায়েম খাঁ পর্যন্ত, তিনি দাবি করেছেন এই বাড়ি তাঁর, আর সাফিয়া বেগম এটায় অন্যায়ভাবে জোর করে বসবাস করছে। তাদের হটিয়ে দেওয়াটাই হলো ন্যায়। ডিআইজি আলম সাহেব ফরাশগঞ্জের বাসায় চলে আসেন। তিনি উচ্ছেদ করতে আসা গুণ্ডাপাণ্ডাদের বলেন কোনো রকমের জুলুম জবরদস্তি না করতে। গুণ্ডারা বলে, এটা আপনাকে কইয়া দিতে হইব না, আমগো ওপর হুকুম আছে, আমরা কাউরে অপমান করুম না। আলম সাহেব সাফিয়া বেগমকে জানান তাঁর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা, ক্ষমা চান তাঁর কাছে। সাফিয়া বেগম বলেন, এখন এই ছোট ছোট বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আমি কই যাব। একটা বিহিত করে দেন ভাই।

আলম সাহেব বলেন, ঠিক আছে আমি দেখছি কোনো বাসা ভাড়া পাওয়া যায় কিনা।

জুরাইনের মাজারের সামনে একটা ছোট্ট বাসা খালি পাওয়া যায়। রাস্তার ওপরে সব জিনিসপাতি ছড়ানো, উপায়ান্তর না পেয়ে সাফিয়া বেগম জুরাইনের বাসায় এসে ওঠেন। টিনের ঘর। মেঝেটা অবশ্য পাকা। সেটাই কিছুটা সান্ত্বনা। দুটো মাত্র ঘর। তার মধ্যে এতগুলো মানুষ। কোনো আসবাবপত্র নাই।

থালাবাসন কিছু আনা গেছে। তাতে রান্না চড়াতে হয়। আবার গয়নার বাক্সে হাত দেন সাফিয়া। আলম সাহেব অবশ্য কিছু টাকা ধার দিয়ে গেছেন। তাঁরই লোক দিয়ে দুটো সস্তা খাট আর এটাসেটা জিনিসপাতি কেনানো হয়।

জায়েদের বড় কান্না পায়। সে হঠাৎ করে আবার, যেমন তার হয়েছিল তার মার মৃত্যুর পরে, সবকিছুকে নীল দেখতে থাকে। নিজেকে তার মনে হয় বড় অভাগা। তার মা নাই। বাবা থেকেও নাই। খালার কাছে আছে তারা, আর খালার ওপরে একে একে কত গজব নেমে আসছে। এই এতটুকুন ফকিরের বাড়ির মতো বাড়িতে তারা থাকবে কেমন করে!

দিন যায়। তারা জুরাইনের বাসা ছেড়ে আরেকটু ভালো দেখে একটা বাড়িতে ওঠে মালিবাগ মসজিদের সামনে। এখানে তবু আজাদকে রাখার একটা পরিসর মিলবে।

সাফিয়া বেগম কিন্তু আজাদকে তাঁর এইসব বিপর্যয়ের কথা কিছুই জানতে দেন না। কারণ ছেলের পরীক্ষা। শুধু আজাদকে চিঠি লিখে জানান, পরীক্ষা শেষে সে যেন প্রথমে তার বাবার কাছে যায়, দাদা-দাদির কাছে যায়, তাদের সালাম করে। কারণ এটাই হলো তাঁর জীবনের বড় বিজয়। যে তাঁর ছেলেকে তিনি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে পেরেছেন।

পরীক্ষা শেষ করেই আজাদ ছুটে আসে ঢাকায়। উফ। কী দম বন্ধ করা সময়ই তার গেছে এই করাচির দিনগুলোতে। মধ্যখানে সে অবশ্য ছুটিছাটায় এসেছে দু বার। প্লেনের টিকেটের দাম বেশি হওয়ায় ঘনঘন আসা সম্ভব হয় নাই। এসে বন্ধুবান্ধবদের সাথে দেখা করা, আড্ডা দেওয়া ইত্যাদি করতে না করতেই আবার এসে গেছে ফিরে যাবার তারিখ। এবার সে ছুটি পাবে বেশ কিছু দিনের জন্য। গ্রাজুয়েশনের জন্য পরীক্ষা হয়ে গেল। এরপর মাস্টার্স। বিমান যখন ঢাকা এয়ারপোর্টের রানওয়ে স্পর্শ করে, সঙ্গে সঙ্গে এক অনাবিল আনন্দে আজাদের হৃদয় ওঠে ভরে। সে নিজেই নিজেই হেসে ওঠে।

মাকে সে চিঠি লিখেছিল ফেরার দিনক্ষণ জানিয়ে। এয়ারপোর্টে দেখতে পায় জায়েদ আর তার এক মামা দাঁড়িয়ে। জায়েদ দাদা দাদা বলে জড়িয়ে ধরে আজাদকে। আর আজাদকে দেখা যাচ্ছে কত সুন্দর। ফিটফাট পোশাক, গলায় টাই ঝুলছে, জায়েদের কিছুটা অস্বস্তি লাগে, ভেতর থেকে শ্রেণী-ভেদটা একটুখানি উঁকি দেয়। কিন্তু সেও সাময়িক। আজাদ দাদা তার আগের মতোই আছে।

'চল চল, একটা ট্যাক্সি নিয়া চল বাসায় যাই। মা নিশ্চয় অস্থির হয়ে আছে। ফ্লাইটটা একটু ডিলে হয়েছে তো।' আজাদ তাড়া লাগায়।

তারা এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসে। ট্যাক্সি ভাড়া করতে হবে।

জায়েদ ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে, যাইব, ইস্কাটন?

'ক্যান রে ইস্কাটন ক্যান। ফরাশগঞ্জ যাবো' -আজাদ বলে।

'আম্মা আপনেরে ইস্কাটনে উইঠা রেস্ট টেস্ট লইয়া তারপরে যাইতে কইছে আমগো বাড়ি' -জায়েদ বলে।

'আমাকে রেস্ট নিতে হবে ইস্কাটনে? কী যে বলিস না তুই। চল চল ফরাশগঞ্জ।'

জায়েদ কী বলবে আজাদকে? তারা যে ফরশগঞ্জের বাসা থেকে বিতাড়িত, এটা তো আজাদ জানে না। তাকে জানানোর কাজটা কে করবে?

ট্যাক্সি চলছে।

আজাদ দু চোখ ভরে দেখে ঢাকা শহর। আহ, সেই পরিচিত রাস্তাঘাট। ফার্মগেট, কাওরানবাজার। সেই রিকশা, সেই ইপিআরটিসির বাস। সেই গরিব গরিব ট্রাফিক পুলিশের মুখ।

'দাদা, আম্মায় কইছে আগে ইস্কাটনে গিয়া আপনে দাদা-দাদিরে সালাম করবেন। তারপর বিকালবেলা আমি আইসা আপনারে আমগো বাড়িতে নিয়া যামু।'

'আরে কথা বেশি কস ক্যান। এই চলো সোজা ফরাশগঞ্জ।'

জায়েদ তো আজাদের সাথে তর্ক করতে পারে না। খানিক পরে সে বলেই দেয়, দাদা, আমরা তো আর ফরাশগঞ্জ থাকি না, মালিবাগ থাকি।

'কেন?'

'আমগো তাড়ায়া দিছে।'

'কে?'

'গুণ্ডাপাণ্ডা আইসা।'

'কী বলিস?'

'জুরাইনে একটা টিনের ঘর ভাড়া লইছিলাম। সেইখানে থাকনের মতো অবস্থা ছিল না। সেইখান থাইকা অহন আইয়া পড়ছি মালিবাগ। মসজিদের সামনে।'

আজাদ গম্ভীর হয়ে যায়। তার মুখ দিয়ে আর কোনো রা সরে না।

মালিবাগের বাসায় যায় আজাদ। এত ছোট বাসা, আসবাবপত্র নাই বললেই চলে, গলির ভেতরে ঢুকতে হয়, এসব দেখে সে ভড়কে যায়। মা কিন্তু হাসিমুখে তাকে বরণ করেন।

আজাদ গম্ভীর স্বরে বলে, তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে, আমাকে বলো নাই কেন?

মা হাসেন। বলেন, তোর পরীক্ষা ছিল না বাবা। এটা এমন কী! এই বাসা তো খারাপ না। চৌধুরী চেয়েছিল আমাদের হার মানাতে। ভেবেছিল বাড়ি ছেড়ে দেবার কথা বললে আমি তার পায়ে গিয়ে পড়ব। আমি তো সেই পদের না। আমি যাইনি নাই। আমারই জিত হয়েছে।

'কিন্তু তোমাদের গুণ্ডা দিয়ে তাড়িয়ে দিল, তার এত বড় সাহস। আমার রিভলভারটা এনেছ না? কই সেটা।'

মা আরো শান্তভাবে হাসেন। বলেন, রিভলভার দিয়ে কী করবি?

'আমি যাই তার কাছে। গিয়ে জিজ্ঞেস করি, তার স্ত্রীকে অপমান করার আগে সে ভেবেছে কি ভাবে নাই যে তুমি আমার মা। আমার মাকে অপমান করে, তার এত বড় সাহস।' আজাদ উঠে পড়ে। 'ডালু কই, জায়েদ আমার রিভলভার কই।'

মা তার হাত ধরেন। বলেন, 'খবরদার আজাদ, মাথা গরম কোরো না, সে আমার কিছু না হতে পারে, সে তোমার বাবা। স্বামী-স্ত্রী ছাড়াছাড়ি হতে পারে, কিন্তু বাপ-ছেলেতে কখনও ছাড়াছাড়ি হয় না। সে তোমার বাবাই। নিজের বাবাকে অপমান করতে হয় না।'

'না, আমি আজকা হেরে মাইরাই ফেলামু।' রাগে আজাদের মুখ দিয়ে ঢাকাইয়া বাক্য বেরুতে থাকে।

'এ দিকে আসো। এই আমার মাথার কিরা লাগে। বাপের সাথে গণ্ডগোল কোরো না। এটা তার আর আমার ব্যাপার। এর মধ্যে তোমার আসার দরকারই নাই।'

আজাদ রাগে ফোঁসে। কিন্তু কিছুই আর করার নাই। মা তাকে মাথার কিরা দিয়েছেন। সে সব কিছু করতে পারে, মায়ের মাথার কিরার অবাধ্য তো হতে পারে না।

মা বলেন, এতদিন পরে এসেছ, যাও, হাতপা ধো, জিরিয়ে নাও। তোমার জন্য ভাত-তরকারি রেঁধে রেখেছি। খেতে বসো।

১৫

কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে আজাদ আবার চলে আসে করাচিতে। এমএ-তে ভর্তি হয়। একটা ব্যবসাও সে শুরু করে সেখানে। ব্যবসায় সে ভালো করবে, এই রকম আশা তার ছিল। এ-সময় সে মাকে মাঝেমধ্যে টাকা পাঠাত। মাকে সে চিঠি লিখত নিয়মিত, আর সেসব চিঠিতে মাকে বার বার করে অনুরোধ করত মা যেন তাঁর শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেন। লিখত মা যেন টাকার জন্যে চিন্তা না করেন। দরকার হলেই যেন ব্যাংক থেকে সোনা তুলে মা বিক্রি করে দেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করেন। সে লিখেছিলঃ টাকার দরকার হলে যদি তুমি বিক্রি না করো, তবে আমি দুঃখিত হব। এইসব গয়না কারু জন্যে রাখতে হবে না। এই আমার অনুরোধ। কিন্তু মা সোনায় হাত দিতে চাইতেন না। এই সোনা তো আসলে আজাদের বউয়ের হক। ছেলে বিয়ের সময় কনেকে সোনা দিয়ে সাজাতে হবে না!

হোস্টেল ছেড়ে দিয়ে একটা ছোট বাসা ভাড়া নিয়েছিল আজাদ। মাকে লিখেছিল,

মা,

আমি ভালই আছি। আমার জন্য কোন চিন্তা করিও না। চিঠি লিখতে অবশ্য দেরি হয়ে গেল।

দোয়া করো, এখনো কোনো অসুবিধা হয় নাই। ব্যবসা ইনশালাহ ভালই চলবে মনে হয়। আমি ছোট্ট একটা বাড়ি নিয়েছি। কয়েক মাস পরে বড় বাড়ি নেব, তখন তোমাকে নিয়ে আসব। আর এই মাসের শেষের দিকে তোমাকে আমি কিছু টাকা পাঠাব। আগেও পাঠাতে পারি, ঠিক নেই। তবে দেরি হবে না। তুমি কোথায় থাকবে তখন চিঠি দিয়ে জানাইও। এমএ তে ভর্তি হয়ে গেছি।

আর বিশেষ কিছু লেখার নেই। দোয়া করো যেন ইনশালাহ ব্যবসাতে উন্নতি করতে পারি।

ইতি

আজাদ

ঠিকানা

AZAD
646, C, CENTRAL COMMERCIAL AREA
PECHS
KARACHI 29

এই চিঠি লিখিত হবার ২০ বছর পরে জায়েদ আজাদের এইসব চিঠি পড়ে, আর তার মনে নানা প্রতিক্রিয়া হয়। কোনো চিঠিতে আছে, মা, টাকার অভাবে তোমাকে চিঠি লিখতে পারি নাই। কী রকম অর্থকষ্টটাই সহ্য করতে হয়েছিল আজাদকে যে একটা চিঠি পোস্ট করার মতো টাকা তার ছিল না। জায়েদ একটা এরোগ্রাম মেলে ধরে। এটায় খাম আর চিঠি একই কাগজে লিখতে হতো। তাতে বোধ করি ডাকখরচ কম পড়ত।

BY AIR MAIL
INLAND
AEROGRAM
If anything is enclosed
this letter will be sent by ordinary mail

ইংরেজি, উর্দু আর বাংলায় লেখা পাকিস্তান। পোস্টেজ ১৩ পয়সা। আর তাতে টিকেটের ঘরের মতো চৌকোয় যে ছবিটা আঁকা সেটা পূর্ব বাংলার, নারকেল গাছ, ধান বা পাটক্ষেত আর নদীতে পালতোলা নৌকা।

মাত্র ১৩ পয়সা যোগাড় করতেও কষ্ট হয়েছিল আজাদ দাদার!

করাচি বিশ্ববিদ্যালয়েই আজাদের পরিচয় ঘটে আবুল বাশারের সঙ্গে। টাঙাইলের সম্পন্ন ঘরের ছেলে বাশার। পড়তে গেছে করাচিতে। বাঙালি সমিতি করে। সমিতির অনুষ্ঠানের জন্য খায়-খাটুনি করে। আর তার আছে বই পড়ার অভ্যাস। আজাদের রুমে এসে দেখে প্রচুর বই, নানা রকমের ইংরেজি উপন্যাস, বাশার ধার নেয় সেসব বই। আবার সময়মতো ফিরিয়েও দেয়। এভাবেই আজাদের সঙ্গে বাশারের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।

বাঙালিরা যখন একত্রিত হয়, তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি ঘোষণা করেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের সমাবর্তন উৎসবে মোনায়েম খানের হাত থেকে সনদ নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আন্দোলন করেছে, ছাত্রদের ওপরে হামলা হয়েছে, গ্রেপ্তার হয়েছে বহু ছাত্র, ৬ দফার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, শেখ মুজিব প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় জনসভা করে ৬ দফার পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন, আইয়ুব খান দমননীতির আশ্রয় নিচ্ছেন, শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সঙ্গে আরো আরো নেতা আর কর্মীকে, তাঁর মুক্তি ও ৬ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়েছে, হরতালে গুলি চলেছে, ঢাকা নারায়ণগঞ্জে বহু শ্রমিক হতাহত-ঘটনা ঘটতে থাকে দ্রুত। এইসব নিয়ে বাঙালি ছাত্রেরা তর্ক-বিতর্ক করে, বাম-ঘেঁষা ছাত্ররা মনে করে, আওয়ামী লীগ বুর্জোয়াদের দল, তাদের দ্বারা জাতীয় মুক্তি অসম্ভব।

ইউনুস আহমেদ চৌধুরী জার্মানি যান। সেখান থেকে তিনি চিঠি লেখেন সাফিয়াকে। বড়ই আবেগপূর্ণ চিঠি। সাফিয়াকে তিনি সম্বোধন করেন প্রাণের পুতুল বলে। তিনি তাঁর জন্য হা-হুতাশ করেন, নিজের ভুলের কথা স্বীকার করেন, তাঁকে ছাড়া যে তার চলছে না, তিনি তিষ্ঠোতে পারছেন না, এটা তিনি বলেন বড়ই আকুল স্বরে। তিনি সব কিছু ভুলে আবার সাফিয়াকে তাঁর কাছে আসতে বলেন। মিনতি করেন আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করতে।

চিঠি পেয়ে সাফিয়া আরো কঠিন হয়ে পড়েন। না, মিষ্টি কথায় ভোলা যাবে না। কত কষ্ট করে ছেলেকে নিয়ে তিনি একা দিনগু জরান করছেন। ছেলেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। ছেলেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করিয়েছেন, আইএ পাস করিয়েছেন, বিএ পাস করিয়েছেন, এখন ছেলে এমএ পড়ছে। কত কষ্টই না তাঁর হয়েছে এই কটা বছর। গয়না বিক্রি করে পুঁজি যোগাড় করে ব্যবসা করতে দিয়েছেন একে-ওকে। কিন্তু টাকা লগ্নিই সার হয়েছে, লাভ তো দূরের কথা, তিনি আসলই ফিরে পান নাই। তাঁর ছেলেও কত কষ্ট করেছে। টাকার অভাবে চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারে নাই। শেষতক তাকে ব্যবসায় নামতে হয়েছে। এত কষ্ট সহ্য করে এতটা কাঁটা-বিছানো পথ পাড়ি দিয়ে অনেক রক্ত ঝরিয়ে যখন প্রায় মসৃণ পথে তাঁরা এসে পড়েছেন, তখন কিনা তিনি নতি স্বীকার করবেন।

আমেরিকা গিয়েছিলেন ইউনুস চৌধুরী। সেখান থেকেও তিনি সাফিয়াকে চিঠি লিখেছেন ভয়ানক কাকুতি-মিনতি করে। লিখেছেন, হাজার হাজার মাইল দূরে এক অচেনা জায়গায় বসে আর কাউকে নয়, শুধু তোমাকে মনে পড়ছে বলে তোমাকেই চিঠি লিখতে বসেছি। মানুষ মাত্রই ভুল করে। আমিও একটা ভুল করেছি। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করে দিতে পারো না? আমাদের আগেকার সুখের জীবনে আবার কি আমরা ফিরে যেতে পারি না? আমি যেখানেই যাচ্ছি, প্রাণে তো সুখ পাচ্ছি না। তোমাকে ছাড়া

এ জীবনে আর সুখ পাব না, এটা নিশ্চিত। শুধু মৃত্যুর পরে যেন হাশরের ময়দানে তোমার মুখটা আমি দেখতে পাই। যেন তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি।

চিঠি পেয়ে সাফিয়ার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। তিনি খানিকক্ষণ ঝিম ধরে বসে থাকেন। লোকটা এখন মৃত্যুর পরে হাশরের ময়দানে তাঁর দেখা পাবে বলে অপেক্ষা করছে। নতুন বিয়ে, নতুন সম্পর্ক–এসব কিছুতে তাঁর আত্মা সুখ পেল না! পাবার তো কথা না! নিজের ছেলে, নিজের স্ত্রীকে ফেলে যারা অন্যের কাছে যায়, জীবনে সুখ কিংবা স্থিতি তারা কে কবে কোথায় পেয়েছে! মরীচিকার দিকে ছুটলে তো তৃষ্ণা মেটে না। বরং বিভ্রান্তি আর পণ্ডশ্রমে জীবন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় মাত্র।

কী করবেন সাফিয়া বেগম? ফিরে যাবেন চৌধুরীর কাছে? ফিরে যাবেন ইস্কাটনের বাড়িতে? কর্তৃত্ব তুলে নেবেন ওই বাড়ির! যে চিত্রা হরিণটা তাঁর হাতে সবুজ গাছের পাতা খাবার জন্য রোজ ভোরবেলা কাতর নয়নে তাকিয়ে থাকত, সে যে তাঁকে তার নীরব চোখের ভাষায় ডাকছে। পোষা কুকুর টমি যে রোজ দরজার দিকে তাকিয়ে আছে তাঁর ঘ্রাণ শুঁকবে বলে! গৃহপরিচারিকা জয়নব নাকি এখনও রোজ রাতে মিহি সুরে কাঁদে! আত্মীয়স্বজন আশ্রিতেরা নাকি তাঁর অনুপস্থিতির কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

সাফিয়া বেগমের মনটা দুর্বল হয়ে পড়ে। সারাদিন তিনি ঘোরের মধ্যে থাকেন। রাত্রিবেলা ভালো করে ঘুম হয় না তাঁর। ভোরবেলা ফজরের নামাজ পড়ে আবার তিনি চিঠিটা মেলে ধরেন। আগাগোড়া পড়েন। পড়তে পড়তেই সেই নাট্যদৃশ্য আবার তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে: ষোলশ গোপিনী টানাটানি করছে কৃষ্ণরূপী চৌধুরীকে, মুহূর্তে তাঁর সমস্ত সত্তা জুড়ে নাছোড় প্রত্যাখ্যানের শক্তি জেগে ওঠে, সমস্ত আকাশ–বাতাস যেন বলে ওঠে: না। তিনি ফিরে যেতে পারেন না। চৌধুরীর এই হলো কৌশল। এভাবেই সে একের পরে এক নারীকে মোহজালে আটকে ফেলে। তাঁর এই ছল সাফিয়া বেগমের ভালো করেই জানা আছে।

আর তাছাড়া তাঁর প্রতিজ্ঞার একটা দাম আছে না? তিনি চৌধুরীকে বলেছিলেন ওই অনৈতিক সম্পর্কটাতে না যেতে, স্পষ্ট ভাষাতেই তো জানিয়েছিলেন, ওই মহিলাকে বিয়ে করার একটাই মানে, মৃত্যুর পরেও সাফিয়ার মুখ আর চৌধুরী দেখতে পাবে না।

সাফিয়া বেগম তাঁর স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের পরে আরো ২৪ বছর বেঁচে ছিলেন, তিনি তাঁর কথাটা আশ্চর্যরকমভাবে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। একই শহরে তাঁরা ছিলেন ২৪টা বছর, কখনও কখনও একই পাড়াতেই, একই মাহফিলে, একই মাজারে, একই মিলাদে দুজনই গিয়েছেন, এ–রকম একাধিকবার হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য যে কেউ কারো মুখ দেখতে পান নাই।

জায়েদ এ কথা স্মরণ করে। তার মনে পড়ে, আম্মা বলতেন, পাবে না রে, পাবে না, আমার মুখ সে বেঁচে থাকতে দেখতে পাবে না।

১৬

সাফিয়া বেগমের শরীরটা খারাপ। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। রাত্রিবেলা কাশির গমকে ঘুম আসতে চায় না। একটুক্ষণ চোখ জোড়া লাগতে না লাগতেই আবার কাশির চোটে তিনি জেগে ওঠেন। বুকের মধ্যে টান পড়ে। তাঁর পাঁজর হাপরের মতো ওঠানামা করে। হা করে তিনি শ্বাস নেন, শ্বাস ছাড়েন গোঁয়ারের মতো। চোখ পানিতে ভরে ওঠে। বিছানায় বসে থাকেন। তাঁর অসুখটা যে বেড়েছে, এই খবর তিনি আজাদকে জানান নাই। খবর পেলে ছেলে উতলা হয়ে পড়বে, পড়াশোনা বাদ দিয়ে ছুটে আসবে মাকে

দেখতে। শরীর তো যন্ত্রেরই মতো, মাঝেমধ্যে একটু বিগড়াবেই। তাই নিয়ে একেবারে ডাক্তার ডাকো রে, হাসপাতালে চলো রে, আত্মীয়স্বজনদের খবর দাও রে করে জগতটাকে আছড়ে-পিছড়ে মারার তো দরকার নাই। নীরবে সহ্য করতে পারলে আর কিছুই লাগে না।

কিন্তু এবার ব্যারামটা তাঁকে সাঁড়াশির মতো করে চেপে ধরেছে। মনে হচ্ছে, এতটুকুন শরীর এতটা ধকল এ যাত্রা আর সইতে পারবে না। ডালু ডাক্তার ডেকে এনেছিল। ডাক্তার ওষুধ দিয়েছে। ভালো ভালো খেতে বলেছে। অসুখ বেশি হলে বলেছে হাসপাতালে নেবার জন্যে। কিন্তু সাফিয়া বেগম টাকা খরচ করতে চান না। ব্যাংকের ফোল্ডে তাঁর গয়না জমা আছে, এখন তাঁর চিকিৎসার জন্যে সেই গয়নার কিছুটা তুলে বেচতে তাঁর মন থেকে সাড়া আসে না। ছেলের পড়ালেখার খরচের জন্য টাকা খরচ করা যায়, গয়নাও বিক্রি করা যায়, কিন্তু নিজের চিকিৎসার জন্যে কি তা করা যায়? গয়না কি তাঁর, নাকি তাঁর ছেলের বউয়ের?

আজকের রাতটা মনে হয় আর পার হবে না-এতটাই কষ্ট হচ্ছে সাফিয়া বেগমের। বাইরে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, বাতাসে জলকণা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, তাতেই তাঁর শ্বাসকষ্টটা গেছে বেড়ে। একটা ওষুধের ভাপ মুখে টেনে নাকে নিতে হয়, দাম বেশি বলে তিনি সেটা সাধারণত ব্যবহার করেন না, সেটা এখন হাতের কাছে থাকলে ভালো হতো।

বিছানায় বসে থেকে অতিকষ্টে তিনি শ্বাস টানেন। আজকের রাতটা কি আর পার হবে না?

তখন তাঁর খুব আজাদকে দেখতে ইচ্ছা হয়। শরীরটা তাঁর আর চলছে না, কী জানি যদি না টেকে, যদি আজ রাতেই তাঁর মৃত্যু লেখা থাকে, তাহলে তো আর আজাদের মুখটা তিনি মরার আগে দেখতে পাবেন না। ছেলেকে খবর না দেওয়াটা মনে হয় ভুলই হলো!

শেষরাতে সাফিয়া বেগমের কাশির গমক খুব বেড়ে গেলে মহুয়ার ঘুম ভেঙে যায়। সে উঠে দেখে, আম্মার প্রাণ বুঝি যায়। সে ডালুকে খবর দিলে ডালু এসে তাঁকে ঘুমের ওষুধ ডাব্‌ল ডোজ খাইয়ে দেয়। কাশি তাতেও কমে না, শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ে, একসময় সাফিয়া বেগম ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের আগে তিনি লাইলাহা ইলাল্লাহু পড়ে নেন, তাঁর মনে হয়, এই ঘুমই তাঁর শেষ ঘুম, তিনি আর কোনোদিন জাগবেন না, ঘুমের আগে তিনি আজাদের মুখটা মনে করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তার বড়বেলার চেহারাটা কিছুতেই তাঁর মনে আসে না, কেবল ছোটবেলায় যখন সে কেবল স্কুল যেতে শুরু করেছে, সেই সময়ের চেহারাটা মনে আসে, স্কুলের ব্যাগ কাঁধে, পায়ে কেডস, আজাদ ফিরছে...

ঘুম ভেঙে গেলে তিনি দেখতে পান, তাঁর শিয়রের কাছে বসে আজাদ, তাঁর ধন্দ লাগে। তিনি কি জেগে আছেন, নাকি স্বপ্ন দেখছেন। নাকি এটা ঠিক মরজগত নয়, তিনি অন্য কোথাও। শরীর খুবই দুর্বল, জোর পাওয়া যাচ্ছে না একটুও, কিন্তু ধীর গলায় কে যেন ডাকছে, এ যে ঠিক আজাদেরই গলা। তিনি চোখ খোলেন। দেখেন তাঁর মুখের ওপরে আজাদের মুখ।

তিনি বলেন, আজাদ? কখন এলে বাবা?

'এই তো এখনই। তুমি ঘুমাও।'

মার মনটা প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। ঘুমটা চোখ দেখে পুরোপুরি উবে যায়, তিনি উঠে বসার চেষ্টা করেন।

আজাদ বলে, না, তুমি শুয়ে থাকো। তোমার শরীর এতোটা খারাপ, তুমি আমাকে খবর দাও নি কেন। কেন আমাকে লোকমুখে তোমার অসুখের খবর পেতে হলো?

'কী এমন অসুখ। এমনি ভালো হয়ে যাব?'

'এমনি এমনি অসুখ ভালো হয়? তোমাকে হসপিটালে নিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।'

'তুই এসেছিস। আমি এখন এমনি ভালো হয়ে যাব।'

মা উঠে পড়েন। বলেন, আজাদ এসেছে, আর আমি শুয়ে থাকব নাকি! সবাই তাঁকে নিষেধ করে রান্নাঘরে হেঁশেলের ধারে যেতে, চুলার গরমে তাঁর শরীর খারাপ করবে, কিন্তু কে শোনে কার কথা! তিনি সন্ধ্যার মধ্যেই রান্নাঘরে ঢুকে পড়েন, ছেলের কিছু প্রিয় খাবার আছে, তিনি লেগে পড়েন তারই একটা দুটো পদ রান্নায় মহুয়াকে সাহায্য করতে। ছেলের আকস্মিক আগমনের উৎসাহে শরীরটা তাঁর দাঁড়িয়ে যায়, রান্নাঘরের কাজটা ভালোই এগোয়; কিন্তু রাতের বেলা শরীর তার খাজনা আদায় করে নিতে থাকে, তিনি ভয়াবহ-রকম অসুস্থ হয়ে পড়েন।

মহুয়া কচি কাঁদতে থাকে। আজাদ ছুটে যায় রাস্তায়। একটা ফোন করা দরকার। দরকার একটা এম্বুলেন্স। মাকে হাসপাতালে নিতে হবে। এক্ষুনি।

এম্বুলেন্স পাওয়া যায় না। কিন্তু ফোন করে সে তার বন্ধু ফারুকের গাড়িটা পেয়ে যায় ড্রাইভার-সমেত। মাকে নিয়ে সে সোজা চলে যায় ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে। সারাটা রাস্তা সে শুধু আলাহর নাম জপতে থাকে।

কেবিন খালি পাওয়া যায়। মাকে সে ভর্তি করিয়ে দেয় কেবিনে। সারারাত সে বসে থাকে মার শয্যাপাশে। রাত বাড়ে। চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে আসে। ঘড়ির কাঁটার টিকটিক আর মার শ্বাস নেবার শব্দ শোনা যায়।

আজাদ আলাহকে বলে, হে আলাহ, আমার মাকে তুমি বাঁচিয়ে রাখো। আমার মা বড়ো দুঃখী। তিনি আমার জন্য অনেক দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। আমাকে কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তার কষ্টের পালা তিনি অতিবাহিত করেছেন। এখন আমার পালা। আমি করাচিতে ব্যবসা শুরু করেছি। কিছু কিছু লাভও হচ্ছে। ভবিষ্যতে এমএ-টা শেষ করে পুরোপুরি আয় করতে লেগে যাব। ভালো বাসা নেব। মাকে সেই বাসায় তুলব। মাকে আর কষ্ট করতে হবে না। এই সময়টায় মাকে তুমি নিও না। মাকে বাঁচিয়ে রাখো। তাঁকে সুস্থ রাখো। তাঁকে নীরোগ রাখো। তাঁকে সুখে রাখো। তাঁকে শান্তিতে রাখো।

আজাদ বিড়বিড় করে এই প্রার্থনা করে আর তার দুচোখের কোল বেয়ে গরম জল গড়াতে থাকে।

দুদিন পরে মা কিছুটা সুস্থ হলে সে মার সামনে হাজির করে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা সোনার গয়না তোলার কাগজ, বলে, সাইন করো।

'কেন সাইন করব কেন?'

'গয়না তুলতে হবে।'

'না। আমি সাইন করব না।'

'কেন করবা না কেন?'

'এই গয়না আমার না। আমি এটা আমার চিকিৎসার জন্য খরচ করতে পারব না।'

'এই গয়না তোমার না? এগুলো না তুমি তোমার বিয়ের সময় পেয়েছিলে, তোমার বাপের বাড়ি থেকে?

'পেয়েছিলাম। কিন্তু এগুলো আমার জন্য খরচের কোনো অধিকার আমার নাই।'

'মানে?'

'এগুলো তোর বউয়ের হক। আমি এগুলো তার জন্যে জমা করে রেখেছি। এগুলো আমি তোর বউয়ের হাতে তুলে দিতে চাই।'

আজাদ কাঁদবে না হাসবে বুঝতে পারে না। এই মহিলা তো আচ্ছা বাতিকওয়ালা। কবে আজাদ বিয়ে করবে, কবে তার বউ হবে, তার জন্য সে গয়না জমিয়ে রেখেছে, আর নিজে বিনাচিকিৎসায় মরতে বসেছে।

'দেখো মা। তুমি যদি এখন সাইন করলা তো করলা। না করলে আমিও তোমারই ছেলে। আমার কিন্তু তোমার মতোই জেদ। সোজা দুই চোখ যেদিকে চায় চলে যাব। আর কোনোদিন আসব না। করো সাইন। তোমার এত গয়না দিয়ে কী হবে। দুই ভরি এখন বেচি। বাকিগুলো তো থাকলই।'

মা কাগজে স্বাক্ষর করে দিলে ব্যাংক থেকে গয়না তুলে দুই ভরি সোনার জিনিস বিক্রি করে দিয়ে বেশ কিছু টাকা যোগাড় করা যায়। তা থেকে চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করে যা বাঁচে, তা আজাদ রেখে দেয় মহুয়ার হাতে। মার যখন যা লাগে, তা যেন এই টাকা দিয়ে সে কিনে দেয়।

আজাদ ঢাকায় ফিরে এসে যখন হাসপাতাল, ডাক্তার, ব্যাংক ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত, তখন পূর্বপাকিস্তান ধীরে ধীরে ফুঁসে উঠছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়েছে, গ্রেপ্তারপর্ব শুরু হয়ে গেছে। ৬-দফা দাবিও পূর্ববাংলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ করে জারি করা আদেশের প্রতিবাদে এ অঞ্চলের শিল্পী-সাহিত্যিকেরা নানারকম প্রতিবাদী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি ঢাকায় বসবাসকারী উর্দুভাষীদের পক্ষ থেকে নয়জন লেখক ও দুটি প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রপক্ষ সমর্থন করে বিবৃতি দিয়েছেন। যদিও অচিরেই সরকার তাদের রবীন্দ্রবিরোধী আদেশ প্রত্যাহার করে নেয়, তবুও সারাপ্রদেশে সভাসমাবেশ-মিছিল চলতেই থাকে।

এই সব ঘটনা নিয়ে আজাদের কোনো কোনো বন্ধু ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মেনন গ্রুপ, মতিয়া গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গেও সংশিষ্ট কেউ কেউ। আজাদ ব্যস্ত তার মাকে নিয়ে। বন্ধুদের কেউ কেউ ব্যস্ত দেশমাতার জন্যে।

আজাদের আর করাচি ফিরে যাওয়া হয় না। সে সিদ্ধান্ত নেয় সে ঢাকাতেই থেকে যাবে। ঢাকাতেই ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। পাশপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সে এমএটা সম্পন্ন করবে।

মাকে সে জানায় তার সিদ্ধান্তের কথা।

মা বলেন, না, কেন তুই যাবি না। আমার জন্যে? না, তা হবে না? আমার জন্যে তোর লেখাপড়ায় ছেদ পড়বে, এটা আমি হতে দেব না। তুই অবশ্যই করাচি যাবি।

আজাদ বলে, না তো, তোমার জন্য না তো। আমি যাচ্ছি আমার নিজের জন্য। করাচি আমার ভালো লাগে না। পশ্চিম পাকিস্তান আমার ভালো লাগে না। উর্দু বলতে আমার ভালো লাগে না। রুটি-ছাতু খেতে আমার ভালো লাগে না।

মা বলেন, করাচিতে তোর বুঝি খুব কষ্ট হয়।

আজাদ বলে, হয়। কেমন কষ্ট, এটা ঠিক বোঝানো যাবে না। ধরো আমাকে না দেখলে তোমার কষ্ট হয় না? এই রকম কষ্ট। নিজের দেশ হলো আমার নিজের দেশ।

'পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের নিজের দেশ না?'

'না। তুমি ওদেরকে আপন ভাবতে পারো, ওরা ভাবে না।'

'তাহলে তুই কী করবি? যাবি না আর?'

'না। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে যাব 'খন।'

মা মনে মনে খুশি হন। আজাদকে চোখের আড়াল করতে কি তাঁর ভালো লাগে? তবে সেটা তো তাঁর নিজের স্বার্থ। তাঁর নিজের স্বার্থে তিনি ছেলের পড়াশোনার পথে অন্তরায় হতে চান না।

১৭

আজাদ টমাস মানের লেখা দি ম্যাজিক মাউন্টেইন পড়ছিল। সম্প্রতি সে পেঙ্গুইনের মডার্ন ক্লাসিক সিরিজের এ বইটা কিনেছে ৩১১ সরকারি নিউ মার্কেটের গ্রীন বুক সেন্টার থেকে। কদিন হলো মার শরীর অনেকটা ভালো। মা আগের মতোই হাঁটাচলা করছেন। ছেলের জন্য নিজ হাতে ভালোমন্দ কোনো কিছু রাঁধা হয় নাই ভেবে তিনি অস্থির। বার বার করে বলছেন, ডালু ও ডালু, একটু বাজার সওদা কর না বাবা। আমি একটু রাঁধি। আজাদ বলে দিয়েছে, খবরদার মা, হাঁপানি নিয়ে চুলার ধারে যাওয়া একদম মানা। ডাক্তার শুনলে মেরে ফেলবে।

মাকে আজকে আর আটকে রাখা যাচ্ছে না। তিনি রান্না ঘরে ঢুকে পড়েছেন। ভালো ভালো রান্না হচ্ছে।

ডাকপিয়ন চিঠি দিয়ে যায়। আজাদের নামে আসা চিঠি। জায়েদ চিঠিটা গ্রহণ করে। দৌড়ে দিয়ে যায় আজাদকে।

হাতের লেখা দেখেই আজাদ বুঝতে পারে বাশার লিখেছে। চিঠিটা দেখে তার ভালো লাগে। আবার সে খানিক লজ্জিতও বোধ করে। বাশার বেশ কটা চিঠি তাকে লিখল। কিন্তু সে তার উত্তর দিতে পারে নাই। কারণ মার অসুখ। তার ব্যস্ততা। আর চিঠি লেখার ব্যাপারে তার আলস্য। করাচি থেকে মাকে সে বহু চিঠি লিখেছে বটে, কিন্তু ঢাকায় এসে বন্ধুকে চিঠি লেখাটার সঙ্গে তার তুলনা চলে না। প্রথমত মানুষ বিদেশে গেলে মারাত্মকভাবে ভুগতে থাকে আত্মপরিচয়ের সংকটে। তার মনে হতে থাকে, সে যেন নাই হয়ে যাচ্ছে। ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো পেলেও আঁকড়ে ধরে, প্রথম প্রথম প্রবাস-জীবনে প্রবেশ করা মানুষ তেমনি দুহাতে খুঁজে ফেরে তার যত শেকড়বাকড় ডালপালা। আমি আছি। আমি আছি। তোমরা আমাকে ভুলো না। আর তাছাড়া মার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক, এটা আর কারো সঙ্গে তার সম্পর্কের পাশে তুল্য হতে পারে না। করাচি থেকে হরতালের দিনগুলোতে মাকে সে একবার লিখেছিল:

মা,

কেমন আছ? আমি ভালভাবেই পৌঁছেছি। এবং এখন ভালই আছি। হরতাল বন্ধ হয়ে গেছে। রীতিমতো ক্লাস হচ্ছে। পরীক্ষা শীঘ্রই শুরু হবে। দোয়া করো। তোমার দোয়া ছাড়া কোন উপায় নাই। আমি নিজে কী ধরনের মানুষ আমি নিজেই বুঝতে পারি না। আচ্ছা তুমি বল ত সব দিক দিয়ে আমি কী ধরনের মানুষ। আমি তোমাকে আঘাত না দেওয়ার অনেক চেষ্টা করি। তুমি আমার মা দেখে বলছি না; তোমার মতো মা পাওয়া দুর্লভ। এই বিংশ শতাব্দীতে তোমার মতো মা যে আছে কেউই বিশ্বাস করবে না। আমি এগুলি নিজ হৃদয় থেকে বলছি, তোমার কাছে ভালো ছেলে সাজবার জন্য নয়। যদি আমি পৃথিবীতে তোমার দোয়ায় বড় বা নামকরা হতে পারি, তবে পৃথিবীর সবাইকে জানাব তোমার জীবনী, তোমার কথা।

আমি ভালো পড়াশুনা করার চেষ্টা করছি।

এবং অনেক দোয়া দিয়ে চিঠির উত্তর দিও।

ইতি তোমার
অবাধ্য ছেলে আজাদ

আজাদ সত্য সত্য বিশ্বাস করে তার মার মতো মা আর হয় না। বিশ্বাস করে এই মায়ের জীবনী লিখিত হওয়া উচিত। সে যদি কোনো দিন নামকরা হয়, তাহলেই কেবল এই মায়ের জীবনী লিখিত

হওয়া সম্ভব। সেই লিখবে। লোকে পড়বে, দেখো অমন যে বিখ্যাত লোক আজাদ, তার মায়ের আছে সংগ্রামের এক আশ্চর্য কাহিনী। সেই মাকে সে চিঠি না লিখে কি পারে? বাশারকেও সে খুব পছন্দ করে। তার চিঠির উত্তরও সে দিতে চায়। দেওয়া হয়ে ওঠে না আর কী!

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আজাদ বাশারের চিঠি খোলে।

বাশার লিখেছেঃ

আজাদ,

প্রীতি আর শুভেচ্ছা রইল। একাধিক পত্র লিখেও কোন উত্তর পেলাম না আমরা। রানাও দুঃখ করে কখনো। আশা করি আলাহ্‌তালার কৃপায় ভাল আছ। তোমার ভর্তির কী হলো? বর্তমানে কোথায় আছো আর কীইবা করছ? কিছুদিন পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোনোমিকস ডিপার্টমেন্ট এর শিক্ষক-ছাত্ররা করাচী এসেছিল ইকোনোমিক সেমিনারে। আমরাও তোমাকে আশা করেছিলাম। তাই সেই রাত্রে এয়ারপোর্টেও গিয়েছিলাম রানা আর আমি।

আনোয়ারও তোমাকে স্মরণ করে মাঝে মাঝে। আমরা এক প্রকার। তোমরা কেমন? সামনের জুনের ১০ তাং থেকে আমার এক্সাম শুরু। দোআ করো।

যাক্। হোস্টেলে তোমার বেশ কিছু টাকা জমা আছে। তুমি একটা অথরাইজড লেটার আমার নামে পাঠিয়ে দিও-লেটারটাতে প্রভোস্টকে এড্রেস করো।

তোমার মা-বাবাকে আমার সালাম দিও। তোমার বন্ধু বান্ধবকে আমার শুভেচ্ছা জানিও। ফরিদের খবর কী? ওকে আমার কথা বলো।

নববর্ষের শুভেচ্ছা নিয়ে

ইতি

বাশার

পত্রের উত্তর দিও; রানাকে লিখো কিন্তু।

চিঠি পড়ে আজাদের করাচির দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। রানা, আনোয়ার-এরা সবাই তাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছিল। আসলে বাঙালি সমিতি করতে গিয়ে এদের সবার সঙ্গে সে বেশ প্রীতির বন্ধনেই জড়িয়ে গেছে। ওরা এবার পহেলা বৈশাখ নববর্ষে নিশ্চয় বড় অনুষ্ঠান করেছে। ঢাকাতেও ছায়ানট এবার রমনায় বড় করে রবীন্দ্রসংগীতের আসর বসিয়েছিল। কেন যে সরকার এসবে বাধা দেয়। বাধা যত বড় হবে, বাঁধভাঙা স্রোত তত প্রবল হবে। তার সামনে কিছুই টিকবে না। আইয়ুব খান একটা গাধা, মোনায়েম খান আরেকটা বড় গাধা।

মা ডাকে, বাবা, গোসল করে তারপর খাবি?

'তাই খাই।'

'যা তাহলে গোসল করে আয়। তোর বন্ধুদের কেউ আজকে যে এল না।'

'কী জানি! গন্ধ পায় নাই বুঝি। পেলেই আসবে।'

আজাদ গোসল করতে যায়। বড় গরম পড়েছে। বৈশাখ মাস। গুমোট গরম। মনে হয় ঝড় আসবে। মা যে কেন গেল এই গরমের মধ্যে রান্নাবাড়া করতে! আবার না তার হাঁপানির টান ওঠে।

গোসল করতে বেশ আরাম লাগে। গায়ে অনেকক্ষণ ধরে পানি ঢালার ইচ্ছা হয়। কিন্তু এটা করা উচিত হবে না। এই বাসায় আবার পানির সমস্যা। হিসাব করে পানি খরচ করতে হয়।

গোসল করে বেরিয়ে বাইরে এসে দেখে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। এক্ষুনি ঝড় আসবে। কালবৈশাখীর ঝড়। বাতাস বইতে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা বাতাস। মেঘের ছোঁয়া লাগা ভেজা বাতাস। কিন্তু সাথে ধুলাবালিও প্রচুর। মা বলছেন, এই জানলা বন্ধ কর। ঘরে গিয়ে বস ধুলা ঢুকে পড়ল।

১৮

আজাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। মালিবাগের বাসা থেকে তারা চলে এসেছে তেজকুনিপাড়ায় আরেকটু ভালো বাসায়। মালিবাগের বাসাটা একেবারেই যা-তা ছিল। পড়াশোনার পাশাপাশি আজাদ চেষ্টা করছে একটা ব্যবসা দাঁড় করাতে।

এরমধ্যে ক্লাস করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় সে। ক্লাস করে, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। ব্যবসা থেকে অল্প-বিস্তর টাকা আসছে। ফলে তার বন্ধুদের অনেকের চেয়েই সে স্বচ্ছল। স্টেডিয়ামে প্রভিন্সিয়াল হোটেলে গিয়ে বিরিয়ানি খাওয়ানোর বেলায় তার নামটাই আগে আসে। এ কারণে বন্ধুদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তাও আছে।

ফারুক বলে, চল দোস্তো, বিকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সিটিটিটিউটে যাই।

ক্যান? ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সিটিউটে কী?

'ফাংশান আছে। লেখক সংঘের অনুষ্ঠান।'

ফারুকের আবার লেখালেখির বাতিক আছে। সে লেখক সংঘের অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হতে চায় না।

আজাদ বলে, লেখকদের ফাংশানে গিয়ে আমি কী করব? আমি তো লেখক না। আমি বড়জোর দলিল লেখক সমিতির মেম্বার হতে পারি।

'আরে মেয়ে আসবে অনেক। চল যাই গা।'

মেয়ে দেখার লোভেই আজাদ, ফারুক, ওমর-সবাই মিলে বিকালে গিয়ে হাজির হয় ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সিটিটিটিউটে। পাকিস্তান লেখক সংঘের আয়োজনে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে। ৫ দিন ধরে হবে। অনুষ্ঠানের নাম মহাকবি স্মরণ উৎসব। রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল, গালিব, মাইকেল মধুসূদন আর নজরুলকে নিয়ে একেকদিন অনুষ্ঠান হবে। আজকে পালিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ দিবস, আগামী কাল ইকবাল দিবস, পরশু ৭ জুলাই ১৯৬৮ গালিব দিবস, ৮ জুলাই মাইকেল দিবস আর ৯ জুলাই নজরুল দিবস পালিত হবে পরপর।

বর্ষাকাল। আজকে সারাদিন বৃষ্টি হয় নাই, তবে আকাশে মেঘ থাকায় গরমটা বেশি লাগছে।

আজাদরা যখন ঢোকে তখন আনিসুজ্জামান প্রবন্ধ পড়ছেন। ফারুক মন দিয়ে বক্তৃতা শোনে। আনিসুজ্জামান চমৎকার পাঞ্জাবি পরে এসেছেন। তাকে দেখতেও লাগছে নায়কের মতো। ফারুক আনিসুজ্জামানের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ। যেমন সুলিখিত, তেমনি সুপঠিত। আনিসুজ্জামানের গলার স্বরও মাশালা-লা-জবাব। রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা ভাষাটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, এ ব্যাপারে তাঁর কোনোই সন্দেহ নাই। তবে প্রবন্ধের দিকে তেমন মন নাই আজাদের। সে উসখুস করে। ওমর বলে, দোস্তো, বাম দিক থাইকা তিন নম্বর মাইয়াটারে দেখ।

বক্তৃতা শেষ। এবার ঘোষকের আগমন। উপস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছেন আতিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, এবার আবৃত্তি করবেন গোলাম মুস্তাফা। করতালিমুখর হয়ে ওঠে মিলনায়তন। গোলাম মুস্ত াফা সিনেমার নায়ক। টিভিতেও নাটক করেন। তাঁকে অনেকে চেনে।

গোলাম মুস্তাফা না দেখেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ আবৃত্তি করতে থাকেন।

প্রথমে তিনি আবৃত্তি করেন প্রশ্ন। ভগবান তুমি দূত পাঠায়েছ বারে বারে দয়াহীন সংসারে...এই কবিতাটা তেমন বড় নয়। তারপরে তিনি শুরু করেন পৃথিবী। আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী, শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদিতলে... এত বড় কবিতা তাঁর মুখস্থ! এ যে দেখছি শ্রুতিধর। ভদ্রলোক আবৃত্তি করেনও ভালো। আজাদের মনটা ভালো হয়ে যায়। ওমর উঠে একবার সামনে গিয়ে আবার ফিরে আসে। তার চোখে যে মেয়েটা পড়েছে, তাকে সামনে থেকে দেখাটাই বোধ করি তার উদ্দেশ্য। গোলাম মুস্তাফার আবৃত্তি শেষ হলে আজাদ বলে, চল যাই। গরম।

ফারুক বলে, মনিরুজ্জামান আর সিকান্দার আবু জাফরের আবৃত্তিটা শুনে গেলে হয় না।

হয়। ওমর ফিরে এসে বলে। সে মেয়েটাকে কেমন দেখল তার রিপোর্ট পেশ করার জন্যে জিভ গোল করে তালুতে একটা শব্দ করে। মানে, দোস্ত, জিনিসটা জবর।

অনুষ্ঠান শেষ করে বাইরে বেরিয়ে এসে তারা দেখে বৃষ্টি পড়ছে। মুশকিল হলো তো। আজাদ বলে।

বর্ষাকাল বৃষ্টি তো হবেই। ফারুক অবলীলায় বৃষ্টির মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়। চলে আয়, ভিজতে ভিজতে যাই।

ওমর বলে, 'না আরেকটু থাকি।' হলের বাইরে ছাদের নিচে গাদাগাদি ভিড়। সেখানে সে দাঁড়িয়ে থাকে। বোধহয় ওই মেয়েটাও ওখানেই দাঁড়িয়ে।

বৃষ্টি দেখে আজাদের মনটা একটু খারাপ হয়। কেন খারাপ হয় সে জানে না। বোধ হয় জানে। তার মিলির কথা মনে পড়ছে। মেয়েটা পাকিস্তানে কোথায় পড়ে আছে, কে জানে! কেনই বা সে তার জীবনে এল, কেনই বা এভাবে হারিয়ে গেল। আজাদ ফারুকের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। চল বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যাই।

'চল। আরে আমি তো তাই বলছি। ভিজে গিয়ে সর্দি বাধাই যদি, তুই ব্রান্ডি খাওয়াবি। ব্যাস।' ফারুক বলে।

'এই ওমর চলে আয়।' আজাদ ডাকে। বন্ধু দুজন তাকে ফেলেই চলে যাওয়ার উদ্যোগ করেছে দেখে ওমরও তাদের পিছু নেয়।

'কী ব্যাপার, তুই আমাদের সাথে আসলি যে!' আজাদ বলে।

'তোরা বেটা ভিজতে ভিজতে রওনা দিলি কেন? একটা রিকশা তো অন্তত পাওয়া যাইত।' ওমর বলে।

'তিনজনে এক রিকশায় উঠলে ভিজতেই হতো!' আজাদ বলে।

'তুই আসলি ক্যান। ওই মেয়েকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তারপরে আসতি!' ফারুক বলে।

'মেয়ে? কোন মেয়ে?' ওমর বিস্মিত হওয়ার ভাব দেখায়।

'ওই যে তোর হেভি জিনিস।' আজাদ মনে করিয়ে দেয়।

'আরে না। আমি একটা বুকলেট পাইছি। সেইটার জন্য দেরি করতেছিলাম। ওইটা ভিজাইতে চাই না।' ওমর বলে।

'কী বুকলেট?' ফারুক জানতে চায়।

'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আদালতে দেওয়া শেখ মুজিবের জবানবন্দি'-ওমর বলে।

'আরেব্বাস। এটা এত তাড়াতাড়ি বই হইয়া বার হইয়া গেছে। দেখি'-ফারুক বলে।

'না। বৃষ্টিতে ভিজাতে চাই না। পরে দেখিস'-ওমর নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দেয়।

বৃষ্টি থেমে যায়। তারা দৌড়ে একটা বারে ঢোকে। বেয়ারা তোয়ালে এনে দেয়। আজাদ ব্রান্ডির অর্ডার দেয়। প্রথম প্রথম ঘরটা বেশ অন্ধকার লাগছিল। ধীরে ধীরে তারা ধাতস্থ হলে চারপাশ পরিষ্কার

দেখা যায়। বেয়ারা পানীয় পরিবেশন করে। তারা চিয়ার্স বলে গেলাস উঁচিয়ে আরম্ভ করে। ব্রান্ডির গেলাসে চুমুক দিতে দিতে ওমর বলে, এই মাথার ওপরে লাইটটা জ্বালাও। আলো খানিকটা বেড়ে গেলে সে পেটের কাছে কাপড়ের নিচে গচ্ছিত রাখা বুকলেটটা বের করে শেখ মুজিবের জবানবন্দি পড়তে থাকে। একটু পরে তরলের মাত্রা একটু বেশি হলে সে জোরে জোরে পড়া শুরু করে দেয়। বলে, দোস্তো, শেখ সাহেবরে এরেস্ট করার ডিসক্রিপশনগুলা খুবই ইন্টারেস্টিং। ৫৮ সালের পর থাইকা আইয়ুব আমলে শেখ সাহেব তো দুইদিনও জেলের ভাত না খাইয়া থাকে নাই।

এই দেখ: ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তাহারা পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেফতার করে এবং দেড় বৎসরকাল বিনাবিচারে আটক রাখে। আমাকে এইভাবে আটক রাখাকালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে, কিন্তু আমি ঐ সব অভিযোগ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি...১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারির প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দিকে গ্রেফতার করা হয়, তখন আমাকেও জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় ছয়মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়...

আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্য ছয়দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সরকারী নেতৃবৃন্দ ও সরকারী প্রশাসনযন্ত্র আমাকে 'অস্ত্রের ভাষা'য় 'গৃহযুদ্ধ' ইত্যাদি হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে এক ডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করে।

ফারুক বলে, এই বেটা, তুই কি এখন পুরা বইটা পড়বি নাকি! শালা মাতালের কাণ্ড দ্যাখো।

ওমর বলে, ডোন্ট ডিস্টার্ব। এই জায়গাটা মোস্ট ইন্টারেস্টিং। খালি গ্রেপ্তার আর জামিন আর গ্রেপ্তার। হয়রানি কাকে বলে। আরে বেটা শোন না, '১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি যখন খুলনায় একটি জনসভা করিয়া যশোর হইয়া ঢাকা ফিরিতেছিলাম তখন তাহারা যশোরে আমার পথরোধ করে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারি পরোয়ানা বলে এইবারের মতো প্রথম গ্রেফতার করে।'

আজাদ মনে হয় একটু বেশি খেয়ে ফেলছে। তার মাথা ঝিমঝিম করছে। শেখ মুজিব তো সারা প্রদেশ ঘুরে দুই পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য ভালই তুলে ধরছেন, আর তাঁর বক্তৃতা শুনলে গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়, মনে হয় এক্ষুনি দেশ স্বাধীন করতে না পারলে আর মুক্তি নাই, কিন্তু তাতে কী? আজাদ কি তার মিলিকে ফিরে পাবে? মিলি কেন পাকিস্তানেই রয়ে গেল? মিলিকে কিন্তু সে কোনোদিন মুখ ফুটে বলে নাই যে তাকে তার ভালো লাগে। বরং মিলিই বলেছিল। বলেছিল, খালাকে বলেছি আপনার কথা। তার মানে মাকেও বলা হয়ে গেল... কী বলা হলো... আপনার কথা? আপনার কথাটা কী? এই যে আপনার আমার সম্পর্ক... মিলি আমাকে তোমার কেমন লাগে? কেমন লাগত আসলে? তাহলে একবার বিদায় বলে যাবে না? এভাবে... বেয়ারা ... আরেক পেগ...

ওমর পড়েই চলেছে শেখ সাহেবের জবানবন্দি...'আমাকে যশোরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি আমাকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করেন। আমি ঢাকার সদর দক্ষিণ মহকুমা প্রশাসকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি আমার জামিনে অসম্মত হন, কিন্তু মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিন বলে আমি সেইদিনই মুক্তি পাই এবং নিজগৃহে গমন করি। সেই সন্ধ্যায়ই আটটায় পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতার উপর সিলেট হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারি পরোয়ানা বলে আমার বাসগৃহ হইতে আমাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সেই রাত্রেই আামকে সিলেট লইয়া যায়।

পরদিন প্রাতে আমাকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে সিলেটের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিনের আবেদন বাতিল করিয়া আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। পরদিন সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ আমাকে জামিন প্রদান করেন।'

আজাদ বলে, আরে এ-তো খালি গ্রেফতার করে আর ম্যাজিস্ট্রেট জামিন দেয় না, আবার দায়রা জজ জামিন দেয়, আবার পরদিন গ্রেফতার করে...এই একই কথা তুই আর কত পড়বি...

'পড়েন স্যার পড়েন।' আশেপাশে সব বেয়ারা ভিড় করে শুনছে। বারের খদ্দেররাও আশেপাশের টেবিলে বসে কান খাড়া করে আছে শেখ মুজিবের জবানবন্দি শোনার জন্য। আরে এ-তো মুশকিল হলো।

ওমর পড়ে চলে, কিন্তু মুক্ত হইবার পূর্বেই পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে আমাকে কারা দরজায়ই গ্রেফতার করে। এবারের গ্রেফতারি পরোয়ানা মোমেনশাহী হইতে প্রেরণ করা হইয়াছিল। সেই রাত্রে পুলিশ পাহারাধীনে আমাকে মোমেনশাহী লইয়া যাওয়া হয় এবং একইভাবে মোমেনশাহীর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিন প্রদানে অস্বীকৃত হন...

'এবং পরের দিন জেলা দায়রা জজ আমাকে জামিন প্রদান করেন? ঠিক?' ফারুক বলে।

ঠিক। ওমর সায় দিয়ে গেলাস হাতে নিয়ে চুমুক দেয়।

'তারপর স্যার?' বেয়ারা বলে।

'১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে–সম্ভবত আটই মে, আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা করি এবং রাত্রে ঢাকায় নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করি। রাত একটায় পুলিশ ডিফেন্স অফ রুল-এর ৩২ ধারায় আমাকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের বহু সংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়... ইহাদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহাম্মদ....বড় তালিকা পইড়া শেষ করন যাইব না ভাইসব... ওমরের মুখ দিয়ে থুতু ছিটে বের হয়ে ফারুকের গায়ে পড়লে সে একটা চাপড় মারে ওমরের পিঠে, ওমর দুই পৃষ্ঠা গ্রেফতারের তালিকা পার হয়ে পড়েঃ অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাককেও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে.... তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ রাখিয়া তাহার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে...প্রায় ২১ মাস আটক রাখিবার পর আমাকে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারীর ১৭/১৮ তারিখে রাত একটার সময় আমাকে তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় এবং কারাগারের ফটক হইতে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়া আমাকে ঢাকা সেনানিবাসে লইয়া আসে এবং একটি রুদ্ধ কক্ষে আটক রাখে...

হঠাৎ একজন বেয়ারা এসে ওমরের কানের কাছে মুখ নামায়, ফিসফিস করে বলে, স্যার, টিকটিকি স্যার, বইটা লুকায়া ফেলেন...সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা সব নিজ নিজ গেলাস নিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার অভিনয় শুরু করে।

ফারুক বলে, চল দোস্তো কাইটা পড়ি।

তারা বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, আজ বোধ হয় ঢাকা ভেসেই যাবে।

১৯

শীতকাল। ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকটায় এসে শীতটা বোধহয় একটু বেশিই পড়েছে। আজাদের ঘুম থেকে ওঠার কথা ছিল সকাল ৮টায়। সকাল ৯টার মধ্যে সে হাজির হবে নয়া পল্টনে। মিন্টু সাহেবের বাসায়। তাঁর সাথে যাবার কথা মতিঝিলে, একটা বীমা অফিসে। ওই অফিসের স্টেশনারি

সরবরাহের কাজটা পাওয়ার জন্যে দরবার করতে। কিন্তু সকাল ৮টায় লেপের নিচ থেকে বের হবার ঝক্কিটা কে সামলাবে? মা এসে দুবার ডেকে গেছেন, আজাদ, আজাদ, ওঠ। ৮টা তো কখন বেজে গেছে!

আজাদ নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলে, বাজুক। আমাকে ৯টায় ডেকো। সে মাথার ওপরে লেপ মুড়ে দিয়ে আবার চোখ বন্ধ করে।

ও ঘর থেকে জায়েদের পড়ার আওয়াজ আসছে। জায়েদ জোরে জোরে সুর করে পড়ে।

খানিকক্ষণ লেপের ওমের ভেতরে শুয়ে জেগেই ছিল আজাদ। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে একটা মিষ্টি স্বপ্ন দেখছিল। এমন সময় আবার মা'র ডাক। আজাদ, তোর ৯টাও তো পার হয়ে যায়। উঠবি না।

আজাদ ধড়পড় করে ওঠে। লেপটা গায়ে জড়িয়ে ধরে বিছানা থেকে নামে। ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে লেপটা ছুড়ে মেরে কলতলার দিকে যায়। এক মিনিটে প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে প্যান্ট পরে সে রেডি।

'মা, যাই গা।'

মা বলেন, নাশতা খেয়ে তারপরে যা। না খেয়ে কই যাবি?

আজাদ জানে, মা নাশতা না খেয়ে বাইরে বের হতে দেবেন না। আবার এখন নাশতা খেতে গিয়ে দেরি হয়ে গেলে তার বড় ক্ষতি হয়ে যাবার সম্ভাবনা। মিন্টু ভাই বেরিয়ে যাবেন। কাজেই একটা মিথ্যা কথা তাকে বলতে হবে। মা, নাশতার দাওয়াত আছে এক বাড়িতে। তোমার নাশতা তো এখন খাওয়া যাবে না।

'একটা টোস্ট বিস্কুট খেয়ে এক কাপ চা খেয়ে যা অন্তত।'

'সময় নাই। ৯টার মধ্যে পৌঁছানোর কথা। এইখানেই ৯টা বেজে গেছে।'

'দেখ তো ছেলের কাণ্ড'। মা হাসেন, 'তোকে তো আমি ৮টাতেই ডেকে দিয়েছিলাম।'

আজাদ একটা সোয়েটার গায়ে চড়াতে চড়াতে দৌড়ে ঘরের বাইরে যায়। তেজকুনি পাড়া থেকে নয়া পল্টন। অনেক দূর। একটা রিকশা নেওয়া দরকার। কিন্তু রাস্তায় আশেপাশে সে কোনো রিকশা দেখে না। দোকানপাটও এখনও খোলে নাই। ঢাকার দোকানদাররা সব সাহেব, দশটা এগারোটার আগে সাধারণত দোকানের ঝাপ খোলে না, কিন্তু রিকশাওয়ালাদের কী হলো? আরেকটু এগিয়ে গেলে আজাদের মনে হয়, এত লোক হেঁটে যাচ্ছে, ব্যাপার কী? আজকে স্ট্রাইক নাকি? তাই তো! আজ তো হরতাল হতেই পারে। দুরো শালা হরতালের দিনে বীমা অফিসের কর্মসূচি রাখাই ঠিক হয় নাই। এখন সে এতোটা পথ খালিপেটে হেঁটে হেঁটে যাবে নাকি? পেট খালি, শৌচাগারেও যাওয়া হয় নাই, অথচ সামনে দুস্তর পারাবার। আগে মোড়ের চায়ের দোকানে গিয়ে পরাটা আর ডালভাজি খেয়ে নেবে নাকি! কিন্তু চায়ের দোকানটা ঠিক তার মতো ভদ্রলোকের বসার জন্যে উপযুক্ত নয়। রিকশাওয়ালা শ্রেণীর লোকেরা এটাতে বসে। মাটিতে পুঁতে রাখা গাছের ডালের ওপরে পাতা তক্তা, এই হলো এর আসন, আর তাতে পা তুলে বসে থেকে রিকশাওয়ালারা ছোট ছোট চায়ের কানা ভাঙা কাপ থেকে চা পিরিচে ঢেলে সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে খাচ্ছে, এ দৃশ্য কল্পনা করার সঙ্গে সঙ্গে আজাদ ওখানে যাওয়ার চিন্তা বাদ দেয়। শীতটা তার শরীর থেকে এখনও যাচ্ছে না। সে তার বিদেশী সিগারেটের প্যাকেটে হাত দেয়, একটা সিগারেট বের করে, লাইটার বের করে অগ্নিসংযোগ করে তাতে। খালি পেটে সিগারেট, মা শুনলে কতই না রাগ করবেন, তার মনে হয়!

জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো-স্লোগান শোনা যায়। আজাদ দেখে, অল্প কয়েকজন লোকের একটা মিছিল। মিছিলের মধ্যে আবার বস্তির কয়েকটা ছেলে-ছোকরা। মিছিল তার আগে আগে যাচ্ছে। সে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে মনে মনে বলে, আগুন জ্বালিয়েই তো বাবা সিগারেট ধরালাম, আমার কাজ আমি করেছি, এবার তোরা তোদের কাজ কর।

সে এগিয়ে যায়। রোদ উঠছে। কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। তার এখন একটু একটু করে গরম লাগছে। সে সোয়েটারটা খুলে কোমরে বাঁধে।

মিছিলটা ধীরে ধীরে ফার্মগেটের দিকে এগিয়ে যায়। এবং আশ্চর্য যে মিছিলের আকার বড় হতে থাকে। আইয়ুব শাহীর গদিতে, আগুন জ্বালো এক সাথে, আইয়ুব মোনেম দুই ভাই এক দড়িতে ফাঁসি চাই। এই স্লোগান শুনে আজাদ একটু চিন্তিত হয়। একটা দড়িতে দুজনকে ফাঁসি দেওয়া বাস্তবে সম্ভব হবে কিনা। শুধু দড়ির খরচ বাঁচাতে গিয়ে না আবার আইয়ুব আর মোনায়েম দুই খানই বেঁচে যায়। প্রথম কথা হলো একটা দড়িতে একটা বড় ফাঁস বানিয়ে দুজনের কলা-এক সঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর তাদের দুজনের গলায় ফাঁস লাগবে কিনা। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ না হলে তারা দুজনে কি মারা যাবে? না গেলে কী হবে? আবার দুজনের ভর এক সঙ্গে একটা দড়ি সইতে পারবে কিনা? যদি দড়ি ছিঁড়ে যায়, তাহলে কী হবে? পড়ে গিয়ে বেটারা ব্যথা পাবে কি পাবে না?

মিছিল বড় হচ্ছে, আর তার দৈর্ঘ্য বাড়তে বাড়তে একেবারে তার কাছে পর্যন্ত এসে যাচ্ছে। আরে, মুশকিল তো, সেতো মিছিলে নামবে বলে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে পথে নামে নাই। তার উদ্দেশ্য অতো মহৎ নয়। নিতান্তই একটা সাপাইয়ের কাজ পটানোর জন্যে না সে...

দোস্ত, আইসা পড়ছ, ভালো ভালো। তোমগো মতো বড়লোকের পোলা আইয়া পড়লে না মিছিলে জোস আহে। কে? না খসরু। তার একজন ক্লাসমেট। নিজেও সে বড়লোকের ছেলে। তবে সে নিজেকে শ্রেণীচ্যুত বলে মনে করে। এখন কৃষক-শ্রমিকের নেতৃত্বে একটা বিপব-টিপব ঘটানোর স্বপ্ন দেখছে।

জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব।

খসরু স্লোগানে কণ্ঠ মেলায়। আজাদ বিস্মিত। কারণ শেখ মুজিবকে খোরশেদ নেতা মানে না। মনে করে বুর্জোয়া স্বার্থের বাঙালি প্রতিনিধি।

'কী ব্যাপার, তুমিও শেখ সাহেবের মুক্তি চাও নাকি?' আজাদ বলে।

'অফকোর্স চাই। মাওলানা কইয়া দিছেন, মজিবররে ছাড়তে হইব। ব্যাস, আমি তার লাইনে আছি।'

মিছিল আরো বড় হচ্ছে। এখন আজাদের পেছনেও মানুষ। তার পরিচিত আরো আরো লোকজন বন্ধুবান্ধবকে দেখা যাচ্ছে।

আজাদ বিস্মিত হয়ে খেয়াল করে, মিছিলের সঙ্গে হাঁটতে তার ক্লান্তি লাগছে না, অনেকটা পথ যে সে ইতিমধ্যেই পাড়ি দিয়ে এসেছে সে খেয়ালই করে নাই। জ্বালো জ্বালো... আবার ধ্বনি ওঠে। আগুন জ্বালো, আজাদ স্লোগানের জবাব দেয়। সে ভেবেছিল, এই জবাব দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে আরেকটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করবে। কিন্তু তা আর করা হয় না। তার হাত আপনা-আপনি মুঠো হয়ে আকাশের দিকে উড়তে থাকে। তখন তার নিজেকে বেশ শক্তিশালী বলে মনে হয়। ইতিমধ্যে তাদের পাশে একটা রায়ট পুলিশ ভ্যান উদিত হয়েছে। কিন্তু আজাদের বিন্দুমাত্র ভয় লাগে না। মনে হয় এত এত মানুষের শক্তির কাছে ওরা খুবই নগণ্য, খুবই তুচ্ছ।

আজাদ মনে মনে বলে, বাবারা, তোমরা আস্তে আস্তে নয়া পল্টনের দিকে চলো। আমার রাস্তা সংক্ষিপ্ত হয়। গন্তব্য কাছে আসতে থাকে। তার মনে হয় এই মিছিলটা একটা ট্রেন আর সে বিনা টিকেটে এই ট্রেনে উঠে পড়েছে। সে বিনাটিকেটে উঠেছে, কারণ তার উদ্দেশ্য আর মিছিলকারীদের উদ্দেশ্য এক নয়। সে শুধু নয়া পল্টনে মিন্টু সাহেবের বাসা পর্যন্ত পৌঁছতে চায় আর মিছিলকারীরা চায় রাজবন্দিদের মুক্তি, ছাত্রদের ১১ দফার বাস্তবায়ন, আওয়ামী লীগের ৬ দফা অর্জন। কি জানি সবাইকে সেতো চেনে না। ওদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয় চায় স্বাধীন বিপবী সমাজতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা।

আজাদ এসবের ঠিক কোনটা যে চায়, সে জানে না। তবে এই শালা আইয়ুব খানটা গেলে সে খুশি হয়। আর পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে থাকাটা ঠিক পোষাবে না। ওরা শালা বাঙালিদের ঠিক মানুষই মনে করে না, মুসলমানও মনে করে কিনা সন্দেহ। করাচিতে দীর্ঘদিন থেকে এ কথাটা সে বুঝে এসেছে। শেখ সাহেব ৬ দফার ব্যাখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের উদ্দেশে বলেছেন, পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে আর ৩২ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। এই ৯৪ টাকা পুরাটাই খরচ হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। অথচ পূর্বপাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠের বাস। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার দুই তৃতীয়াংশ আয় হয় পূর্বপাকিস্তানের পাট থেকে। শেখ মুজিব এইটা ঠিক বলেছেন। ডিম পাড়ে হাঁসে, খায় বাঘডাশে। এত বৈষম্য সহ্য করা যায় না। আবার প্রতিবাদ করলেই গুলি। মিছিল অনেক বড় হয়ে গেছে আর সামনে কাকরাইলের মোড়ে পুলিশ আর ইপিআর কাঁটাতারের ব্যারিকেড দিয়ে মিছিলের গতিরোধ করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

আজাদের রক্ত গরম হতে থাকে। সে চেয়েছিল অন্তত পল্টন পর্যন্ত মিছিলের সঙ্গে হেঁটে যেতে, আর এ শালারা সেটা করতে দেবে না। কেন? মিছিল করার অধিকার কি আমাদের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে না? ওই শালারা রাস্তা কি তোগো বাপের? মিছিল করতে দিবি না, কোন আইনে? আমার টাকায় কেনা গুলি আমার বুকেই মারো?

হালা, এই ঢিল ল তো।

আজাদ নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকে।

মিছিলকারীরা ঢিল পাটকেল সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। রাস্তার পিচ্চিগুলোর উৎসাহ, তৎপরতা, সাহস আর সাফল্য বেশি। তাদের ঢিল গিয়ে পড়ছে পুলিশের গায়ে।

গুডুম। কাঁদানে গ্যাসের শেল এসে পড়ে মিছিলের অনেক সামনে। জনতা সেই শেল ফেটে যাওয়ার আগেই তুলে নিয়ে ছুড়ে মারে উল্টো পুলিশের দিকেই। আবার কাঁদানে গ্যাসের শেল এসে পড়তে থাকে পরপর।

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে এলাকাটা। আজাদের চোখ জ্বালা করতে থাকে। এখন সে করবেটা কী? সামনের দিকে জনতা, বিশেষ করে খেটে খাওয়া ধরনের মানুষগুলো ঢিল ছুড়েই চলেছে। রাস্তার পিচ্চিগুলোর সাহস তো একেবারেই আকাশছোঁয়া।

আজাদ আগুন দেবার জন্যে পকেটের লাইটারটা বের করে, হাতের কাছে কী পাওয়া যায় যাতে আগুন দেওয়া যায়। একটা ইপিআরটিসির বাস পেলে ভালো হতো। কিন্তু চোখ এমন জ্বলছে যে সে আর কিছুই দেখে না। খসরু তার হাতে ধরে টান দিয়ে বলে, আগে চউখে পানি দেওন লাগব। চলো ওই গলির হোটেলে ঢুইকা পড়ি।

আজাদ বাঁয়ের একটা গলির দিকে যেতে থাকে।

খসরু বলে, ওইটায় যাইও না, ওইটা কানাগলি। আমার লগে আহো।

আজাদ খসরুর হাত ধরে তার সঙ্গে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে।

২০

গোয়েন্দা হিসাবে জায়েদের তুলনা মেলা ভার। ক্লাস নাইনে পড়া জায়েদ, বাসায় ফিরতে না ফিরতেই আজাদ তার সামনে পড়ে, দাদা, তিনটা টাকা দেও তো!

‘ক্যান, টাকা দিয়া তুই কী করবি!’

‘টাকা দিয়া আমি কী করি, তুমি তো জানোই। সিনেমা দেখুম।’

‘আজকে তো হরতাল। সিনেমা হল খুলবে না।’

‘কালকা দেখুম।’

‘কালকেও খুলবে না।’

‘যেদিন খুলব সেদিন দেখুম।’

‘এখন খুচরা নাই। পরে আসিস।’

‘দাদা, আমি কিন্তু আম্মারে কই নাই, তুমি মিছিলে গেছলা!’

‘আমি মিছিলে গেছি তোকে কে বলেছে!’

‘গেছলা। আমি জানি!’

এরপরে তিন টাকা না দিয়ে আর আজাদের কোনো উপায় থাকে না। জায়েদের মুখ বন্ধ করা যায় বটে, কিন্তু মার কাছে ব্যাপারটা গোপন থাকে না।

‘কীরে তোকে দেখতে এমন লাগে কেন?’ মা তাকে দেখা মাত্রই বলেন।

‘কেমন লাগে!’

‘চোখ লাল। গা ঘামে ভিজে গেছে!’

‘আরে হরতাল না। গাড়ি ঘোড়া কিছু আছে নাকি! হেঁটে যেতে হলো। রোদ চড়চড় করছে। তাই ঘেমে গেছি।’

আজাদ বারান্দায় গিয়ে জগের পানিতে চোখ ধোয়।

‘চোখে কী হলো?’

‘আরে টিয়ার গ্যাস মেরেছে। মিছিলের পেছনে পড়েছিলাম।’

‘তুই মিছিলে গেছিস!’

‘যাই নাই। আমি তো নয়াপল্টন যাচ্ছি। মিছিল আমার আগে আগে যায়। আমি কি আর অত বুঝেছি।’

‘না, আম্মা, দাদায় স্লোগানও দিছে!’ জায়েদের গলার স্বর।

‘ওই। তিন টাকা ফেরত দে।’ আজাদ বলে।

‘আজাদ, তোকে না বলেছি মিছিলে যাবি না। আমার কি সাত আটটা ছেলে। আমার ছেলে একটাই। তুই। তোকে আমি কি জালিমদের গুলিতে মরতে দেব! কী গোলাগুলিই না করছে। আজকে শুনি ঢাকায় মরেছে তো কালকে টঙ্গিতে, পরশু নারায়ণগঞ্জে। খবরদার, তুই এইসবে যাবি না। নেতারা তো কেউ মরে না, খালি পাবলিক মরে।’

জায়েদ বলে, নেতাও মরতেছে। আসাদ মারা গেল না?

‘ওই একজন দুইজন। পাবলিক মরে শয়ে শয়ে’ –মা বলেন।

‘নেতা কি শয়ে শয়ে আছে নাকি! আর আওয়ামী লীগের গুলান তো সব জেলে। বাইরে আছে খালি মাওলানা ভাসানি’ –আজাদ বলে।

মা জগ থেকে পানি ঢালেন। আজাদ চোখ ধোয়। আসলে তার উচিত ছিল রুমাল ভিজিয়ে পকেটে নিয়ে যাওয়া। তাহলে কাঁদানে গ্যাসে তাকে কাবু করতে পারত না। সে ভাবে।

মা বলেন, তুই পলিটিক্সের মধ্যে যাবি না। আমাদের কী?

আজাদ বলে, পলিটিসিয়ানদের কী? আমাদের দেশ। করাচি গিয়ে দেখে এসেছি না ওরা আমাদের কী রকম ঠকাচ্ছে।

মা বলেন, আপনে বাঁচলে তার পরে না দেশ। তোর কিছু হলে দেশ নিয়ে আমি কী করব!

আজাদ বলে, আমার কিছু হবে না।

মা আজাদের হাত ধরে বলেন, বাবারে তুই এ সবের মধ্যে যাবি না। দোহাই লাগে। মার চোখ জলে ভিজে আসে।

আজাদ একটু বিস্মিত হয়। মাকে সে সাধারণত কাঁদতে দেখে না। মাকে তার সব সময়ই মনে হয়েছে যেন এক আশ্চর্য পাথর, যা সব অশ্রু শোষণ করে নেয়, কিন্তু নিজে কখনও গলে না।

আজাদ মার কথামতো চলে কিছুদিন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সে যায়। ক্লাস হ'লে ক্লাস করে। ইদানীং প্রায়ই ক্লাস হয় না। ছাত্ররা ১১-দফা দাবি দিয়েছে। তার সমর্থনে মিছিল-মিটিং করে। প্রায়ই সারা প্রদেশে ছাত্রধর্মঘট ডাকে। হরতালও হয় প্রায়ই। আজাদ মিছিলে যায় না। তবে বটতলায় সভা থাকলে মাঝেমধ্যে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গিয়ে আশেপাশে দাঁড়ায়। বক্তৃতা শোনে। বাদাম খায়। সেখান থেকে চলে যায় ব্যবসার ধান্ধায়। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভালো নয় বলে ব্যবসা-পাতিও ভালো হচ্ছে না।

ঢাকা যেন তপ্ত কড়াই হয়ে আছে। গতকালকে (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯) সারাটা ঢাকা শহর পরিণত হয়েছিল মিছিলের নগরীতে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সাজেন্ট জহুরুল হক আর ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক সেনানিবাসের ভেতরে বন্দি অবস্থায় বাথরুমে যাবার পথে গার্ডের বন্দুকের গুলিবর্ষণের শিকার হয়েছেন-এ-রকম খবরে এমনিতেই সারাটা বাংলাদেশ ছিল বিক্ষুব্ধ। কালকে সকালে সরকারিভাবেই যখন স্বীকার করা হলো, সার্জেন্ট জহুরুল হক মারা গেছেন, তখন মনে হলো, ঢাকা যেন একটা বারুদের স্তূপ, আর কে যেন তাতে দিয়াশলাইয়ের কাঠি ধরল। মিছিলে মিছিলে সয়লাব হয়ে পড়ল পুরোটা শহর। যেন এত বিদ্রোহ কখনও দেখেনি কেউ। মিছিল, আগুন, টিয়ার গ্যাস, ফায়ার। সে এক অন্য রকম ঢাকা।

আজকে হরতাল। হরতালের পাশাপশি শুরু হয়েছে নতুন উপদ্রব। কারফিউ থাকে প্রতিদিনই প্রায়। এভাবে ঘরের মধ্যে বসে থাকা যায়? আজাদ চলে যায় বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায়। রাশেদদের মেসে। ওখানে কার্ড খেলাটা জমে ভালো। কিন্তু সন্ধ্যার আগে আগে ঘরে ফিরে আসতে হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত কারফিউ। কারফিউয়ের মধ্যে আটকা পড়লে রাতটা মেসে কাটাতে হবে। চিন্তায় চিন্তায় মা কলজে পুড়িয়ে ফেলবে। পোনে ৫টার সময় মগবাজার থেকে বেরিয়ে আজাদ দৌড় ধরে। তেজকুনি পাড়ায় পৌঁছতে হবে ১৫ মিনিটে। এই সময় কোনো যানবাহন পাওয়া যায় না। সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে যে যার গন্তব্যে ছুটতে থাকে। ব্যাপারটা দেখতে লাগে ভয়াবহরকম হাস্যকর। মনে হয় বনে আগুন লেগেছে আর চতুষ্পদ প্রাণী সব দৌড়ে পালাচ্ছে।

তেজগাঁ পৌঁছতে না পৌঁছতেই ৫টা বেজে গেছে। এখনও বাসায় পৌছতে অন্তত ১০ মিনিট। তবে বড় রাস্তা ছেড়ে সে ঢুকে পড়েছে পাড়ায়, এটাই ভরসা। বড় রাস্তায় ট্রাকের সামনে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে জল্লাদের মতো ভঙ্গি করে সামরিক যান সব চলতে শুরু করেছে। সে চলার গতি দ্রুত করে। একটা বাঁক ঘুরলেই বড় রাস্তা থেকে তাকে আর দেখা যাবে না। আর্মি পাগলা কুত্তার মতো হয়ে গেছে। ইচ্ছা হলেই বন্দুক চালাচ্ছে।

আরে বন্দুক চালানোর মধ্যে বাহাদুরি কী আছে! আজাদও বহুত বন্দুক চালাতে পারে। তার বাবার বন্দুকের দোকান ছিল। সে সেখান থেকে বন্দুক ধার নিয়ে শিকারে যেত। তার নিজের কাছে এখনও একটা রিভলভার আছে। লাইসেন্স করা রিভলভার। তার বন্দুকের হাতও খুব ভালো। উড়ন্ত

পাখি মেরে ক্লাস এইটে থাকতেই সে সবাইকে একবার তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। বাবারে ও বাবা, আমারে নিতে যে আইল না, আমি অহন কী করুম। আমারে তো গুলি কইরা মাইরা ফেলাইব। একটা খোঁড়া ভিক্ষুক চেঁচিয়ে কাঁদছে। আজাদ তাকায়। সন্ধ্যার ফ্যাকাশে আলোয় দেখতে পায়, ভিক্ষুকটার দু পা হাঁটু পর্যন্ত কাটা। একটা বিয়ারিঙের চাকার ট্রলিতে সে বসে আছে। আজাদের মায়াই হলো লোকটার জন্য। তবে পুলিশ মিলিটারি তাকে গুলি করবে–এরকম ভাবাটা বাড়াবাড়ি। এ গলিতে পুলিশের ঢোকার কারণ সে দেখে না। তারমধ্যে একটা খঞ্জ ফকিরকে ওরা মারবে কেন? ওও কি ছয়দফা চায় নাকি! গুলি না খেলেও লোকটার কপালে দুর্ভোগ থাকতে পারে। আজ রাতে হয়তো তাকে নিতে কেউ আসবে না। লোকটাকে সারারাত শীতের মধ্যে এখানে থাকতে হবে। আজাদ লোকটার কাছে ফিরে যায়। গায়ের সোয়েটারটা খুলে তার হাতে দিয়ে বলে, তুমি আইয়ুব খান না ছয় দফা?

ফকির বলে, আলা-ভরসা বাবা, আমারে যে নিতে আইল না।

আজাদ বলে, আলার নাম লও আর কী!

বাসার সামনে গিয়ে দেখে মা দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তায়। এটা তোর কী বিচার, মা বলেন, কারফিউ শুরু হয়েছে কখন, আর তুই এতক্ষণে এলি! নাহ। এটা তোর একদম উচিত হয় নি। আমি ত চিন্তায় চিন্তায় কাহিল।

তুমি চিন্তা মা একটু বেশিই করো। আমি তো ৫টার আগেই গলিতে ঢুকে পড়েছি। একটা নুলা ফকির পড়ে আছে। তাকে নিতে কেউ আসে নাই। আমি তাকে সোয়েটারটা দান করে দিয়ে এলাম। যদি তাকে নিতে না আসে।

মা বলেন, ভালো করেছিস বাবা। তোর অন্তরটা বড় হয়েছে, আমি খুব খুশি।

জায়েদ বলে, ওইটা ফকির না। ওইটা পুলিশের গোয়েন্দা।

মা বিস্মিত, বলিস কী তুই!

আজাদ বলে, চোপ। বেশি কথা বলে।

এত তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে আজাদের দমবন্ধ লাগে। কী করবে সে! মা চা বানিয়ে মুড়ি মেখে দেন। আজাদ তার ঘরে বসে মুড়ি চিবোয়। বই নিয়ে বসা যায়। এখনও বই পড়ার নেশাটা তার আছে। থ্রি কমরেডস বইটা নিয়ে সে পড়তে বসে। মশা বড় জ্বালাচ্ছে। তা ছাড়া ঠাণ্ডাও খুব। আজাদ বিছানায় উঠে বসে পায়ের ওপরে লেপ টেনে দেয়।

সারাটা পাড়া স্তব্ধ। মাঝেমধ্যে কুকুরের ডাক। মনে হয় ভোল্টেজ কম। আলোটা অনুজ্জ্বল দেখায়। লাইটের চারদিকে পোকা উড়ছে। একটা টিকটিকি তার কাছে বসে আছে ওৎ পেতে।

মা রান্নাঘরে। পিচ্চিগুলো তাঁকে সাহায্য করছে। কেউ কেউ পড়তে বসেছে। জায়েদ সব সময়ই শব্দ করে পড়ে। আজও তার ব্যতিক্রম নয়। শব্দ করে পড়ার উদ্দেশ্য যতটা না পড়াটা আত্মস্থ করা, তার চেয়েও বেশি মাকে বোঝানো যে সে পড়ছে।

মা মনে হয় মুরগি রাঁধছেন। গরম ঝোলের মশলাওয়ালা গন্ধ আসছে। আজাদের পেটে খিদেটা চাড়া দিয়ে ওঠে। সে বিছানা ছেড়ে উঠে রান্নাঘরে যায়। বলে, মা দেখি তোমার মুরগির ঝোলে লবণ হয়েছে কিনা!

মা একটা চামচে ঝোল তুলে দেন। আজাদ দুবার ফুঁ দিয়ে ঝোলটা মুখে দিয়ে বলেঃ ফার্স্ট ক্লাস। তবে মা তুমি যে রোজ রাঁধো, নিশ্চয় ঝোল চাখো, নাইলে বুঝবা কেমন করে লবণ হয়েছে কিনা, তাইলে তুমি যে বলো তুমি আমিষ খাও না, এটা তো ঠিক না।

মা হাসেন। বলেন, আমার খাওয়া লাগে না। আমি এমনিই রাঁধতে পারি।

চুলার কমলা আলো এসে পড়েছে মার মুখে। মাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

ঠিক এই সময় বাইরে থেকে স্লোগানের শব্দ আসতে থাকে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে মানুষজন সব বেরিয়ে রাস্তায় নেমে যাচ্ছে। জায়েদ ছুটে আসে। দাদা, সবাই রাস্তায় যাইতেছে। চলো আমরাও যাই।

মা বলেন, ব্যাপার কী না বুঝে তোরা কই যাস।

আজাদ বাসার বাইরে এসে দেখে আশেপাশের বাসার ছেলেপুলে সব বেরিয়ে এসেছে।

কী হয়েছে? আজাদ জিজ্ঞেস করে।

আরে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে মিলিটারি গুলি কইরা তিনজন প্রফেসররে মাইরা ফেলছে। বিবিসিতে কইছে। আবার কালকা সারাদিন কারফিউ ডিক্লেয়ার করছে। তাই শুইনা ক্ষেইপা লোকজন রাস্তায় নাইমা পড়তেছে। একজন জবাব দেয়।

আজাদ ঘরে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি একটা প্যান্ট পরে নেয়। একজোড়া কেডস পায়ে দেয়। তারপর বেরিয়ে আসে। এখানে ওখানে খণ্ড খণ্ড মিছিল। নুলো ফকিরটা পর্যন্ত তার ঠেলাগাড়িতে চড়ে চলেছে স্লোগান দিতে দিতে। তাকে ঠেলছে আরেক ভিক্ষুক।

মগবাজার মোড়ে আসতে আসতে মিছিল মহামানবসমুদ্রে পরিণত হয়। আজাদ মগবাজার মোড়ে তার পরিচিত বন্ধুবান্ধবদেরও দেখতে পায়। আশরাফুল, ওমর, ফারুক, কাজী কামাল, হাবিব সবাই মগবাজারের মোড়ে মিছিলে অংশ নিচ্ছে। কাজী কামাল আজাদকে দেখে বলে, দোস্তো, সিগারেট দেও। আজাদ সিগারেটের প্যাকেট বের করে। তারা স্লোগান ধরেঃ রক্ত দিলেন গুরু, সংগ্রাম হলো শুরু।

দৈনিক ইত্তেফাকের রিপোর্টারও শহরে চক্কর দিচ্ছেন। কিছুদিন আগে ইত্তেফাকের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। আজাদদের সাথে তাঁর দেখা হয়। ওমর তাঁকে চেনে। ওমর বলে, ভাইয়া কী খবর।

রিপোর্টার বলেন, সারাটা শহর মনে হচ্ছে অগ্নিগিরি। লাভা বেরুচ্ছে। আজকেই আইয়ুব খানের দিন শেষ।

রিপোর্টার টিকাটুলির মোড়ে অফিসে ফিরে গিয়ে লিখতে বসেনঃ

গত রাত্রে রাজধানী ঢাকা নগরীতে অকস্মাৎ সান্ধ্য আইনের কঠিন শৃঙ্খল এবং টহলদানকারী সামরিক বাহিনীর সকল প্রতিরোধ ছিন্নভিন্ন করিয়া হাজার হাজার ছাত্র-জনতা আকিস্মক জলোচ্ছ্বাসের মত পথে নামিয়া আসে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও 'আগরতলা' ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে।

ইন্ট্রোটা লিখে তিনি চিৎকার ওঠেন, আসগর, চা দে। আসগর হলো অফিসের পিয়ন। তাকে পাওয়া যায় না। আর দুইবার চিৎকার করার পরে একজন সাব-এডিটর এসে জানায়, অফিসে পিয়নরা কেউ নাই। সবাই মিছিলে গেছে।

আরে এযে কুত্তা খুঁজতে গিয়ে পত্রিকা বের হলো না অবস্থা। কম্পোজিটররা আছে তো!

আছে। আপনে তাড়াতাড়ি লেখেন। সিরাজ স্যারে বইসা আছে। মিজান ভাইয়ে রাজশাহীর নিউজ বানাইতেছে। প্রোক্টর শামসুজ্জোহা মারা গেছেন। আরো ১ জন নিহত, ৪ জন গুলিবিদ্ধ।

যতটুকু লিখছি কম্পোজে ধরিয়ে দেন। আমি বাকিটা লিখতে থাকি।

তিনি লিখে চলেনঃ এই অবস্থার মধ্যে আজ সকাল সাতটা হইতে বৈকাল পাঁচটা পর্যন্ত সান্ধ্য আইনের যে বিরতি ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহা অকস্মাৎ প্রত্যাহার করা হয় এবং কোনোরূপ বিরতি ছাড়াই পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা সান্ধ্য আইন জারি করা হয়।

খোঁজ লইয়া জানা যায়, গতকল্য রাজশাহীতে জনৈক অধ্যাপকের হত্যা এবং সান্ধ্য আইন জারির খবর এখানকার ছাত্র ও সর্বশ্রেণীর নাগরিকের মনে প্রবল অসন্তোষের সঞ্চার করে। তদুপরি গতকালকার সংবাদপত্রে আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি সম্পর্কে আশাবাদ

প্রকাশিত হওয়ার পরেও শেখ সাহেব গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে গতকাল ঢাকা ত্যাগ না করায় ছাত্র জনমনে এই বিশ্বাস দানা বাঁধিয়া উঠে যে, শেখ সাহেবের মুক্তির ব্যাপারে সরকার আন্তরিক নহেন। বর্তমান প্রচণ্ড গণজাগরণের পটভূমিতে উপরোক্ত দুইটি ঘটনা ছাত্র-জনতাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে এবং তাহারা সান্ধ্য আইনের অনুশাসন উপেক্ষা করিয়া দাবি-দাওয়ার প্রতিধ্বনি করিবার জন্য অকস্মাৎ রাস্তায় নামিয়া আসে।

কোন রকম পূর্ব ঘোষণা বা পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই প্রায় একই সঙ্গে শহরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এইভাবে ছাত্র-জনতাকে রাস্তায় বাহির হইতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হয়। রাত্রি ৮টার পর হইতে মধ্য রাত্রি পার হইয়া যাওয়া পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন স্থানে সমানে বিক্ষোভ চলিতে থাকে।

সামরিক বাহিনীর গাড়ির শব্দ এবং বিক্ষিপ্তভাবে বন্দুকের গুলির আওয়াজ পরিবেশকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তোলে।

পরের দিন ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯-এর দৈনিক ইত্তেফাকে এই রিপোর্ট ছাপা হয়।

রাত্রি বেড়ে চলে। বাসার আর সবাই ঘুমে অচেতন। শুধু আজাদের মা জেগে আছেন। আজাদ আর জায়েদ বাইরে গেছে। এখনও ফিরল না। একেকটা বন্দুকের গুলির আওয়াজ হয়, আর তার হৃৎপিণ্ড কেঁপে কেঁপে ওঠে। এই শীতের রাতেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যায়।

রাত দুটোর দিকে আজাদ আর জায়েদ ফেরে।

মা কোনো কথা না বলে খাবার টেবিলের শরপোষগুলো সরাতে থাকেন। বলেন, হাতপা ধুয়ে আসো। আমি খাবার গরম করি।

ভাত খেতে খেতে আজাদ আর জায়েদ রাস্তায় কোথায় কী ঘটেছে, তার গল্প করতে থাকে।

মা বলেন, আজাদ, তোকে যে বলেছিলাম, তুই মিছিলে যাবি না।

আজাদ বলে, মা, আজকা তো এটা মিছিল না। এটা হলো গিয়ে আইয়ুব খানের কুলখানি। আইয়ুব খান আজকেই শেষ। রাস্তায় মানুষ আর মানুষ। এইটাতে যাওয়ায় দোষ নাই। না গেলে দোষ আছে।

মা দীর্ঘশ্বাস গোপন করেন। ছেলে বড় হয়ে গেলে সে বাইরের ডাকে সাড়া দেবেই। মা কি আর তাকে আটকে রাখতে পারবে? সব মাই আটকে রাখতে চায়, কিন্তু কোন মাই বা পারে?

২১

আজাদেরা চলে আসে ৩৯ মগবাজারের বাসায়। হাজি মনিরুদ্দিন ভিলায়। এ কথা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার মুক্তিযোদ্ধাদের শিরদাঁড়া দিয়ে বরফের সাপ নেমে যায়। কারণ এই বাসার দেয়ালে এখনও লেগে আছে গুলির সীসা। এই বাসাতেই আজাদেরা ছিল একাত্তরে, এখানেই আশ্রয়-প্রশ্রয় পেয়েছিল বহু মুক্তিযোদ্ধা, এখানে রাখা হয়েছিল অনেক অস্ত্রপাতি-গোলাবারুদ। এই বাসা থেকেই আজাদ গিয়েছিল যুদ্ধে। এখান থেকেই ২৯শে আগস্ট ১৯৭১ দিবাগত রাতে, অর্থাৎ ৩০ আগস্টের প্রথম প্রহরে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় আজাদকে। এরপর আজাদ আর কোনোদিনও ফিরে আসে নাই।

মগবাজারের দিনগুলোর কথা জায়েদ কিংবা টগর ভুলতে পারে না, পারবেও না। কারণ এই বাসাতেই তারা গুলিবিদ্ধ হয়েছিল, সারারাত নাকি পড়েছিল রক্তশয্যায়, অচেতন। জায়েদের হাতের তালু আবার ঘামতে থাকে, শরীরে বোধ হতে থাকে উত্তাপ।

কিন্তু মগবাজারে তাদের দিনগুলো আনন্দপূর্ণই ছিল। আজাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পরীক্ষা দিচ্ছে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে। পাশাপাশি চেষ্টা করছে ব্যবসাপাতি করবার, সংসারটার হাল ধরবার। ফলে তাদের সুদিন ফিরে আসছে, এ রকম একটা ধারণা তাদের হচ্ছিল।

আজাদের মাও যেন এ-রকম একটা সুদিনের অপেক্ষাতেই ১০টা বছর ধরে কষ্ট আর সংগ্রাম করে আসছেন। তখন জায়েদের একটা দৈনন্দিন কাজ ছিল কাওরানবাজারে সকালবেলায় গিয়ে বড়বড় পাবদা মাছ কিনে আনা। পাবদা মাছ খুব প্রিয় ছিল আজাদের। তা এ-বাজার করার কাজটা তখন জায়েদ আনন্দের সাথেই করত। তার তো বেশি দরকার ছিল না, কোনোমতে তিনটা টাকা সরাতে পারলেই একটা রিয়ার স্টলের টিকেট যোগাড় হয়ে যেত। এরই মধ্যে জায়েদের এসএসসি পরীক্ষা হয়ে গেছে, সে পাসও করেছে। ফলে এখন হাতে তার প্রচুর সময়। ছবি দেখাটা সে সময়ের একটা উত্তম ব্যবহার বলে সে গণ্য করত। তবে আরেকটা মজার উপদ্রপ ঢাকা শহরে তখন দেখা দিয়েছিল। টেলিভিশন। তাদের বাসায় টেলিভিশন ছিল না। কিন্তু পাশের বাড়িওয়ালা কুলিখানের একটা টিভিসেট ছিল বটে। তাদের ঘরে টিভি দেখা হতো সন্ধ্যায়, রাতে। জানালা খোলা থাকত। দু বাড়ির মধ্যে একটা অভিন্ন প্রাচীর। সেটায় বসলে ভেতরের টেলিভিশন বেশ আরাম করেই দেখা যেত। সত্য বটে, কুলি খানের দুই মেয়ে ছিল, কিন্তু তাদের দিকে জায়েদের কোনো নজর ছিল না। একদিন সন্ধ্যায় জায়েদ মগ্ন হয়ে টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখছে তার পাঁচিল-আসনে বসে, অনায়াসে, আয়েশ করেই। হঠাৎই একটা লাঠির বাড়ি এসে পড়ে তার পায়ের কাছে দেয়ালের গায়ে। সে তাড়াতাড়ি সরে যায় খানিক। তখনই হুঙ্কার। জায়েদ দেখতে পায় কুলি খানের টাক বারান্দা থেকে আসা আলোয় চকচক করে উঠছে, কুলি খানের হাতের লাঠি আবার দুলে উঠলে জানালা দিয়ে আসা টেলিভিশনের আলোয় সেটা একটা লাঠির একাধিক সচল প্রতিচ্ছবি তৈরি করে তার দিকেই এগিয়ে আসে, কর্তব্য স্থির করতে জায়েদের সময় লাগে না, সে লাফ দিয়ে দেয়ালের এপারে নেমে আসে, কিন্তু আসার আগে তার কাঁধে লাঠির একটা বাড়ি পড়েই যায়। কুলি খানের সরোষ হুঙ্কার চলে আরো খানিকক্ষণ। আজাদ বাসায় ছিল। সে এগিয়ে আসে।

জায়েদ তাড়াতাড়ি অর্ন্তধান করার সুযোগ খোঁজে।

'কী হয়েছে রে জায়েদ, মেয়ে দেখতে উঠেছিলি?'

'না দাদা, টিভি দেখতে উঠছিলাম।'

'টিভির জন্য বাড়ি মেরেছে। ছোটলোক আছে তো। চল।'

'কই যাইবেন?'

'বায়তুল মোকাররম। এখন খোলা আছে? না বন্ধ হয়ে গেছে?'

'৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে তো!'

'তাহলে এখনই চল বায়তুল মোকাররমে যাই। টিভি কিনে আনি।'

সে রাতেই তারা বায়তুল মোকাররমের টেলিভিশনের দোকানে যায়। বেশির ভাগ দোকান তখন বন্ধ হয়ে গেছে। একটা দুটো খোলা আছে। জায়েদ বলে, দাদা, কালকা আসি। বাইছা ঘুইরা দামাদামি কইরা কিনি।

'না। আজকেই কিনতে হবে।' আজাদ বলে।

তারা একটা স্যানিও ব্লাক এন্ড হোয়াইট টেলিভিশন সেট কেনে, দাম পড়ে ৯৭০ টাকা।

বাসায় ফিরে আসার পর টিভিযন্ত্রটা রাতেই সেট করা হয়। সেট করা হয় কুলি খানের বাড়ির দিকের রুমটায়। জানালা খুলে সাউন্ড বাড়িয়ে অন করা হয় টিভি।

সেই থেকে এই বাসায় টিভি চলে। জায়েদের খুব প্রিয় অনুষ্ঠান ত্রিরত্ন। হাসির অনুষ্ঠান। ওটা শুরু হলেই আজাদ হাঁক পাড়ে, জায়েদ চলে আয়। আর আজাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লুসি শো।

কিন্তু একরাতে টিভিতে তার প্রিয় অনুষ্ঠান দেখতে বসে জায়েদ রীতিমতো ক্ষেপে যায়। অনুষ্ঠান বন্ধ করে হচ্ছে হাম্দ আর নাত। তারপর দেশাত্মবোধক গান। জায়েদ বসেই থাকে। এরপর যদি ত্রিরত্ন হয়। না, হয় না। তার বদলে পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত। ব্যাপার কী?

ব্যাপার কিছুই নয়। নতুন সামরিক আইন প্রশাসক এখন জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। কেমন লাগে? দিন দুই তিন আগে, ২৪ মার্চ ১৯৬৯, আইয়ুব খান বিদায় নিয়েছে। এসেছে ইয়াহিয়া খান। ঢাকার লোকদের মধ্যে অবশ্য তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া নাই। আইয়ুব খান যাওয়ায় অবশ্য লোকে খুশি। জায়েদ তো আর রাজনীতি বোঝে না। সে বোঝে টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের ভালো-মন্দ। হাসির নাটক না হয়ে এই শালা মিলিটারি জেনারেলের ইংরেজি বক্তৃতা কে শোনে?

সে রাগে গজর-গজর করতে থাকে।

২২

বাশার চিঠি লিখেছে আজাদকে। তার পড়াশোনা শেষ। এখন সে আর করাচিতে থাকতে নারাজ। ঢাকায় চলে আসবে। ঢাকায় তার কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে বটে। তবে সেখানে সে উঠতে চায় না।

আজাদ তাকে তাড়াতাড়ি চিঠির জবাব লেখে। তোমার কোনো চিন্তা করার দরকার নাই। তুমি শুধু চলে আসো। ঢাকার মাটিতে পা রাখো। বাকি দায়িত্ব আমার।

এয়ারপোর্টে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আজাদ। বাশার বের হয়। আজাদ তাকে জড়িয়ে ধরে। কতদিন পরে দেখা হলো দু'বন্ধুর। প্রায় দেড় বছর।

আজাদ ট্যাক্সি দাঁড় করিয়েই রেখেছিল। তারা ট্যাক্সিতে ওঠে। তেজগাঁ থেকে মগবাজার। পৌঁছতে বেশি দেরি হয় না।

মা তৈরি হয়েই ছিলেন। জানেন আজকে আজাদের করাচির বন্ধু আসবে। তিনি ভালোমন্দ রান্না করেই রেখেছেন।

মগবাজারের বাড়িটায় রুম আছে তিনটা। একটা রুম বাশারের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

পরদিন বাশার যায় টাঙ্গাইল। তার বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে। তার বাবা পুলিশে চাকরি করেন। টাঙ্গাইলে তাদের অনেক বিষয়-সম্পত্তি।

দুদিন পরে বাশার ফিরে আসে আজাদদের বাসায়। পড়াশোনা শেষ। এখন চাকরি-বাকরি খোঁজা দরকার। ঢাকায় থাকতে হবে। কোথায় থাকবে!

আজাদের মা মানুষের জন্য করতে পারলে খুশি হন। আজাদও ভয়ানক বন্ধুবৎসল। আজাদ স্পষ্ট করে বলে দেয় বাশারকে, যতদিন তোমার চাকরি না হচ্ছে, ততদিন তুমি এ বাসায় থাকবা। এই রুমটা এটা তোমার।

বাশার বলে, 'তা কী করে হয়। আমি একটা রীতিমতো বাইরের লোক। আমার খাওয়া-দাওয়া, থাকা, একটা খরচ আছে না। আজাদ তো এখনও ভালো কিছু করো না। তার পড়াশোনাও শেষ হয় নাই। এমন না যে তার বাবার কাছ থেকে তুমি সাহায্য নেয়।'

আজাদের মা বলেন, 'বাবা, তোমাকে এত চিন্তা করতে হবে না। আমরা যদি খাই, তুমিও খাবে, আমরা যদি না খেয়ে থাকি, তুমি না খেয়ে থাকবে। পারবে না?'

'তা পারব।' বাশার মাথা নাড়ে।

সেই থেকে বাশার রয়ে যায় এ-বাসাতেই।

পরে, ইতিহাসের আরেক প্রান্তে দাঁড়িয়ে জায়েদের মনে হবে, আজাদের মা'র মনে হবে, বাশার এ বাসায় না উঠলেই ভালো করত। মৃত্যুই বোধ করি তাকে টেনে এনেছিল এ বাসায়।

বাশার চাকরি খুঁজতে থাকে। কয়েকদিনের মধ্যেই মর্নিং নিউজ পত্রিকায় চাকরিও পেয়ে যায় সে।

আজাদের মতো বাশারেরও ঝোঁক ছিল সাহিত্য পাঠের দিকে। নিউ মার্কেট গিয়ে সেও বই কেনে। চাকরিতে যোগ দিয়ে প্রথম মাসের বেতন পেয়ে সবার আগে সে আজাদের মার হাতে দেয় কিছু টাকা, বলে, খালাম্মা আমি তো আপনার ছেলের মতোই। আপনার ছেলে চাকরি করলে নিশ্চয় আপনার হাতে টাকা দেবে। আমিও বেতন পেয়েছি, প্রত্যেক মাসে কিছু কিছু টাকা আমি আপনাকে দেব। আপনি না করতে পারবেন না।

এ কথা শোনার পরে আজাদের মা না-ই-বা করেন কী করে?

তারপর বাশার যায় নিউ মার্কেটে। কিনে আনে পেঙ্গুইন ক্লাসিকের কয়েকটা বই। টলস্টয়ের চাইল্ডহুড, বয়হুড, ইয়ুথ বইটা তার মধ্যে একটা। কিন্তু যতই সে মন দিয়ে বই পড়ুক না কেন, টেলিভিশনে শাহনাজ বেগমের গান হলে তাকে ডাকতেই হবে।

সে হা করে তাকিয়ে থাকে শাহনাজ বেগমের মুখের দিকে।

আজাদ বলে, বাশার, তুমি কি গান শোনো, না গেলো। তারপর নিজেই খোলসা করে, মনে হয় তুমি কান দিয়া গান শোনো, আর চোখ দিয়া ছবি গেলো।

বাশারের কানে এসব টিপ্পনি ঢোকে না। সে শাহনাজ বেগমের মুখের দিকে হা করে তাকিয়েই থাকে।

২৩

আজাদের পরীক্ষা। বাসার সবাই সন্ত্রস্ত। মা কাউকে কথা বলতে দেন না। শব্দ করতে দেন না। সবাই কথা বলে ফিসফিস করে। বাসায় ডিমের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ছেলে যদি পরীক্ষায় যাবার আগে ডিম দেখে তাহলে সে পরীক্ষায় গোলা-পেয়ে যেতে পারে।

সকাল বেলা মা চিনির শরবত বানিয়ে আনেন আজাদের সামনে। 'এই চিনিটা পড়া চিনি। জুরাইনের বড় হুজুর নিজে চিনিতে ফুঁ দিয়ে দিয়েছেন। বাবা, বিসমিলাহ বলে খা। তিন ঢোকে খাবি। আরে কী করিস, বসে খা।'

'কী জিনিস?'

'আছে। হুজুর দিয়েছেন।'

আজাদ প্রশ্ন না করে খায়। মা আজাদের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, ইনশালাহ পরীক্ষা ভালো হবে।

আজাদ বলে, তুমি দোয়া করলে তো ভালো হবেই।

'আলার রহমতে। তবে চেষ্টাও করতে হবে। তুই তো এবার অনেক পড়াশুনা করেছিস।'

গোসল সেরে নিয়ে কাপড়চোপড় পরে আজাদ প্রস্তুত হয়। পাইলট কলম। ইয়ুথ কালি। কলমে সে সকালেই কালি ভরে নিয়েছে। সঙ্গে আরেকটা কলম। পকেটে আইডি কার্ড। সব ঠিক আছে। আজাদ মাকে কদমবুসি করে। মা বলেন, বাবা, বিসমিলাহ করে বের হ। ডান পা আগে দিস। পরীক্ষার খাতা হাতে পেয়ে বিসমিলাহ বলে আগে রাব্বি জেদনি এলমান তিনবার পড়বি। ইনশালাহ পরীক্ষা ভালো হবে।

আজাদ বেরিয়ে যায়।

মা তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেন। ছেলে হেঁটে চলে যায় দৃষ্টির আড়ালে। তবু মা গেট ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। এটাই ছেলের শেষ পরীক্ষা। এমএ ফাইনাল। এই পরীক্ষায় পাস করলেই মার মিশন শেষ। ছেলেকে নিয়ে তিনি একদিন এক বস্ত্রে ইস্কাটনের বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। তখনও সে স্কুলে পড়ে। ম্যাট্রিকও পাস করে নাই। নাবালক। তাঁর নিজের কী হবে তিনি জানেন না। ছেলের কী হবে, তাও জানেন না। স্বামীর বাড়ি থেকে চলে আসার পরে ছেলে স্কুল ছেড়ে দিল। সাফিয়া বেগমের বোন মারা গেল। কী ভীষণ দিন গেছে এককেটা। এমন দিনও গেছে চাল কেনারও টাকা ছিল না। ছেলে উচ্ছন্নে যাওয়ার যোগাড়। সেখান থেকে সে ফিরে এল। ম্যাট্রিক পাস করল। আইএ পাস করল। বিএ পাস করেছে। এবার এমএ। কূলে এসে গেছে তরী। অচিন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে। এখন শুধু বন্দরে ভিড়বার অপেক্ষা। তাঁর নিজের জীবনে তিনি আর কিছু চান না। ছেলের পরীক্ষাটা এখন ভালোয় ভালোয় শেষ হলে হয়। তারপর ছেলের নিজের জীবন সে নিজে গড়ে নেবে। তাঁর কিছু বলার নাই। বাবার বিষয়-সম্পত্তির ভাগ সে পেলে পেলো। না পেলেও কিছু যায় আসে না। তিনি নিজের চোখের সামনে আজাদের বাবাকে ছোট থেকে বড় হতে দেখেছেন। বিষয়-সম্পত্তি আসল কথা নয়। আসল কথা হলো ঘরের শান্তি। মনের শান্তি। ছেলেকে তিনি খুব ভালো একটা মেয়ে দেখে বিয়ে দেবেন। লক্ষ্মী শান্ত একটা মেয়ে দেখে। তারপর সংসারের ভার ছেড়ে দেবেন বউমার হাতে। তিনি সংসারের নিত্যদিনের কচকচানির ঊর্ধ্বে উঠে যাবেন। জুরাইনের পীর সাহেবের কাছে যাবেন। তাঁর নির্দেশমতো ইবাদত-বন্দেগি করবেন।

আম্মা, কালা মুরগিটা কোনখানে ডিম পাড়ছে দেখো। মহুয়া চিৎকার করে।

'কোনখানে?'

'এই যে স্টোরের চিপায়।'

'কই দেখি দেখি।'

'দেখবা। তোমার ছেলে না পরীক্ষা দিতে গেছে। তুমি ডিম দেখলে হে ফির গোলা-পাইব না তো!'

'তাও তো কথা। তাহলে আমি আর দেখি না। তুই বুঝমতো মিছিল করে রাখ।'

মহুয়া খিলখিল করে হেসে ওঠে। আম্মা তুমি যে কিনা। দাদায় দেয় পরীক্ষা, আর তুমি ডিম না দেখা নিয়া শাস্ত্র মানো। হিহিহিহিহিহি। মুরগির ডিম না দেখলেই যদি এমএ পাস দেওন যাইত, তাইলে বহু লোকে এমএ বিএ হইয়া যাইত।

২৪

আজাদের মার মৃত্যুর পরে আজাদের খালাত বোন কচিরও কত কথা মনে পড়ে। জন্মাবধি সে তার এই খালার কাছেই মানুষ। ১৯৬৯/৭০ সালে তার বয়স কত আর হবে, ১০/১১ বছর। এই সব সময়ের মধুর সব স্মৃতি তার মনে উঁকি দেয়। তার মনে পড়ে, তাদের খালা সাফিয়া বেগম, যাকে তারা ডাকত আম্মা বলে, সব সময় শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতেন। একবার কী উপলক্ষে কচি বলেছিল দুবলা ঘাস, আম্মা বলেছিলেন, কী বললে, দুবলা নয়, বলবে দূর্বা। শোনো, কলকাতার ভিখারিরাও সুন্দর করে কথা বলে। এসে বলে, মা দুটো চাল দিন না মা! শুনতেও কতো ভালো লাগে।

আম্মা সব সময় বই পড়তেন। শরৎচন্দ্র তাঁর ছিল সবচেয়ে প্রিয় লেখক। রবীন্দ্রনাথের বই পড়তেন খুবই মন দিয়ে। বাসায় উল্টোরথ রাখা হতো। আম্মার হাতে থাকত এই পত্রিকাটা। উল্টোরথের গল্প, উপন্যাস তিনি মন দিয়ে পড়তেন।

কচিও ছিল গল্পের বইয়ের পোকা। একটা নতুন বই বাসায় এলে কে আগে পড়বে, এই নিয়ে প্রতিযোগিতা হতো আম্মার সাথে তার। শেষে আম্মাও পড়ছেন, তিনি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে কচিও

পড়ছে, এই রকম চলত। তারপর আবার অবসর পেলে আম্মা পড়ার জন্যে বই হাতে নিতেন। নিয়েই বলতেন, কচি...

জি আম্মা।

আমার চিহ্ন কই?

কচি জিভে কামড় দিত। আম্মা কোন পাতা পর্যন্ত পড়েছেন, একটা চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলেন। এটা সে হারিয়ে ফেলেছে। আজকে যে প্রথম সে পেজ মার্কার হারাল, তা নয়। প্রায়ই সে এই কর্মটি করছে। মার পেজ মার্কার হারিয়ে ফেলছে। বা নিজে পড়তে পড়তে বিভোর হয়ে গিয়ে পেজ মার্কার ফেলে দিচ্ছে মাটিতে। পরে সেটা তুলে যে পাতায় রাখছে, সেটা আর যাই হোক, আম্মার কাঙ্ক্ষিত পাতা নয়।

আজাদ দাদাও খুব বই পড়ত। আজাদ দাদা শুধু যে ইংরেজি বই পড়ত, তা নয়, বাংলা বইও পড়ত খুব। আর তার ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া বন্ধুদের বলত, তোদের জন্যে আমার খুব আফসোস হচ্ছে রে। তোরা রবীন্দ্রনাথ পড়িস না! শরৎচন্দ্র পড়িস না! মানিক তারাশঙ্কর পড়িস না! তোদের হবে কী?

একবার আজাদ দাদা একটা মজার কাণ্ড করেছিল। কচিরা গিয়েছিল জোনাকি সিনেমা হলে ছবি দেখতে। মহুয়া, তার বর, আর সে। তারা ফিরে আসার পরে আজাদ দাদার সঙ্গে দেখা।

কই গিয়েছিলি? আজাদ দাদা বলে।

সিনেমা দেখতে–কচি বাসার ভেতরে দৌড় ধরে।

এই এই কই যাস? এদিকে আয়। শোন হাতমুখ ধুয়ে খেয়েদেয়ে একটা রচনা লিখবি। এই যে সিনেমা হলে যাওয়া থেকে শুরু করে পুরা সিনেমাটা কী দেখলি, এই অভিজ্ঞতাটা নিজের ভাষায় লিখবি।

দাদার আদেশ, তারা ফেলতে পারে না। কচিকে ঠিকই লিখতে বসতে হয়। এখন সিনেমা হলে রিকশায় চড়ে যাওয়া আর ফিরে আসা, মধ্যখানে বাদাম খাওয়া, এসব না হয় সে লিখল। কিন্তু রাজ্জাক আর কবরীর মধ্যে যে ভাব-ভালোবাসা হলো, এই কাহিনী সে এখন কীভাবে লেখে? রচনার ভিতরে সেসব লেখা যায়? কচি খুবই মুশকিলে পড়ে যায়।

মাঝেমধ্যে আজাদ ডাকত কচিকে, কচি, এদিকে আয়। একটা গান শোনা তো।

আজাদ দাদাকে গান শোনাতে কচির তেমন সংকোচ নাই। কিন্তু পাশেই বাশার দাদা যে রয়ে গেছে। বাইরের মানুষ। তার সামনে কি কচির লজ্জা লাগে না।

'কী, গা।'

কচি হাত কচলায়।

'এখন গান না শোনালে সিনেমা দেখতে যাওয়া বন্ধ। জোনাকিতে ভালো সিনেমা এসেছে।'

কচি বলে, কোন গানটা শোনাব?

বাশার বলে, ওইটা শোনাও। আমি যে কেবল বলেই চলি, তুমি তো কিছুই বলো না।

কচি আরো লজ্জা পায়। এটা হলো আগন্তুক ছবিতে কবরীর গাওয়া গান। এই গান এখানে গাওয়া যায়? শেষে আজাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আর নতুন ছবি দেখতে যাওয়ার লোভে সে গলা খোলে, আমি যে কেবল বলেই চলি, তুমি তো কিছুই বলো না।

আর কচির মনে পড়ে, আম্মা তাদের ভাত তুলে খাওয়াতেন। আম্মার প্রত্যেকটা আঙুল সে চেটে-চেটে খেত। তবে আম্মার সঙ্গে মাঝখানে তার আর থাকা হয় নাই। যুদ্ধের পরে নিজের পছন্দমতো বিয়ে করেছিল আম্মা রাগ করেছিলেন। কচি ওই বাসায় যায়নি বহুদিন। কেবল জীবনের শেষের দিকে এসে আম্মা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

২৫

আজ ইলেকশন। কিশোর জায়েদ বোঝে না, ইলেকশন কী? তবে তার মধ্যে তীব্র কৌতূহল। সে ইলেকশন দেখতে যাবে। চারদিকে নৌকা মার্কার জয়জয়কার। এবার নাকি নৌকার জয় হবে। নৌকা ছাড়া মার্কা আছে হ্যারিকেন। এই কদিন শহরটা ইলেকশন ইলেকশন করে পাগল হয়ে গেছে। মাঝেমধ্যেই মিছিল বের হয়, মার্কাটা কী? নৌকা। জাগো জাগো বাঙালি জাগো। তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা। সেসব মিছিলে যাওয়ার তার খুব ইচ্ছা ছিল, একদিকে আম্মা, আরেক দিকে দাদা, এদের কঠোর শাসনে সেই খায়েশটা তার পূরণ হয় নাই। এদিকে টেলিভিশনেও ভালো অনুষ্ঠান কম। কয়েকদিন প্রচার হলো শুধু ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাসের খবর। কী বড় জলোচ্ছ্বাসটাই না হয়ে গেছে কদিন আগে। দশলাখ লোক নাকি মারা গেছে। যে সে কথা!

জায়েদ বাসায় কিছু না বলে বেরিয়ে যায় নির্বাচন দেখতে। ডিসেম্বর মাস। ১৯৭০ সাল। বাইরে শীত পড়েছে ভেবে জায়েদ একটা সোয়েটার পরে ঘর থেকে বেরয়। কিন্তু বাইরে এসে বোঝে সে একটা ভুল করেছে। রোদ চড়চড় করছে। সোয়েটারটা গায়ে রাখা যায় না। সে সোয়েটার খুলে কাঁধে ঝোলায়। মুশকিলটা হলো তার শার্টের পকেটটার সেলাই খুলে গেছে। পকেটটা বুকের কাছে ঝুলে আছে। ওপরে সোয়েটার থাকবে ভেবে সে আর শার্টটা পাল্টায় নাই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সবাই তার ছেঁড়া পকেটটার দিকেই তাকিয়ে আছে। সে গলায় পেঁচানো সোয়েটারের হাতদুটো পকেটের ওপরে বারবার টেনে আনছে, যাতে এটা দেখা না যায়। আস্তে আস্তে সে চলে আসে মগবাজারের মোড়ে। ভোটটা হচ্ছে কোথায়? সে দেখতে পায়, রিকশার গায়ে নানা সুন্দর সুন্দর পোস্টার লাগানো। মনে হয় এই রিকশা ভোটের কাজ করছে। সে রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে, ভোট হইতাছে কই? 'ওই তো ইস্কুলে'- রিকশাওয়ালা দেখিয়ে দেয়।

ওরেব্বাস। স্কুলের সামনে ভিড়। আর পোস্টার টাঙিয়ে এলাকাটাকে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে দেখা যাচ্ছে। গেটের কাছে লুঙ্গি আর খাকি শার্ট আর খাকি জুতা পরা আনসার দেখা যাচ্ছে। তাদের হাতে লাঠি। জায়েদ এগুতে থাকে। ভোটকেন্দ্রের চত্বরে দেখা যাচ্ছে সবার বুকে মার্কা-আঁকা ব্যাজ। নৌকা মার্কার ব্যাজটা সুন্দর। কাগজটা ঝকঝক করছে। আর হ্যারিকেন মার্কার ব্যাজটা ম্যাটমেটে। তার খুবই শখ হয় সে একটা নৌকা মার্কার ব্যাজ পরবে। ওই যে দাদার বন্ধু ফারুককে দেখা যাচ্ছে। সে তাঁর কাছে যায়। 'ফারুক ভাই, একটা নৌকা মার্কা ব্যাজ দেন না?'

ফারুক এদিকওদিক তাকায়। 'ব্যাজ তো আর নাই।'

এদিকে জায়েদের এক বন্ধু মিজানকে দেখা যাচ্ছে একটা নৌকা মার্কা আরেকটা হ্যারিকেন মার্কা ব্যাজ পরে আছে।

মিজান বলে, কী রে জায়েদ কী হইছে?

জায়েদ বলে, ব্যাজ খুঁজতাছি।

'লাগাইবি?'

'হ।'

'লাগা।'

সে একটা হ্যারিকেন মার্কা ব্যাজ এগিয়ে দেয়।

জায়েদ উৎসাহ পায় না। সে নৌকা মার্কা ব্যাজ খুঁজছিল।

মিজান এসে তার বুকে হ্যারিকেনের ব্যাজ পিন দিয়ে লাগাতে লাগাতে বলে, কিরে, পকেট ছিঁড়ছস কেমনে?

জায়েদ বলে, আরে ব্যাটা টাকার ভারে ছিঁইড়া গেছে।

'হ। কত টাকা। ল। এই ব্যাজ দিয়া তোর দুই কাম হইল। পকেটটাও জোড়া লাগান হইল, ফির ব্যাজও লাগান হইল।'

জায়েদ হ্যারিকেন মার্কার ব্যাজ পরে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে। তখন চারদিকের পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখে তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। নৌকা মার্কা জিততে যাচ্ছে। হ্যারিকেন হেরে যাবে একদম নিশ্চিত। সে কেন তাহলে নৌকা মার্কার ব্যাজ পেল না। সে হ্যারিকেনের ব্যাজটা খুলে ফেলে। তারপর আস্তে করে ফেলে দেয়।

'এই জায়েদ, তুই এখানে কী করিস?' আজাদ দাদার গলা। সর্বনাশ। সে সভয়ে তাকায়। আজাদ দাদা তাঁর বন্ধুবান্ধব নিয়ে এদিকটাতেই আসছে। বন্ধুরা গল্পে মশগুল।

'এদিকে আয়'-আজাদ ডাকে।

জায়েদ এগিয়ে যায়।

'কখন এসেছিস?'

'এই তো ৫ মিনিট হইব।'

'যা, বাড়ি যা।'

'আচ্ছা।'

'এই শোন, শার্ট ছিঁড়েছিস কেমন করে?'

'সেলাই খুইলা গেছে।'

'যা, এমনি আসা নিষেধ, তার ওপর আবার ছেঁড়া শার্ট। ভাগ।'

জায়েদ তাড়াতাড়ি স্কুল-চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

রাতের বেলা টেলিভিশনের অনুষ্ঠান মাঝেমধ্যেই বন্ধ করে দেখানো হচ্ছিল ভোটের ফল। জায়েদ বুঝতে পারে, তার ধারণাই ঠিক। সব নৌকা মার্কাই জিতে নিচ্ছে। ভাগ্যিস সে তার হ্যারিকেন মার্কার ব্যাজটা ফেলে দিয়েছিল। টিভি কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। রেডিও খোলা থাকে। কিন্তু রেডিওটা আছে আজাদ দাদার কাছে। বাশার ভাইজান আর আজাদ দাদা গল্প করছে আর রেডিও শুনছে। সেখানে গিয়ে রেডিও শোনার আশা বৃথা।

জায়েদ এরচেয়ে ঘুমিয়ে পড়াটাকেই শ্রেয় বলে মনে করে।

বিছানায় শুয়ে সে শুনতে পায় বাইরে লোকেরা স্লোগান দিচ্ছে নৌকা নৌকা বলে। মনে হচ্ছে বিজয়মিছিল। সেই মিছিলের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে দূর রাত্রির গায়ে। আর আস্তে আস্তে ঘুমের অতলে পৌঁছে যায় জায়েদ।

২৬

ক্রিকেট খেলা চলছে ঢাকা স্টেডিয়ামে। পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ থেকে শুরু হয়েছে এই টেস্ট। আজ ফোর্থ ডে। পাকিস্তান দলে বাঙালি আছে প্রথম একাদশে রকিবুল হাসান। টুয়েলভ্‌থ ম্যান হিসাবে সুযোগ পেয়েছে তান্না। নিউজিল্যান্ডের টার্নার সেঞ্চুরি করেছে। পাকিস্তান দলের পশ্চিম পাকিস্তানী খেলোয়াড়রা যে ব্যাট নিয়ে নেমেছে, তার পেছনে রঙিন হাতলটা চিকন হয়ে ব্যাটের ঘাড় থেকে পিঠের দিকে নেমে গেছে। দেখতে তরোয়ালের মতো লাগে। তরোয়াল ছিল ভুট্টোর পিপিপির নির্বাচনী প্রতীক। স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে তাই নিয়ে গুঞ্জন। দেখছস, মাউড়াগুলান তরোয়াল মার্কা ব্যাট নিয়া নামছে। এবার দেখা যাক রকিবুল হাসান কী ব্যাট নিয়ে নামে। সবার মধ্যে এই ঔৎসুক্য ছিল।

রকিবুল হাসান নেমেছিল জয় বাংলা লেখা ব্যাট নিয়ে। গ্যালারি তালি দিয়ে উঠেছিল সোল্লাসে। তবে এই তালি দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। জিরো আর এক রান করে দু ইনিংসে আউট হয়ে গিয়েছিল রকিবুল।

গ্যালারিতে বসে আছে আজাদ, কাজী কামাল আর হিউবার্ট রোজারিও। তারা বাদাম চিবাচ্ছে। একটা চানাচুরওয়ালা ঢুকে পড়েছে গ্যালারিতে। তার পরনে লাল রঙের পোশাক, মাথায় কোনাকার টুপি, পায়ে ঘুঙুর। তার হাতে চোঙ। চোঙে মুখ লাগিয়ে সে হাঁক ছাড়ছেঃ চানাচুর গরম, জয় বাংলা চানাচুর।

কাজী কামাল সেদিকে দেখিয়ে হাসে। বেটা ব্যবসা ভালো বুঝেছে। একটা সিগারেটওয়ালা সিগারেট নিয়ে গ্যালারির আসনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে দ্রুত পায়ে চলে যাচ্ছে। আজাদ বলে, কীরে তোর সব সিগারেট কি জয় বাংলা নাকি!

সিগারেটঅলা বুঝতে পারে না। বোকার মতো হাসে। আজাদ বলে, বিদেশী সিগারেট আছে?

নাই স্যার। সিগারেটঅলা লোকটা দ্রুত পায়ে চলে যায়।

কাজী কামাল বলে, বাঙলা সিগারেট আর বাঙলা মদ, এসবের বেলায় জয় বাংলা না হইলেই ভালো।

আজাদ বলে, এসবের বেলায় পাকিস্তান জিন্দাবাদ কিন্তু আরো খারাপ।

কামাল বলে, ক্যান দোস্ত। তুমি না করাচি থাইকা পইড়া আইলা।

আজাদ বলে, আরে দেখে এসেছি না। দেখে শুনেই তো বলছি। ওদের সাথে থাকা যাবে না।

রুমী আর জামীকে দেখা যায়। তারা চানাচুরওয়ালাটাকে ধরে নিয়ে এসেছে।

রুমী বলে, আজাদ খাবে নাকি! জয় বাংলা চানাচুর।

আজাদ বলে, নাও না দেখি। কেমন লাগে!

ছক্কা। স্টেডিয়ামে হৈ ওঠে। কে মারল? লোকজন সব রেডিওতে কান পাতে। অনেকেই সঙ্গে করে রেডিও নিয়ে এসেছে। রেডিওঅলারা ভলুম বাড়াতে নব ঘোরায়।

জুয়েল আসে গ্যালারিতে। জুয়েল পূর্ব পাকিস্তানের সেরা ব্যাটসম্যান। আজাদ বয়েজে খেলেছে। এখন খেলে মোহামেডানে তার খেলায় একটা মারকুটে ভাব আছে। ৪৫ ওভারের সীমিত ম্যাচে সে ঝড়ের মতো পেটায়। বল জিনিসটা যে পেটানোর জন্য, এটা তার ব্যাটিং দেখলে বোঝা যায়। উইকেট কিপিং-ও করে। সে এসে বসে কাজী কামালের পাশে। কাজী কামাল প্রদেশের সেরা বাস্কেট বল খেলোয়াড়।

জুয়েল বলে, কামাল, তোরে নাকি পাকিস্তান ন্যাশনাল টিমে ডাকছে!

'হ।'

'গেলি না?'

'কিয়ের ন্যাশনাল টিম। ওয়েস্ট পাকিস্তানে যাব না। জয় বাংলা টিম হইলে যাব।'

রুমী বলে, এসেম্বিতে যে কী হবে! ভুট্টো তো বলে দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কেউ এলে কসাইখানা বানানো হবে।

জুয়েল বলে, জনা তিরিশেক নাকি আইসা গেছে অলরেডি পাকিস্তান থাইকা।

আজাদ বলে, ঢাকাকে রাজধানী বানাতে হবে। সব হেড কোয়ার্টার ঢাকায় আনতে হবে। আর্মিতে বেশি বেশি বাঙালি রিক্রুট করতে হবে। পাটের টাকা সব বাংলায় আনতে হবে। এতদিন ওরা আমাদেরকে কলোনি বানিয়ে রেখেছে, এবার আমরা ওদেরকে কলোনি বানাব। তাইলে না শোধ হয়।

রুমী বলে, ও সব হবে না। তার চেয়ে স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করে দেওয়া ভালো। লেফ্‌টরা যে ফরমুলা দিয়েছে। ওটাই ভালো। মাও সে তুং তো বলেই দিয়েছেন, বন্দুকের নল সব ক্ষমতার উৎস।

আবার বাউন্ডারি। দর্শকদের হই-হল্লা।

খেলায় এখন বিরতি। লাঞ্চ পিরিয়ড চলছে। রেডিওতে বার-বার বলা হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেবেন। সবাই অধীর আগ্রহে রেডিও ধরে বসে আছে। বেলা একটার দিকে রেডিওতে ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা প্রচারিত হতে থাকে। ইয়াহিয়ার নিজের মুখে নয়। অন্য একজন পড়ে শোনায়। পরশুদিন ৩ মার্চ ১৯৭১ থেকে যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় বসার কথা ছিল, তা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। ঘোষণা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরো গ্যালারি একযোগে স্লোগান দিয়ে ওঠে, ইয়াহিয়ার ঘোষণা, মানি না মানব না। ভুট্টোর পেটে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। জয় বাংলা। তাকিয়ে দ্যাখো পূর্ব গ্যালারির দিকে। সমস্ত গ্যালারি আগুনে জ্বলে উঠেছে যেন। যার কাছে যা আছে, তাতেই আগুন লাগিয়ে দিয়েছে দর্শকরা।

আজাদ, জুয়েল, রুমী, জামী, কামাল, হিউবার্ট রোজারিও-সবাই সেই মিছিলের অংশ হয়ে যায় আপনাআপনিই। খেলা বন্ধ। সবাই বেরিয়ে আসছে স্টেডিয়াম থেকে। বিশাল মিছিল শুরু হয়ে যায় স্টেডিয়াম এলাকায়।

ঢাকার অন্য এলাকা থেকেও মিছিল আসতে থাকে। পুরো ঢাকাই যেন একটা বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্র। ফুঁসছে, গর্জে উঠছে।

রুমী বলে, জামী, চল তোকে আব্বার অফিসে রেখে আসি। না হলে আবার আব্বা চিন্তা করবে।

রুমী আর জামী মিছিল থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু মিছিল থেকে বেরুনো কি সোজা কথা? চারদিকেই তো মিছিল। চারদিক থেকেই তো আসছে মানষের স্রোত। সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে গগনবিদারী স্লোগান। সবার হাতে লাঠি, রড। মুখে স্লোগান, বাঁশের লাঠি তৈরি করো বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

পূর্বাণী হোটেলে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির মিটিং চলছে। শেখ সাহেব ওখানে আছেন। জনতা পূর্বাণী হোটেলের দিকে চলেছে।

আজাদ বলে, এইখানে থেকে লাভ নাই। চল, ইউনির্ভাসিটি যাই। ওখানে কী হয় দেখে আসি। জুয়েল, কাজী কামাল রাজি হয়। তারা হাঁটতে হাঁটতে ইউনিভার্সিটির দিকে রওনা দেয়। ওখানেও একই অবস্থা। পুরোটা ক্যাম্পাস একটা বিশাল মিছিলে পরিণত হয়েছে। এক দাবি, এক দফা, বাংলার স্বাধীনতা। ভুট্টোর পেটে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

বাসায় ফিরতে ফিরতে মেলা রাত। মা জায়নামাজে। আজাদ এসেছে টের পেয়ে তিনি উঠে আসেন। বলেন, সারাদিন কই ছিলি না ছিলি কোনো খবর নাই। চোখমুখের অবস্থা কী করেছিস! যা, হাতমুখ ধুয়ে আয়!

আজাদ হাতমুখ ধুয়ে আসে। মা টেবিলে খাবার বেড়ে দেন। আজাদ টিভিটা ছেড়ে খানিক দেখে টেবিলে চলে আসে। ছেলের প্লেটে তরকারি তুলে দিতে দিতে মা বলেন, আজকেও মিছিলে গিয়েছিলি?

আজাদ হাসে। আজকে মা কাউকে মিছিলে যেতে হয় নাই। যে যেইখানে ছিল, সেই জায়গাটাই মিছিল হয়ে গেছে। আমি ছিলাম স্টেডিয়ামে গ্যালারিতে। গ্যালারিটাই মিছিল হয়ে গেল। তুমি তো স্টেডিয়াম থেকে বের হবে, মানষের স্রোত ধরে বের হতে হবে, সবাই তো স্লোগান ধরেছে, তারপর রাস্তা, পুরা রাস্তাই মানুষে সয়লাব।

মা বলেন, জায়েদও গিয়েছিল মিছিলে। বাবারে, মিছিল করা কি তোদের কাজ? তোরা কি পলিটিক্স করে মিনিস্টার হবি! মজিবর মন্ত্রী হলে আমাদের কী, আর ভুট্টো হলেই আমাদের কী!

কী বলো। ভুট্টো কেমনে মন্ত্রী হয়! শেখ মুজিব মেজরিটি পেয়েছে না! আর এইবারের সংগ্রাম তো কে মিনিস্টরা হবে, তার জন্য না, এবার পাকিস্তানের সাথে বাঙালির ফাইট। এটাতে মা আমাদের অনেক কিছু যায়-আসে।

'দ্যাখ বাবা। তুই লেখাপড়া শিখেছিস। এখন তো তুই আমার চেয়ে বেশিই বুঝবি। কিন্তু তুই কোনো বিপদ-আপদের মাঝে যাবি না। আহারে কত মায়ের ছেলে মারা গেছে জয় বাংলা জয় বাংলা করে। খারাপ লাগে না! আমি তো আমাকে দিয়ে বুঝি। তোর কিছু হলে, আলাহ না করুক, আমি সইতে পারব না। শোন, দেশের যা পরিস্থিতি। কখন কী হয়ে যায়। আমি তোকে এমএ পাস করিয়েছি। এখন আমি আমার শেষ কাজটা করে যেতে চাই।'

'কী কাজ?' মুখে ভাত থাকতেই গেলাস তুলে পানি মুখে দিয়ে তারপর আজাদ বলে।

'তোর জন্যে আমি পাত্রী দেখছি।'

'তুমি তো মা পাগল আছ। আগে আমার ব্যবসাটা আরেকটু সেট্‌ল করুক। হরতাল হরতাল করে তো ব্যবসার দিকে নজরই দিতে পারলাম না।'

'ব্যবসা হবে। নবী করিম সালালাহু আলাইহিসালাম বলে গেছেন, বিয়ে করলে ভাগ্য খোলে।' মা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। হয়তো তাঁর নিজের জীবনের কথা মনে পড়ে যায়। সবাই বলে, ইউনুস চৌধুরীর সৌভাগ্যের পেছনে ছিল সাফিয়া বেগমের অবদান।

'জুরাইনের বড় হুজুরও বলে দিয়েছেন তোকে বিয়ে দিতে।' মা আরেক চামচ তরকারি আজাদের পাতে তুলে দিতে দিতে বলেন।

'হুজুররে কও আরেকটা বিয়া করতে। তার কপাল খুলুক।'

'তওবা, তওবা, এটা তুই কী বললি?'

'না, আমি ঠিক তোমাকে হার্ট করার জন্য বলি নাই। কথার পিঠে বললাম আর কী! এই যে তওবা পড়লাম, তওবা, তওবা...

২৭

আজাদ কই যাস? মা জিজ্ঞেস করেন।

এই তো, ইস্কাটনে।

ইস্কাটনে? মার বুক কেঁপে ওঠে। ইস্কাটনে কই যায় আজাদ? তার বাবার বাসায় নাকি!

'আবুল খায়েরের বাসায়। ক্রিকেট খেলতে।'

মা আশ্বস্ত হনা। দেশের অবস্থা খুবই খারাপ। ইয়াহিয়া খান যে কী করছে, সেই জানে। শেখ মুজিব ভোটে জিতেছে, তাকে তুমি গদি ছেড়ে দাও। সে দেশ চালাক। তা না। ইয়াহিয়া চলছে ভুট্টোর কথামতো। শেখ সাহেব কি সেটা মেনে নেবার মতো মানুষ! নাকি বাঙালিরা তাকে তা মানতে দেবে। অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে শেখ সাহেব। সব কিছু তার কথামতো চলছে। যদি মুজিবর বলে, বিকালবেলা অফিস বসবে, তো বিকালবেলাই বসছে। হরতাল হচ্ছে। কিন্তু ইয়াহিয়া কারফিউ দিলে সেটা কেউ মানছে না। রাতের বেলা মিছিল বের হচ্ছে। মিছিলে গুলি চলছে। কতজন যে গুলিতে মারা গেল, ইয়ত্তা নাই। মার বুকের মধ্যে হাহাকার করে ওঠে। কত মা আজ ছেলে ছেলে বলে কাঁদছে। মা বেঁচে থাকতে ছেলের মৃত্যু, এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কী আছে মায়ের কাছে? আহা, আমার ছেলেটাকে সহি সালামতে রেখো মাবুদ। অজানা আশঙ্কায় তাঁর বুকের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

আজাদ বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ে নিউ ইস্কাটন রোডে আবুল খায়েরের বাসার উদ্দেশে। আবুল খায়ের দারুণ ক্রিকেটার। আজাদ বয়েস ক্লাবের হয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে খেলে নিয়মিত। তাদের বাসার ছাদটাও যেন একটা ছোটখাট ক্রিকেট মাঠ। ওখানে বেশ ক্রিকেট প্রাকটিস করা চলে। ক্রিকেটের পাশাপাশি চলে আড্ডা। এ ছাড়া আর তাদের কীইবা করার আছে। কলেজ, ইউনিভার্সিটি বন্ধ। অফিস-আদালত বন্ধ। রাস্তায় যানবাহন নাই। শুধু আছে মিছিল আর মিটিং। কত সভাই না হচ্ছে। আওয়ামী লীগের, ছাত্র লীগের, ন্যাপের, ছাত্র ইউনিয়নের দু গ্রপের, কমিউনিস্টদের, লেখক-শিল্পীদের, মিটিঙের কোনো শুমার নাই। ধারাবাহিক মিটিং প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। প্রত্যেকটাতে লোকসমাগম হচ্ছে প্রচুর। ইতিমধ্যে স্বাধীন বাংলা দেশের পতাকার নকশা করা হয়ে গেছে, বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে ছাত্রনেতারা সে পতাকা উত্তোলন করেছে আনুষ্ঠানিকভাবে, পতাকা ওড়ানো হচ্ছে চারদিকে, বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি-কে বেছে নেওয়া হয়েছে। বামদলগুলো আহ্বান জানাচ্ছে স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য । তারা জনযুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে লিফলেট ছড়াচ্ছে। ছাত্ররাও শেখ মুজিবকে চাপ দিচ্ছে স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য।

সব ঠিক আছে। কিন্তু আজাদরা কী করবে! তারা তো আর কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নয়। কোনো মিটিং মিছিল তাদের জন্য বসে নাই। তারা তাই ক্রিকেট খেলে আর আড্ডা দেয়। মগবাজারের বাসা থেকে নিউ ইস্কাটন, সামান্যই পথ। হেঁটে যাওয়া চলে। রাস্তাঘাট ফাঁকা। শুধু বস্তির পিচ্চিদের একটা মিছিল দেখা যাচ্ছে। তাদের স্লোগানও খুব মজার। ইয়াহিয়ার দুই গালে, জুতা মারো তালে তালে। দুই হাতে ছেঁড়া জুতা পরে নিয়ে তারা ডাম্বেলের মতো বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে।

আবুল খায়েরদের বাসার ছাদে গিয়ে দেখা যায়, অনেকেই এসেছে। ইব্রাহিম সাবের খোঁড়াচ্ছে। খেলতে গিয়ে সে চোট পেয়েছে। জুয়েল পরে এসেছে একটা নীল রঙের টিশার্ট। চোখে একটা সানগ্লাস। তাকে দেখাচ্ছে একেবারে ইংরেজি ছবির নায়কের মতো। সৈয়দ আশরাফুল হকের বাসাও কাছেই। সেও এসে গেছে। আশরাফুলও দারুণ ক্রিকেট খেলে। হাবিব আলম আসে খানিকক্ষণ পরে। তার বাসা দিলু রোডে। সবাই কাছাকাছিই থাকে। শুধু জুয়েলের বাসা হাটখোলা।

আজাদ জিজ্ঞেস করে, জুয়েল কেমন করে আসলি?

জুয়েল বলে, কেমন কইরা আসলাম মানে!

আজাদ বলে, হরতাল না! গাড়িঘোড়া কিছু আছে নাকি!

'পালকি চইড়া আসলাম। ইয়াহিয়া খানের মাইয়ার লগে আমার বিয়ার কথা চলতেছে না। পালকি কইরা নিয়া আইল।'

আজাদ বলে, আরে আমি জিগাই হেঁটে আসলি নাকি!

জুয়েল বলে, না ক্রলিং কইরা আসলাম। যুদ্ধ শুরু হইলে ক্রলিং করতে হইব তো। তাই হাটখোলা থাইকা ৪ মাইল রাস্তা ক্রলিং কইরা আসলাম।

আজাদ বলে, আরে জুয়েল খালি পেঁচায়।

কাজী কামাল আসে। লম্বা একটা ছেলে। বাস্কেট বল খেলোয়াড়দের লম্বা হতে হয়। আজাদ ভাবে- অথচ ছোটবেলায় কামাল আর আমি একই সমান ছিলাম।

আবুল খায়ের বলে, জুয়েল তো জোকসের হাঁড়ি। উইকেট কিপিং করতে করতে জুয়েল এমন সব জোকস বলে, ব্যাটসম্যান হাসতে হাসতে আউট হইয়া যায়।

কামাল বলে, তাই নাকি! একটা ছাড় না জুয়েল।

আবুল খায়ের বলে, সুপারিরটা ক, জুয়েল সুপারিরটা ক।

জুয়েল গা মোচড়ায়। আরে এক জোক কয়বার কমু। ইয়াহিয়া, আইয়ুব, ভুট্টো-তিনজন গেছে পরকালে। ওইখানে প্রত্যেকরে কওয়া হইছে একটা কইরা ফল আনতে। আইয়ুব খান নিয়া গেছে একটা সুপারি। তার পিছন দিয়া সুপারি দিছে ঢুকাইয়া। তারপর আসছে ইয়াহিয়া। সে নিয়া গেছে কদবেল। তখন হেরা কয় বলে এত বড় ফল আনছ। সর্বনাশ করছ। এইটা তোমার পিছন দিয়া ঢুকাইতে হইব। শুইনা ইয়াহিয়া হাসে। আরে ব্যাক্কল হাসিস কেন? ইয়াহিয়া কয়, আমি তো কদবেল আনছি। এরপর ভুট্টো আসতেছে। সে আনছে নারকেল।

জুয়েলের কৌতুক শুনে সবাই হাসে। নির্দোষ হাসি, তা বলা যাবে না। ইয়াহিয়া আর ভুট্টোর শরীরের সঙ্গে বাংলার বাঁশগুলোর কোনো একটা সম্পর্ক স্থাপন করার বাসনায় প্রত্যেকের মন দোষযুক্ত হয়ে আছে।

আশরাফুল ব্যাট নিয়ে নেমে গেছে ছাদের ওপরেই। খায়ের বল করছে। খায়ের আশরাফুলকে সাবধান করে দেয়, বল ছাদ থেকে পড়ে গেলে কিন্তু আউট। খালি আউট না, ৬ রান মাইনাস। আর রেলিং-এ লাগলে ৪।

কিছুক্ষণ ক্রিকেট খেলা চলে। তারপর আবার সবাই বসে রেলিং-এর ওপরে। আবার জমে ওঠে আড্ডা। দেশের কী হবে? ইয়াহিয়া আসলে কী চায়? ইন্টার কন্টিনেন্টালে আলোচনার নামে কী হচ্ছে! শেখ মুজিব কি ভুল করছেন! ছাত্রনেতারা, চার খলিফা কেন তাহলে চাপ দিয়ে স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করাচ্ছেন না।

রুমী আসে। সে বলে, এভাবে হবে না। লড়াই করে স্বাধীনতা আনতে হবে। একদিকে আলোচনার নামে প্রহসন চলছে, আরেকদিকে প্লেনে করে মিলিটারি আনছে। আমার কিছু ভালো লাগছে না। ঘটনা খুব খারাপ দিকে মোড় নিচ্ছে। মাও সে তুং-এর লাইন নিতে হবে। গণযুদ্ধের রণনীতি বইয়ে আছে না...

জুয়েল বলে, আইসা পড়ছে আমাদের তাত্ত্বিক। শোনো, এক মাইয়া। আমগো গাঁয়ের মাইয়া। তার সাথে বিয়া হইছে এক প্রফেসরের। মহাপণ্ডিত। বাসর রাতে প্রফেসর সাব খালি লেকচার দেয়। কয়, ফ্রয়েড বলেছেন... এইভাবে একরাত যায়, দুই রাত যায়, ফ্রয়েড আর শেষ হয় না। মাইয়া কয়, আপনের যন্ত্রপাতি সব ঠিক আছে তো...তাইলে লেকচার দেন ক্যান?

প্রফেসর কয়, অহনও পূর্বরাগ চ্যাপ্টারই শেষ হয় নাই। তারপর আইব ফোরপে... তারপর...আস্তে ধীরে আরো ২০০ পৃষ্ঠা পরে না একশন... তা প্রফেসর সাহেব যখন ২০০ পৃষ্ঠা পড়ানো শেষ করলেন, মাইয়া তখন ৮ মাসের প্রেগন্যান্ট... প্রফেসর সাব কয় কেমনে হইল...আমি তো তোমারে টাচই করলাম না, মাইয়া কয় আপনে যে পড়াইছেন, এতেই হইয়া গেছে...প্রফেসর কয় হইতে পারে আমারই উচিত ছিল প্রিকশন লওয়া... ফ্যামিলি প্লানিং চ্যাপ্টার আগে না পড়ানোয় এই ভুলটা হইয়া গেছে...কী বুঝলা, থিয়োরি কপচাইবা না...

রুমী বলে, আমিও তো তাই বলি। এখন আলোচনার সময় না, এখন চাই ডাইরেক্ট একশন...

এর মধ্যে এসে পড়েছে ফারুক। সে বলে, তোমরা লেফটিস্টরা যখন নানা রকমের থিয়োরি দিচ্ছ, বাংলার মানুষ কিন্তু তখন মুক্তির লাইনে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, কম তো শুনলাম না, ভোটের আগে ভাত চাই, এখন শুনছি, এই লড়াই হলো দুই কুকুরের লড়াই, আসল কাজ হলো শ্রেণীশত্রু খতম করা, মানুষ এসবকে পাত্তা দেয় নাই, ছয়দফার পেছনে বঙ্গবন্ধুর পেছনে একযোগে দাঁড়িয়ে পড়েছে, এখন সামনে আর কোনো উপায় নাই, দেশ স্বাধীন হবেই, চারদিকে তো শুধু স্বাধীন বাংলার পতাকা...

একজন বলে, আরে ভোটের আগে ভাত চাই এটা ভাসানী বলেছেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেই, যাতে বাঙালি ভোট ভাগ না হয় সেজন্য তিনি সরে গেছেন, আসলে বঙ্গবন্ধু আর ভাসানীর সম্পর্ক তো গুরুশিষ্য, না হলে ধরো পিতাপুত্রের...

আচ্ছা, এত যে যুদ্ধ যুদ্ধ করতেছো, যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কে কে যুদ্ধে যাবা? একজন প্রশ্ন তোলে।

হাবিব আলম বলে, আমি যাব।

কাজী কামাল বলে, আমিও যাব।

জুয়েল বলে, আমি সবার আগে থাকব।

রুমী বলে, আমাকে তো যেতেই হবে। উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই...

'আজাদ, তুই কী করবি?'

আজাদ বলে, আমি মাকে গিয়ে বলব, মা, আমি যুদ্ধে যাব। তুমি না করো না। মা যদি অনুমতি দেন, অবশ্যই যাব। না দিলে কী করব, সেইটা বলতে পারি না। তোরা তো জানিসই আমার মা বেঁচে আছে শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে...

আজাদ এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পুরোটা আড্ডা নীরব হয়ে যায়, কারণ সবাই জানে আজাদের ব্যাপারটা, সবাই জানে এই ইস্কাটনের কোন্ বড়লোক বাড়ির ছেলে আজাদ, শুধু মায়ের সম্মান রক্ষার জন্যে মায়ের সঙ্গে মগবাজারের বাসায় একা পড়ে আছে।

২৮

আজাদ নিজেকে সবসময়েই ননপলিটিক্যাল বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করত। তবে ২৫ মার্চ রাতে সে মগবাজারে পিকেটিং করছিল, ব্যারিকেড দিচ্ছিল রাস্তায়, এ কথা কাজী কামালের মনে আছে। স্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায় জায়েদেরও। জায়েদ বলে, ২৫ মার্চ রাতে মগবাজারে আজাদের সঙ্গে আশরাফসহ মগবাজার ইস্কাটন এলাকার বন্ধুরাও ছিল। হাবিব আলমের মনে আছে, সেও ছিল মগবাজারের মোড়েই। তার সঙ্গে ছিল শেখ কামাল। মেলা রাত পর্যন্ত। আর ছিল জনতা। ছাত্র, যুবক, শ্রমিক। সবার হাতে বাঁশের লাঠি। রড। পোনে বারোটার দিকে শেখ কামাল চলে যায়।

আজাদের এ-রাতে পিকেটিং করতে যাবার পেছনে একটা প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত ক্ষোভ আছে। আজাদ আর জায়েদ সম্প্রতি দিনের বেলা গিয়েছিল ফরাশগঞ্জে। ওখানে আজাদের বাবার এক কর্মচারীর কাছ থেকে আজাদ মাসোহারার টাকা নিয়মিতভাবে তুলে থাকে। অসহযোগের ভেতরে তার ব্যবসা-বাণিজ্য খারাপ যাওয়ায় একদিন হরতালের বিরতিতে আজাদ জায়েদকে নিয়ে গিয়েছিল ফরাশগঞ্জে, মাসোহারার টাকা তুলতে। কর্মচারীটি টাকা দিতে আপত্তি জানিয়েছিল। ওজর দেখিয়েছিল, ব্যাঙ্ক বন্ধ, হাতে টাকা নাই। জায়েদ হারামজাদা বলে চেয়ার তুলে ছুড়ে মেরেছিল কর্মচারীটার মাথা বরাবর। তাতে কাজ হয়েছিল। কর্মচারী বাপ বাপ বলে টাকা তুলে দিয়েছিল আজাদের হাতে। দুজন টাকা নিয়ে বেবি ট্যাক্সিতে ফিরছিল। পথে একটা জায়গায় ব্যারিকেড । তারা ব্যারিকেডের ওখানে নেমে রাস্তা পার হবে হেঁটে, ঠিক করেছিল। ঠিক এইসময় কতগুলো পাঞ্জাবি মিলিটারি তাদের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে তেড়ে এসেছিল। বলেছিল, ব্যারিকেড নিকাল দো। তারা তাদের রাইফেলের বাট দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে বাধ্য করেছিল রাস্তার ব্যারিকেড অপসারণের কাজ করতে। কাজটা করতে আজাদের মোটেও ভালো লাগছিল না। আর হারামজাদা ধরনের গালি, সঙ্গে রাইফেলের বাটের মৃদু প্রহার মোটেও সম্মানজনক বলে তার কাছে মনে হচ্ছিল না। সে দাঁতে দাঁত ঘষে পণ করেছিল, সুযোগ পেলেই এ বেটা পাঞ্জাবিদের ছ্যাঁচা দিতে হবে।

মা বসে আছেন ভাত নিয়ে। এশার নামাজ পড়া হয়ে গেছে। তেলাওয়াত করেন প্রতিটা ওয়াক্তের নামাজের শেষে, জায়নামাজে বসে, আজ তাও সমাপ্ত। রাত বাড়ছে। আজাদ কেন এখনও ফেরে না। জায়েদ ফিরে এসেছে। সে উত্তেজিত।

আম্মা, একটা পানির ট্যাঙ্ক দিয়া ব্যারিকেড দিছে। মগবাজারের মোড়ে। হেভি হইছে। অহন ইটা ফেলতাছে। দাদারা স'মিল থাইকা গাছের গুঁড়ি আনতে গেছে। গাছের গুঁড়ি ফেললে ব্যারিকেডটা সলিড হইব।

মার কেমন যেন ভয় ভয় লাগে। কখন কী হয়? যদি মিলিটারি গুলি করে!

রাত বাড়তে থাকলে রাস্তায় ভারি যানবাহন চলাচলের শব্দ শোনা যায়। জায়েদ বাইরে থেকে খোঁজ নিয়ে এসে বলে, ট্যাংক নামায়া দিছে। বুল ডোজার নামাইছে।

গুলির শব্দ। গোলার শব্দ। জানালায় দাঁড়ালে আকাশে দেখা যাচ্ছে, আলো-বোমা ছোড়া হচ্ছে আকাশে। সমস্ত আকাশ হঠাৎ হঠাৎ আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে সম্মিলিত মানুষের হৈহল্লা।

মা বাসার সবাইকে খাটের নিচে শুইয়ে দেন। কিন্তু নিজে বার বার ছুটে যান গেটের দিকে। আজাদ কেন ফেরে না। আজাদ কোথায় গেল? তার কিছু হয় নাই তো!

দরজায় ধাক্কার শব্দ। মা দৌড়ে গিয়ে দরজা খোলেন। আজাদ নয়, বাশার। মা বলেন, এসেছ বাবা।

বাশার বলে, বাইরের অবস্থা খারাপ।

'আজাদকে দেখেছ?'

বাশার উদ্বিগ্ন: আজাদ আসেনি? ঠিক আছে, আমি দেখি, ও কোথায়?

মা বলেন, না বাবা, তুমি যেও না। কোথায় খুঁজতে যাবে?

এই সময় আজাদ ফেরে। বলে, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আর্মি নেমেছে। মাইকে এনাউন্স করছে, যেখানেই ব্যারিকেড দেখবে, সেইখানেই গুলি চলবে। আশেপাশের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবে।

আরে তোকে এত কিছু দেখতে শুনতে কে বলেছে! তুই মাটিতে শুয়ে পড়।

বাড়ির সবাই মেঝেতে শুয়ে আছে। বোমার আওয়াজ, মেশিন গানের আওয়াজ, রাইফেলের গুলির আওয়াজ, মানুষের আর্তনাদ, ভেসে ভেসে আসছে।

আজাদ জানালার ধারে যায়। বাইরের আকাশে ট্রেসার হাউই উড়ছে মাঝেমধ্যে, আকাশ আলোকিত করে, আর চারদিকে আগুনের লেলিহান শিখা। মা বকতে থাকেন, আজাদ, জানালার ধারে যাস কেন, এদিকে আয়। এদিকে আয়। লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা পড়। হে আল্লাহ্ জালিমের জুলুম থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করো।

২৯

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে, এই ঢাকা শহরে, পাকিস্তানী জান্তা তার সামরিক বাহিনীকে ট্যাংক, কামান, মর্টারসহ নিরস্ত্র বাঙালি, ছাত্রাবাস, বস্তি, বাজারের ওপর লেলিয়ে দিয়ে যে গণহত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটাও পাওয়া যাবে কিনা, সন্দেহ আছে। শুধু ২৫ মার্চ রাতের ধ্বংসযজ্ঞ, নৃশংসতা, চারদিকে আগুনের লেলিহান শিখা, কামান লাগিয়ে উড়িয়ে দেওয়া ছাত্রাবাস, ছাত্রাবাস থেকে বের করে এনে কাতারবন্দি করে দাঁড় করিয়ে ছাত্রদের ব্রাশ ফায়ার মেরে ফেলা, যেন তারা পিঁপড়ার সারি, আর তুমি এরোসল স্প্রে করে মারলে শত শত পিঁপড়াকে, গণকবর খুঁড়ে মাটি চাপা দেওয়া সেই সব লাশ, এখনও মারা যায়নি কোনো গুলিবিদ্ধ ছাত্রের মাটিচাপা পড়ে তলিয়ে যাওয়ার আগে মা বলে কেঁদে ওঠা শেষ চিৎকার, শিক্ষক-আবাসে ঢুকে নাম ধরে ডেকে ডেকে হত্যা করা শিক্ষকদের, তার শিশু সন্তানের সামনে, তার স্ত্রীর সামনে, কামানের তোপ দাগিয়ে

উড়িয়ে দেওয়া পুড়িয়ে ভস্মীভূত করা সংবাদপত্র অফিস আর খুন করে ফেলা সাংবাদিকদের, আর আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া জনবসতি, ভেতরে পুড়ে যাচ্ছে মা আর তার স্তনবৃন্তে মুখ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়া শিশু, ভেতরে পুড়ে যাচ্ছে বৃদ্ধ তার মুখ থেকে এখনও শেষ হয়নি বিপদ তাড়ানিয়া আজানের আলাহু আকবর ধ্বনি, মাংস পোড়া গন্ধে ভারি হয়ে উঠছে বাতাস, আর সে-মাংস মানুষের, আর ভীত-সন্ত্রস্ত পলায়নপর মানুষদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা, পুলিশ ব্যারাকে আগুন লাগিয়ে জীবন্ত দগ্ধ করে মারা বাঙালি পুলিশদের, ইপিআর ব্যারাকে হামলা চালিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে গুলি করে মারা বাঙালি ইপিআর সদস্যদের, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল ঘেরাও করে ভেতরে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের নির্বিচারে পাখি মারার মতো করে হত্যা করা, লাশে আর রক্তে ভেসে যাচ্ছে বুড়িগঙ্গা, যেন হঠাৎ মাছের মড়ক লাগায় নদীতল ছেয়ে গেছে মরা মাছে, না, কোথায় পানি দেখা যাচ্ছে না, লাশ আর লাশ, আর সেসব মাছ নয়, মানুষ, ঢাকার সবগুলো পুলিশ স্টেশনে টেবিলের ওপরে উপুড় হয়ে আছে বাঙালি ডিউটি অফিসারের গুলি খাওয়া মৃতদেহ, দমকল বাহিনীর অফিসে ইউনিফরম পরা দমকলকর্মীরা শুয়ে আছে, বসে আছে, গুলিবিদ্ধ হয়ে দেয়ালে আটকে আছে লাশ হয়ে, ঢাকার সবগুলো বাজারে আগুন দেওয়া, পাতার পর শুধু এই পৈশাচিকতার, এই আগুনের, লাশের, হত্যার, আর্তনাদের আর মানুষ মারার আনন্দে উলাসে ফেটে পড়া সৈনিকের অট্টহাসির আর মদের গেলাস নিয়ে মাতাল কণ্ঠে সাবাস সাবাস আরো খুন আরো আগুন আরো রেইপ বলে জেনারেলদের চিৎকারে ফেটে পড়ার বর্ণনা লেখা যাবে, শত পৃষ্ঠা, সহস্র পৃষ্ঠা, নিযুত পৃষ্ঠা, তবু বর্ণনা শেষ হবে না, তবু ওই বাস্তবতার প্রকৃত চিত্র আর ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে না। কেই বা সব দেখেছে একবারে, যে দেখেছে রাজারবাগে হামলা, তার কাছে ওই তো নরক, যে দেখেছে ইপিআরে হামলা, একজীবনে সে আর কোনোদিনও স্বাভাবিক হতে পারবে না, যে অধ্যাপক ভিডিও করেছেন জগন্নাথ হলের মাঠে সারিবদ্ধ ছাত্রদের গুলি করে মেরে ফেলার দৃশ্য, তিনিও তো ঘটনার সামান্য অংশই চিত্রায়িত করতে পেরেছেন মাত্র, যে সায়মন ড্রিংক বিদেশী সাংবাদিকদের বহিষ্কার এড়িয়ে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের রান্নাঘর দিয়ে পালিয়ে গিয়ে লন্ডনের দি ডেইলি টেলিগ্রাফে পাঠিয়েছিলেন জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ, সাম উইটনেস একাউন্টস, 'হাউ ড্যাক্কা পেইড ফর ইউনাইটেড পাকিস্তান', তিনি নরকের বর্ণনার সামান্যই দিতে পেরেছিলেন।

৩০

২৫ মার্চ রাতে সারাটা শহরে পাকিস্তান আর্মি কোন জাহান্নাম প্রতিষ্ঠা করেছে, তার বর্ণনা আস্তে আস্তে ঢাকাবাসী জানতে, বুঝতে, উপলব্ধি করতে শুরু করে। কারফিউ উঠিয়ে নেবার পরে যারা রাস্তায় বেরোয়, তারা দেখতে পায় শুধু লাশ আর লাশ। রাজারবাগের আশেপাশে যাদের বাসা ছিল, তারা ওই রাতে প্রত্যক্ষ করেছে, সারারাত গুলির মধ্যে কোনো রকমে মাথা বাঁচিয়ে উপলব্ধি করেছে পাকিস্তানী সৈন্যদের নৃশংসতা। কামান মর্টার দিয়ে গোলা তো ছোড়া হয়েইছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইনে, চারদিক থেকে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের ক্যাম্পে। পানির ট্যাঙ্কে যে বাঙালি পুলিশ পজিশন নিয়েছিল, তারা মারা গেছে ফুটন্ত পানিতে সেদ্ধ হয়ে। আলতাফ মাহমুদের বাসা ছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইনের খুব কাছে। তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন সেই দোযখের খানিকটা। ভোর হতে না হতে প্রতিরোধকারী বাঙালি পুলিশরা আর টিকতে না পেরে একজন দুজন করে পালিয়ে যাচ্ছিল এদিক ওদিক। তাদেরই দুজন আসে আলতাফ মাহমুদের বাসায়। তারা তাদের পোশাক খুলে সাধারণ লুঙ্গি শার্ট ধার নিয়ে পরে অস্ত্র রেখে পালিয়ে যায়। এ রকম পলায়নপর বাঙালি পুলিশদের আশ্রয় দিয়েছিল,

পোশাক দিয়েছিল আশেপাশের অনেক বাঙালি পরিবার। নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর মনে আছে, ২৫ মার্চ রাতে রাস্তায় গাছ কেটে, সুয়ারেজ পাইপ ফেলে তারা ব্যারিকেড দিচ্ছিল। ১১টা সাড়ে ১১ টার দিকে ট্যাংক, আরমাড কার নিয়ে আর্মি রাস্তায় নেমে আসে গুলি গুলি করতে করতে। রাতের বেলা জোনাকি সিনেমা হলের কাছে হাসানের বাসায় আশ্রয় নেয় সে, সারারাত রাজারবাগে পুলিশের সঙ্গে পাকিস্তানী আর্মির যুদ্ধ হয়, ভোরবেলা বাচ্চু বেবির বাসা হয়ে পল্টন লাইনের নিজের বাসায় ফিরছে গলিপথে, দেখতে পায় বাঙালি পুলিশরা পালিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চুদের কাছেও তারা অস্ত্র রেখে যায়। তখনও ধোঁয়া উড়ছে শান্তিনগরে, রাজারবাগে, জোনাকির সামনে রাস্তায় লাশ পড়ে আছে।

২৬ মার্চ ১৯৭১। বাইরে কারফিউ। আজাদ আর বাশার বাসায় বসে আছে। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। মার কঠোর নিষেধ, বাইরে যাবার চেষ্টা করা যাবে না। জায়েদ উসখুস করছে, তার মতলব একবার গলির মুখে গিয়ে দেখে ঘটনা কী? মাঝেমধ্যে ট্যাট্যা করে গুলির শব্দ ভেসে আসছে। ছাদে গিয়ে তাকালে এদিকে-ওদিকে ধোঁয়া দেখতে পাওয়া যায়। আবার গোলাগুলির শব্দ। খুব কাছে থেকে আসছে শব্দ। মনে হয় শেল এসে পড়ছে এই বাসারই ওপরে। আজাদের মা দৌড়ে আসেন। আজাদ কোথায়? আয়। আয়। শুয়ে পড়। জায়েদ কোথায়? এই তুই আবার উঠে পড়ছিস কেন? শো বলছি।

একটু পরে আবার শব্দ থেমে যায়। আজাদ রেডিও অন করে। রেডিও পাকিস্তান থেকে একটা অপরিচিত কণ্ঠ ভেসে আসছে। কোনো অবাঙালি হবে হয়তো। না ইংরাজি, না উর্দু, না বাংলা, এক অদ্ভুত ভাষায় সে ঘোষণা পাঠ করে চলেছে। সবই সামরিক বিধি। টিক্কা খানের সামরিক বিধি বমন করে চলেছে রেডিওটা। কী করা যাবে, কী করা যাবে না, এলার্ন হচ্ছে। আর বলা হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। আজাদ রেডিওর নব ঘোরাতে থাকে। আকাশবাণী শোনা যায়। এদের খবরটা শুনলে হয়। আকাশবাণীর ইংরাজি খবরে বলা হয়ঃ ওয়েস্ট পাকিস্তান হ্যাজ এটাক্‌ড ইস্ট পাকিস্তান।

আবার গুলির শব্দ। সবাই চুপ করে আছে।

কিন্তু এরই মধ্যে হঠাৎ তাদের বাসার দরজায় কে যেন ধাক্কা দেয়। কে? এই ঘোর দুর্যোগের মধ্যে কে?

বাসার সবার নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাবে, এমন নিস্তব্ধতা।

আবার কড়া নাড়ার শব্দ।

আজাদ বলে, কে? কিন্তু তার গলা থেকে শব্দ ঠিকমতো বেরুচ্ছে না। সে কেশে গলা পরিষ্কার করে নেয়। কে? সে এবার স্পষ্ট গলায় বলে।

মা ছুটে আসেন। ফিসফিস করে বলেন, আজাদ তুই ওই ঘরে যা। আমি দেখছি। মা জানালার বদ্ধ কপাটের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন কে। বুঝতে পারেন না।

তারপর জানালাটা খুলে বারান্দায় তাকান। না কেউ না।

২৭ মার্চ। আজ সকালে কারফিউ নাই। দুপুর থেকে আবার শুরু হবে। আজাদ আর বাশার বের হয়। রেললাইনের পথ ধরে ছুটে চলেছে হাজার হাজার মানুষ। নারী-পুরুষ, শিশু, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। প্রত্যেকের হাতে সাধ্যমতো ব্যাগ, সুটকেস, পোটলা। কারো কোলে বাচ্চা। সবার চোখেমুখে ভয়। সবাই যেন এই মৃত্যুপুরী ছেড়ে পালিয়ে কোনো রকমে পেতে চাইছে একটুখানি জীবনের শরণ। একটা ছোট্ট ছেলে মাথায় একটা বড় ট্রাঙ্ক নিয়ে চলেছে। আজাদ আর বাশার কেউ কোনো কথা বলে না। তারা আরেকটু এগিয়ে যায়। আউটার সার্কুলার রোডে হোটেল দ্য প্যালেসের সামনে দেখতে পায় পড়ে আছে একটা লাশ। আজাদ চমকে ওঠে। কিন্তু এটা কিছুই নয়। আরো অনেক লাশ তাদের দেখতে হবে। তারা রাজারবাগের দিকে এগোয়। পথে পথে ছড়িয়ে আছে লাশ। গুলিবিদ্ধ শরীর থেকে বেরুনো রক্ত শুকিয়ে

পড়ে আছে রাস্তায়। পুলিশ ব্যারাক থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে। কুকুরে টানাটানি করছে লাশ নিয়ে। কত যে লাশ পড়ে আছে ইতস্তত, ইয়ত্তা নাই।

আজাদ আর বাশার এতক্ষণ কেউ কোনো কথা বলে নাই।

হঠাৎ বাশার রাস্তার ধারে বসে পড়ে।

আজাদ জিজ্ঞেস করে, কী হলো?

বাশার একবার ওয়াক করে ওঠে।

'খারাপ লাগছে?'

'হুঁ।'

আজাদ দেখতে পায়, বাশারের পুরোটা কপাল ঘামছে। বোধ হয় তার পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠছে। বমি করবে নাকি সে? কিন্তু সকালে তারা নাশতা করে বের হয় নাই। দুজনেরই পেট খালি। বমি হবে না। শুধু পিত্ত উগড়ে উঠবে। কষ্ট হবে।

আজাদ একটা কাগজ কুড়িয়ে এনে বাশারের মাথায় বাতাস করে। সঙ্গীর বিবমিষা দেখে তারও বমি পাচ্ছে।

বাশারের চোখেমুখে একটু পানি ছিটাতে পারলে হয়তো ওর ভালো লাগত। ওই যে দূরে রাস্তার ধারে একটা পানির কল দেখা যাচ্ছে। আজাদ বলে, দাঁড়াও, তোমার জন্যে একটু পানি নিয়ে আসি। চোখেমুখে দিবি।

পানির কলের কাছে সে যায় বটে, কিন্তু পানি সে নেবে কী করে? আঁজলা ভরে পানি নিলেও বাশারের কাছে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাবে না। সে পকেট থেকে রুমাল বের করে। ভিজিয়ে নেয় রুমালটা। তারপর বাশারের কাছে এসে ভেজা রুমাল দিয়ে বাশারের চোখ-মুখ-কান-ঘাড় মুছে দেয়। বাশারের খানিকটা আরাম লাগে। সে বলে, এখন ঠিক আছি। চলো বাসায় ফিরে যাই।

তারা বাসায় ফিরে আসে। মা চিল্লাচিলি শুরু করে দিয়েছেন, এই তোরা কই গিয়েছিলি? বলে যাবি না? নাশতা না করে কেউ বাইরে যায়।

দুপুরের আগে হঠাৎ তাদের বারান্দায় বুটের শব্দ। দরজায় নক। জায়েদ এগিয়ে গিয়েছিল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেঃ সর্বনাশ। দুইজন সৈন্য। মিলিটারি সদস্য। তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। সে প্রমাদ গোনে।

জায়েদ দৌড়ে ভিতরে আসে। আজাদ আর বাশার তখন রেডিওর নব ঘোরাচ্ছে। কোন রেডিও কী বলে, শোনা দরকার। আকাশবাণী, বিবিসি, ভয়েস অফ আমেরিকা, ঢাকা সবই সে একের পর এক শুনছে। জায়েদ গিয়ে হাজির সেখানে-দাদা দাদা। জায়েদের কণ্ঠে ফিসফিসানি।

কী হয়েছে?

দাদা, জায়েদ কথা থামিয়ে প্রথমে একটা শ্বাস নেয়, তারপরে বলে, বাসাত মিলিটারি আইছে।

মিলিটারি? আজাদ আর বাশার একই সঙ্গে বলে ওঠে। তাদের হতবিহ্বল দেখায়। তারা এখন কী করবে?

দরজা থেকে তখন শোনা যায়, আজাদ, আজাদ আছো নাকি?

বাঙালির গলা। আজাদ এগিয়ে যায় বারান্দার দরজায়। কে? সে কণ্ঠ উঁচিয়ে বলে।

'আমি সালেক। তোমার সেন্ট গ্রেগরির ফ্রেন্ড।'

আজাদ তাড়াতাড়ি দরজা খোলে। সালেক চৌধুরী তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ বাসাতেও সে একবার এসেছে। আর্মিতে আছে। আসো, আসো।

সালেক ভেতরে ঢোকে। সেনাবাহিনীর পোশাকে তাকে একটু অন্যরকম যে লাগছে না, তা নয়। তার সঙ্গে তার এক সহকর্মী হবে।

সালেক ঢুকেই বলে, দরজা বন্ধ করে দাও। ও আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন মাহমুদ। মাহমুদ, এই হলো আজাদ। তোমাকে তো এর কথা বলেইছি। আজাদ শোনো। ক্যান্টনমেন্টের অবস্থা খারাপ। আমরা পালিয়ে এসেছি। পালিয়ে চলে যাব। তুমি এক কাজ করো, আমাদের দুজনকে তোমার দুসেট কাপড় দাও। কারফিউ আরম্ভ হবার আগেই ঢাকা ছাড়তে হবে।

আজাদ বলে, বসো। দিচ্ছি।

মা এগিয়ে আসেন। সব শোনেন। তার চোখেমুখে উদ্বেগ। তিনি বলেন, বাবারা, তোমরা কিছু খেয়েছ?

সালেক বলে, খালাম্মা, খেতে হবে না। আগে ঢাকার বাইরে যেয়ে নেই।

মা বলেন, বাবা, আমি ভাত তুলে দিয়েছি। ভাত খেয়ে তারপর যেও।

সালেক বলে, সময় হবে না খালাম্মা।

জায়েদ তখন পাশের ঘরের দরজার সামনে দিয়ে বার বার হাঁটাচলা করছে, আর বোঝার চেষ্টা করছে, কারা এলো। পরে যখন বোঝে, এ-তো সালেক ভাই, তখন সে ঢোকে এ-ঘরে। টেবিলের ওপরে দুটো অস্ত্র রাখা। সেসবের দিকে তার অভিনিবেশ।

আজাদ তাদের দুজনকে প্যান্টশার্ট স্যান্ডেল দেয়। তারা কাপড় পাল্টে নেয়। অস্ত্র দুটো তারা নেয় একটা চটের বস্তায়। তারপর বলে, আজাদ উঠি রে।

আজাদ বলে, কোনদিকে যাবা?

সালেক বলে, জানি না। আলাহ ভরসা।

মা আসেন। বাবা, আর ৫টা মিনিট বসো। ভাত হয়ে এসেছে।

সালেক আর মাহমুদ ঘড়ি দেখে। না খালাম্মা। হাতে সময় আছে আর আধঘন্টা। এর মধ্যে সদরঘাট দিয়ে নদী পার হয়ে যেতে চাই।

'তাহলে বাবা একটু চিড়া ভিজে দিই। গুড় দিয়ে মেখে দিই। খেয়ে যাও।'

মা দৌড়ে চিড়া ভেজাতে যান। সালেক বলে, খালাম্মা। নাহ। থাকুক, দেরি হয়ে যাবে। আমরা যাই।

চিড়া ভেজানোই থাকে। সালেক আর মাহমুদ সিভিল ড্রেসে বেরিয়ে যায়। ঘরে পড়ে থাকে তাদের সামরিক পোশাক, বেল্ট, জুতা, টুপি।

মা সেগুলো একটা বস্তায় ভরে রান্নাঘরের পেছনে কাঠের স্তূপের আড়ালে রেখে আসেন।

জায়েদের চোখ পড়েছে বেল্ট দুটোর দিকে। এক ফাঁকে সে বেল্ট দুটো সরিয়ে নেবে, মনে মনে পরিকল্পনা আঁটে।

তবে এ পরিকল্পনা সে বাস্তবায়িত করতে পারে না। দুদিন পরেই কারফিউয়ের বিরতিতে আম্মার নির্দেশে পুরোটা বস্তা মাথায় করে নিয়ে সে ফেলে দিয়ে আসে এফডিসির পুকুরে।

৩১

আজাদ ধীরে ধীরে জানতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সারি বেঁধে হত্যা করা হয়েছে ছাত্রদের, বাসায় গিয়ে গুলি করে খুন করা হয়েছে শিক্ষকদের, ছাত্রী হলে গিয়ে নারকীয় নির্যাতন করা হয়েছে মেয়েদের। তার হাতের মুঠো শক্ত হয়ে আসে। ক্রোধের আগুনে শরীর হয়ে ওঠে তপ্ত। তবে রাজনীতির

সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকায় ঠিক কী করা উচিত সে বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু সে-সময়ই তার বন্ধুরা, পরবর্তীকালে যারা তার সহযোদ্ধা হবে, তাদের অনেকেই যুদ্ধের ময়দানের সন্ধানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। শহীদুলাহ খান বাদল, আশফাক সামাদ, বদিউল আলম, মাসুদ ওমর, ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের চার ছাত্র বেরিয়ে পড়ে যুদ্ধের সন্ধানে, তারা শুনতে পায় গাজিপুরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি-সৈন্যরা লড়াই করছে পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে, সেখান থেকে তারা পিছু হটে ময়মনসিংহে যাবে, এটাই স্বাভাবিক, সুতরাং বাদল আশফি ওমর বদি চার তরুণ কারফিউ তুলে নেবার কয়েক ঘণ্টার বিরতির মধ্যেই ঢাকা ছেড়ে ময়মনসিংহের পথে পা বাড়ায়। বাচ্চু, আসাদ এবং লক্ষাধিক ঢাকাবাসী ২৭ মার্চে কারফিউ তুলে নেবার ফাঁকে তাদের সংগৃহীত অস্ত্রসস্ত্রসহ বুড়িগঙ্গা পেরিয়ে আশ্রয় নেয় জিঞ্জিরায়। সেখানেই তারা প্রথম শুনতে পায় স্বাধীন বাংলা বিপবী বেতার কেন্দ্রের ঘোষণা, মেজর জিয়া, শমসের মবিন চৌধুরী, ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া আর আবদুল হান্নানের কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা, মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই এখনও মনে করতে পারে, মেজর জিয়ার কণ্ঠস্বর তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল খুবই, কারণ তারা আর্মি খুঁজছিল, বাঙালি আর্মি বিদ্রোহ করেছে শুনে তারা বুঝতে পেরেছিল যুদ্ধ সত্যই শুরু হয়ে গেছে। রেডিও-র এ-ঘোষণা ত্রিমোহনীতে শুনতে পায় শাহাদত চৌধুরী আর ফতে, যারা সেখানে গিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রের খোঁজে, রেডিওতে কান পেতে এ ঘোষণা শুনে যেন জেগে ওঠে ত্রিমোহিনী, উৎসব শুরু হয় সেখানে। ত্রিমোহিনীতে তারা দেখা পায় রাজারবাগে যুদ্ধ করা চারজন পুলিশের। তাদের সমস্ত অস্তিত্ব তখন প্রতিরোধ আর প্রতিশোধের জন্যে উন্মুখ। তারাও খুঁজছে যুদ্ধক্ষেত্র। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুই ট্রাক সৈন্য তারাবো পর্যন্ত এসে পড়লে সে খবর নিয়ে আসে ফতে চৌধুরী। তবে যুদ্ধ ২৫ মার্চ রাতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, রাজারবাগে পুলিশের প্রতিরোধে, পিলখানায় ইপিআরের নাছোড় সাহসিকতায়, আর নয়াবাজারের নাদির গুণ্ডার এলএমজির গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া পাকিস্তানী সৈন্যদের পিছু হটে যাওয়ার মধ্য দিয়ে, সারাদেশে বাঙালি সৈন্যদের বিদ্রোহ আর আত্মত্যাগ আর প্রতিরোধে।

২৫ মার্চ রাতে শুধু ঢাকায় নয়, সারাদেশে পাকিস্তানী মিলিটারি ব্যাপক গণহত্যা চালিয়ে তোপের মুখে চিরকালের জন্য স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে। শুধু ২৫ মার্চ রাতে নয়, ২ এপ্রিল জিঞ্জিরায় যে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, তাকে এখনও বাচ্চু, আসাদ বা যেকোনো প্রত্যক্ষদর্শীর দোযখ-দেখার দুঃসহ স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। প্রাণভয়ে ভীত আশ্রয়সন্ধানী প্রায় লাখখানেক ঢাকাবাসী আশ্রয় নিয়েছে বুড়িগঙ্গার ওপারে। তাদের কারো কারো কাছে দেশি অস্ত্র। একটা দুটো বন্দুক। পুলিশ কিংবা ইপিআরের ফেলে যাওয়া থ্রিনটথ্রি। ভোরবেলা হঠাৎ পাকিস্তানী আর্মি লঞ্চ আর স্টিমারযোগে চলে আসে নদীর এপারে, অতর্কিতে, বাচ্চুরা টের পেয়ে পেছাতে পেছাতে সৈয়দপুরে সরে আসে, আর পেছনে তাকিয়ে দেখতে পায় আকাশে হেলিকপ্টার জেট উড়ছে, আর হাজার হাজার মানুষ পালাচ্ছে দিকবিদিক, আর আর্মিরা কী একটা পাউডার নাকি পাইপ দিয়ে ফুয়েল ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, মানুষ পুড়ে যাচ্ছে আর ছুটে যাচ্ছে, ছুটন্ত মানুষ পুড়ছে, পুড়ন্ত মানুষ ছুটছে, ছুটন্ত মানুষ ফুটন্ত, জ্বলন্ত, হাজার হাজার ছুটন্ত অগ্নিকুণ্ড, আর চিৎকার, পুরোটা জনপদ পুড়ছে, আর গুলি, রিকোয়েললেস রাইফেল থেকে, আর হেলিকপটার জেট থেকে, ছুটন্ত মানুষ পড়ে যাচ্ছে, ধরাশায়ী হচ্ছে, হাজার হাজার মানুষ পড়ে গেল, মরে গেল, মরে গেল তো বেঁচে গেল, অন্তত ১০ হাজার মানুষ সেদিন মারা পড়েছে জিঞ্জিরায়, এই বিবরণ আজাদ জানতে পারবে, আর তার মনে হবে ট্রুম্যানের কথা, হ্যারি এস ট্রুম্যানের আত্মজীবনীর একটা বই তাকে পড়তে হয়েছে এমএ ক্লাসের জন্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্লাসে, ইয়ার অফ ডিসিশনস, হিরোশিমায় যখন বোমা ফেলা হয় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তখন বাইরে লাঞ্চ করছিলেন, বোমা ফেলার পরে তাকে জানানো হয় নিউক্লিয়ার

টেস্টের চেয়েও এবার ধ্বংস হয়েছে অনেক বেশি, ট্রুম্যান বলেছিলেন, ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জিনিস হলো এটা। চলো, বাড়ি যাই। এই বোমা ২০ হাজার টন টিএনটির সমান শক্তিশালী। ও ধিং মৎবধঃষু সড়াবফ... ও ংধরফ ঃড় ঃযব ংধরষড়ৎং ধৎড়ঁহফ সব, ঃযরং রং ঃযব মৎবধঃবংঃ ঃযরহম রহ ঃযব যরংঃড়ৎু. ওঃং ঃরসব ভড়ৎ ঁং ঃড় মবঃ যড়সব. (আজাদের নিজের হাতের ৩.৪.৭০ তারিখে স্বাক্ষর করা এই বইটা রয়ে গেছে জায়েদের সংগ্রহে)। জিঞ্জিরার দিকে পালাতে গিয়েই সংগীতজ্ঞ বারীণ মজুমদার আর ইলা মজুমদারের আঙুল থেকে এক সময় খুলে যায় তাদের বছর সাতেক বয়সী মেয়ে মধুমিতার হাতের মুঠো, তারা তাকে ডাকতেন মিতু বলে, তারপর মিতু মিতু বলে ইলা মজমুদার কত ডাকলেন, বারীণ মজুমদার কত ডাকলেন, তাদের ছোট ছেলে পার্থ কত ডাকল, মধু আর ফিরে এল না। যে যায় সে আর ফিরে আসে না, কিন্তু মায়েরা প্রতীক্ষায় থাকে, তাদের প্রতীক্ষা দেশ স্বাধীন হওয়ার ১৪ বছর পরেও ফুরায় না।

৩২

যুদ্ধের খোঁজে ঢাকার ছাত্ররা বেরিয়ে পড়ে অনেকেই, যেমন বাচ্চু পায়ে হেঁটে চলে যায় দাউদকান্দি হয়ে কুমিলা; সেখান থেকে শুনতে পায় যুদ্ধ হচ্ছে মিরেরসরাইয়ে, পায়ে হেঁটে চলে যায় চট্টগ্রাম, সেখান থেকে ফিরে আসে ঢাকায়, তারপর পেয়ে যায় ২ নম্বর সেক্টর থেকে পাঠানো বার্তা, খালেদ মোশাররফ গেরিলা অপারেশনের জন্য ঢাকার ছাত্রদের চান, গোপনে ঢাকা ত্যাগ করে সীমান্তের ওপারে মেলাঘর যেতে থাকে ছাত্ররা। জুনের প্রথম সপ্তাহে মেজর খালেদ মতিনগর থেকে মাইল দশেক দূরে মেলাঘরে একটু ঘন জঙ্গলের মধ্যে স্থাপন করেন এই নতুন ক্যাম্প। সেখানে যোগ দেয় মানিক, ওমর, মাহবুব, আসাদ। বাস্কেটবল খেলোয়াড় কাজী কামাল মতলবে মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার বাড়ি হয়ে পৌঁছে যায় মতিনগর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে, ৬/৭ জনের একটা দলের সদস্য হিসেবে। বদি, শহীদুল্লাহ খান বাদল, আশফাক সামাদ ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে। পৌঁছে যায় শাহাদত চৌধুরী, যুদ্ধদিনে যাকে ডাকা হবে শাচৌ বলে। শাচৌ মেজর খালেদ মোশাররফের প্রিয় তরুণে পরিণত হবেন, আর শহীদুল্লাহ খান বাদল কাজ করে যাবে সেক্টর টুর হেড কোয়ার্টার মতিনগরের গুরুত্বপূর্ণ এক স্টাফ হিসেবে, যতক্ষণ না তাকে যুদ্ধের শেষের দিকে এসে বাম সন্দেহে সরিয়ে নেওয়া হবে কলকাতায়।

প্রতিটা তরুণের নিজের ঘরদোর মা-বাবা ছেড়ে যুদ্ধে যাওয়ার আছে একেকটা স্মরণীয় গল্প। কাজী কামালের যাওয়ার কথা ফতেহ চৌধুরীর সঙ্গে। নির্দিষ্ট দিন নির্দিষ্ট সময়ে একটু দেরি করে ফতেহ চৌধুরীর বাসায় পৌঁছে কাজী কামাল। ফতেহ নয়, দেখা পায় তার ভাই শাহাদত চৌধুরীর। শাহাদত বলে, তুমি দেরি করে ফেলেছ। ওরা তো তোমার জন্যে ওয়েট করতে করতে শেষে চলে গেল। এখনও সদরঘাট যাও। দেখা পেতেও পারো। মতলবের লঞ্চে খুঁজো।

কাজী কামাল বেরিয়ে যায় ঝড়ের বেগে। সদরঘাটে গিয়ে ঠিকই ধরা পায় সে ফতেহদের। ফতেহ তাকে বলে, আসছ, ভালো করছ। কিন্তু প্রত্যেকের ১৭০ টাকা লাগবে পথের খরচ আর হাতখরচ হিসাবে। তোমার টাকা আনছ! কাজী কামালের মুখ শুকিয়ে যায়। সে তো টাকা আনে নাই। যুদ্ধে যেতে যে টাকা লাগে, তা সে জানবে কী করে! আমি আইতাছি বলে সে লঞ্চ থেকে নেমে যায়।

ফতেহ চিন্তায় পড়ে যায়। কাজী কি আবার টাকা যোগাড় করতে বাসায় ফিরে গেল নাকি? লঞ্চ যদি ছেড়ে দেয়? তাহলে তো তাদের কাজীকে ছেড়েই চলে যেতে হবে।

কাজী কামাল কিন্তু লঞ্চে ফিরে আসে মিনিট দশেকের মধ্যেই। তার হাতে তখন টাকা। সে টাকাটা ফতেহর হাতে তুলে দেয়। ফতে বিস্মিত। টাকা পেলে কই? কাজী কামাল তার বাঁ হাতের কব্জি দেখায়। সেখানে ঘড়ির বেল্ট পরার শাদা দাগটা রয়ে গেছে, কিন্তু ঘড়িটা নাই। বুঝলা না, ফুটপাতে নাইমা ঘড়িটা বেইচা দিয়া আইলাম। তার মুখে বিজয়ীর হাসি।

রুমী তার মা জাহানারা ইমামকে বলে, মা, আমি যুদ্ধে যাব। জাহানারা ইমাম মুশকিলে পড়েন। তার ছেলের কীবা এমন বয়স। কেবল আইএসসি পাস করে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। আবার আমেরিকার ইলিনয় ইন্সিটিটিউট অফ টেকনোলজিতেও সে ভর্তি হয়ে গেছে। ৫ মাস পরে ওখানে তার ক্লাস শুরু হবে। কদিন পরেই তার আমেরিকার উদ্দেশে ফ্লাই করার কথা, সে কিনা বলছে যুদ্ধে যাবে। জাহানারা ইমামের মাতৃহৃদয় বলে, না, রুমী যুদ্ধে যাবে না। সে আমেরিকা যাবে পড়তে, নিরাপদে থাকতে, দেশে ফিরে এসে স্বাধীন দেশের সেবা করবে। অন্যদিকে তাঁর সচেতন দেশপ্রেমিক স্বার্থত্যাগী হৃদয় বলছে, এ শুধুই স্বার্থপরের মতো কথা। দেশের জন্য দেশের ছেলে তো যুদ্ধে যাবেই। তুমি কেন তাকে আটকে রাখতে চাও। মা ব'লে? আর ছেলেরা মায়ের ছেলে নয়। তখন, জাহানারা ইমামের মনে হয়, অন্য ছেলেদের মতো যদি রুমী বিছানায় কোলবালিশ শুইয়ে রেখে চুপিসারে চলে যেত, তাঁকে আর এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো না। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তিনি ছেলেকে শিখিয়েছেন, মাকে লুকিয়ে কোনো কিছু করতে যেও না। যা করতে চাও, মাকে জানিয়ে কোরো। এখন? রুমী বিতর্কে চ্যাম্পিয়ন, সে যুদ্ধে যাওয়ার সপক্ষে যুক্তি দেয়, সে যুক্তির তোড়ে হেরে যান মা, শেষে বলেন, যা তোকে দেশের জন্য কোরবানি করে দিলাম। যা তুই যুদ্ধে যা।

মুক্তিযোদ্ধারা জানে, পরে বহুদিন রুমীর মা জাহানারা ইমাম তার এই উক্তির জন্য আফসোস করেছেন, অবোধ মাতৃহৃদয় বারবার দগ্ধ হয়েছে অনুশোচনায়, কেন তিনি কোরবানি কথাটা বলতে গেলেন, আলাহ বুঝি তার কোরবানি কথাটাই কবুল করে নিয়েছিলেন।

আর হাবিবুল আলমের মনে পড়ে যায় যে পাশবালিশ বিছানায় শুইয়ে রেখে এক ভোরে তিনিও পালিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অজানা প্রান্তর আর অনিশ্চিত জীবনের উদ্দেশে।

এপ্রিলের ৭ বা ৮ তারিখ। আহমেদ জিয়া, আলমদেরই এক বন্ধু, আলমদের ইস্কাটনের বাসায় আসে। বলে, দোস্ত, একটু রাজশাহী হাউসে আসতে পারবি?

'ক্যান রে?'

আছে ঘটনা আছে। জিয়া কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, মেজর খালেদ মোশাররফ ডাকছে।

'কই?'

'ফ্রন্টে। উনি তো ওনার ফোর বেঙ্গল নিয়া ২৭ মার্চেই রিভোল্ট করছে। মুক্তিবাহিনীতে উনি ঢাকার ছাত্র চান। তুই যাবি কি যাবি না, এটা আলোচনা করব। আরো দুই একজন আসবে। তুই আয়। তুই তো স্কাউট।'

হাবিব বলে, 'মেজর খালেদ মোশাররফের নাম তো শুনি নাই। মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণাটা শুনছি রেডিওতে। ওনার ঘোষণা শুনেই বুঝছি বাঙালি সৈন্যরা যুদ্ধ করতেছে। আমাদেরকেও যেতে হবে।'

'আয় বিকালে রাজশাহী হাউসে। চিনেছিস তো, রমনা থানার কাছে।'

'চিনি। লিচ্যাং-এর বাসা তো।'

বিকালবেলা রাজশাহী হাউসে মিটিং। হাবিবুল আলমের অস্থির লাগে। সে কল্পনায় নিজেকে দেখতে পায় যুদ্ধের ময়দানে। কিন্তু কে এই মেজর খালেদ মোশাররফ? তাকে সে চেনে না। তার নাম শোনে নাই। কিন্তু মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণাটা তার কানে বাজছে।

বিকালবেলা হাবিব হাজির হয় রাজশাহী হাউসে। তারা ছাদে ওঠে। কাইয়ুম, জিয়া, লিচ্যাং আর হাবিব। লিচ্যাং-ও তাদের কমন বন্ধু। তার ভালো নাম ইরতিজা রেজা চৌধুরী। ও একটু শারীরিকভাবে আনফিট। সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বয়স কুড়ির কোঠায়। কেউ হয়তো ২১, কেউ ২২। চৈত্র মাস শেষ হয়ে আসছে। আজকের বিকালটা বেশ গুমোট। সবাই ঘামছে। তবে হঠাৎ করেই হাওয়া বইতে শুরু করে। বসন্তের বিখ্যাত সমীরণ। কপালের ঘামে বুলিয়ে দেয় শীতল পরশ। তাদের আরাম লাগে।

জিয়া মুখ খোলে। আমি মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর টু থেকে আসতেছি। ওখানে আমি ট্রেনিং নিচ্ছি। আমাকে পাঠাইছেন ক্যাপ্টেন হায়দার। আমার সাথে আসছে আশফি। আশফাকুস সামাদ। খালেদ ফোর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে রেগুলার আর্মি গঠন করছেন। তার সাথে যোগ দিছেন বর্ডারের ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স। ঢাকা থাকবে খালেদ মোশাররফের আওতায়। এখন ঢাকার ছেলে দরকার। মেজর খালেদ মোশাররফ ক্যাপ্টেন হায়দারকে বলছেন, ঢাকায় ছাত্র পাঠাও। ঢাকা থেকে আরো আরো ছাত্রকে নিয়া আসো। আসলে ওনারা চাচ্ছেন ঢাকায় গেরিলা অপারেশন শুরু করতে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়। এ জন্য ঢাকার ছাত্র দরকার। ক্যাপ্টেন হায়দারকে একবার দেখলেই তোদের পছন্দ হবে। যুদ্ধের শুরুতেই সিলেটে ক্যাপ্টেন হায়দারের হাতে গুলি লাগে। তার বাম হাতে পাস্টার আছে। সেই জন্য উনি ফ্রন্টে যেতে পারতেছেন না। হেড কোয়ার্টারে থেকে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতেছেন। এখন বল তোরা যাবি কিনা।

অবশ্যই যেতে হবে। আলম ভাবে। না যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়। লিচ্যাং বলে, আমার কী হবে? আমিও তো যেতে চাই।

হঠাৎ নীরবতা নেমে আসে ওই আড্ডায়। লিচ্যাং যেতে চায়। কিন্তু ও তো খানিকটা শারীরিক প্রতিবন্ধী। ওকে নেওয়া তো ঠিক হবে না।

জিয়াই নীরবতা ভঙ্গ করে। বলে, লিচ্যাং তুই ঢাকাতেই থাক। এখন যুদ্ধ মানে তো শুধু বন্দুক দিয়ে গুলি ছোড়া নয়। আরো নানাভাবে যুদ্ধ করা যায়। ঢাকায় যখন ফ্রিডম ফাইটাররা ঢুকবে, তুই তাদেরকে আশ্রয় দিবি। খবর দিবি। এই যে তোর বাসায় আজকে মিটিং হচ্ছে, এটাও তো মুক্তিযুদ্ধেই অংশ নেওয়া।

পরদিন হাবিবুল আলমের বাসায় মুক্তিযোদ্ধা আহমেদ জিয়া আসে। কীভাবে তারা পাড়ি দেবে সীমান্ত, এ বিষয়ে শলা করতে। ঠিক হয়, আলম খবর দেবে কাইয়ুমকে, কাইয়ুম শ্যামলকে, জিয়া নিজেই খবর দেবে মুনীর চৌধুরীর ছেলে ভাষণকে, আর তারা যাত্রা শুরু করবে পরদিন সকাল সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে হরছেও গাস ফ্যাক্টরির কাছের পেট্রল পাম্প থেকে।

আগামীকাল যাত্রা। হাবিব আলম রাত্রিবেলা দুচোখের পাতাই এক করতে পারে না। তার বাসা থেকে সে বিদায় নেবে কী করে? আব্বা আম্মাকে বলে বিদায় নেবার প্রশ্নই আসে না। সে হলো বাড়ির একমাত্র ছেলে। আর তার বোন আছে চারটা। বড়বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, তিনি থাকেন তিন সন্তানসহ খুলনায়, স্বামী পাকিস্তান নেভির অফিসার। এ-বাসায় থাকে তিনবোন। তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বাসা থেকে বের হওয়াও মুশকিল। তার ওপর হাবিবুল আলম থাকে বাসার দোতলায়। কাঠের খাড়া সিঁড়ি দোতলা থেকে সোজা নেমে গেছে নিচতলার যে জায়গাটায়, সেখানে সারাক্ষণই কেউ না কেউ বসে থাকে, আসা-যাওয়া করে, কাজ করে।

হাবিব একটা ছোট্ট পিআইএ মার্কা ব্যাগ গুছিয়ে নিয়েছে। এটা সে ব্যবহার করেছিল স্কাউটের প্রতিনিধি হিসাবে গত ডিসেম্বরে তার অস্ট্রেলিয়া সফরের সময়।

ভোরের আজান হচ্ছে। হাবিবুল আলম বিছানা ছাড়ে। মশারি টাঙানোই থাকুক। সে পাশবালিশটাকে শুইয়ে দেয় বিছানায়। ঢেকে দেয় একটা চাদর দিয়ে। তারপর একটা চিঠি লেখে বাসার সবার উদ্দেশে। আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে যাচ্ছি। আমার জন্য চিন্তা করো না। দোয়া করো। চিঠিটা পড়ার টেবিলে রেখে একটা বই দিয়ে চাপা দেয় সে। তারপর কাঁধে ব্যাগটা ফেলে আস্তে করে দরজাটা বন্ধ করে বাইরে বারান্দায় আসে। একটা টিনের চালা পার হতে হবে। তারপর কাঠের ফ্রেম। সেখান থেকে একটা লাফ দিয়ে নিচতলায় নামা যাবে। তাহলেই কেবল সিঁড়িটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। একটা একটা করে পা বিড়ালের মতো সতর্কতায় ফেলে সে কার্নিশে চলে আসে। তারপর দোতলার মেঝে সমান উচ্চতা থেকে একটা লাফ দিয়ে এসে পড়ে দিলু রোডের সরুগলিতে। গলিতে পড়ে যায় সে, ওঠে, তারপর হাত ঝেড়ে রওনা হয় অজানার উদ্দেশে।

সীমান্ত পেরিয়ে তারা এসে পৌঁছে মতিনগরে। সেক্টর টুর হেড কোয়ার্টারে। সেখান থেকে তাদের পাঠানো হয় কাঠালিয়া মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ শিবিরে। তারা যোগ দেয় দু নম্বর পাটুনে। তার মানে এরই মধ্যে এক নম্বর পাটুন গড়ে উঠেছে, যারা আগে এসেছে তারা তাতে যোগ দিয়েছে। দু নম্বর পাটুনের কমান্ডার হলেন আজিজ। ছাত্রলীগের ঢাকা কলেজের ভিপি।

জিয়াসহ হাবিব আলমেরা সেকেন্ড পাটুনের সবুজ রঙের তাঁবুতে ঢোকে। দেখতে পায় আরো ৭/৮ জন সেখানে আছে। অর্থাৎ সব মিলে দাঁড়ালো ১২/১৩ জন। তাঁবুর এক পাশের ঢাকনা খুলে রাখা হয়েছে। তবু তাঁবুর ভেতরটা গরম।

একদিন পরে, দুই নম্বর পাটুনের ছাত্রযোদ্ধাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখনকার কিংবদন্তী সেক্টর টুর প্রধান মেজর খালেদ মোশাররফ। সঙ্গে আসেন ক্যাপ্টেন হায়দার, শহীদুলাহ খান বাদল প্রমুখ। খালেদ মোশাররফ লম্বা, ফরসা, তার পরনে নীল রঙের ট্রাউজার, হলদে রঙের ফুলহাতা শার্ট, কোমরে পিস্তল। ছাত্রযোদ্ধাদের সামনে তিনি দেন এক সম্মোহনী ভাষণ। তিনি বলেন, পাকিস্তানী হানাদার শাসকদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব তিনভাবে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সামরিক ক্ষেত্রে। এ লড়াইয়ে ছাত্রদের ভূমিকা হবে খুবই গুরুত্বপর্ণ। তোমাদের দিয়েই চলবে আমাদের গেরিলা ওয়ারফেয়ার অফ সেক্টর টু। তোমরা যারা এসেছ, তারা মনে রেখো, একবার শুরু করলে ফিরে যাবার কোনো পথ নেই, এখনও চলে যেতে পারো, পরে আর পারবে না, হয় জিততে হবে, নয়তো মরতে হবে। তবে মনে রেখো, স্বাধীন দেশের সরকার জীবিত গেরিলাদের চায় না, নো গভর্নমেনট ওয়ান্টস এন এলাইভ গেরিলা, নিতে পারে না, দেশ স্বাধীন হলে তোমাদের কী হবে আমি বলতে পারব না, তবে যদি তোমরা আত্মত্যাগ করো, যদি শহীদ হও, তাহলে সেটা হবে তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার, এই মৃত্যু হবে বীরের মৃত্যু, দেশের জন্য মৃত্যু, মাতৃভূমির জন্য মৃত্যু, মায়ের জন্য মৃত্যু।

শাহাদত চৌধুরীকে যে মেজর খালেদ তাঁর কাছে যাবার সুযোগ দিয়েছিলেন, তার একটা কারণ ছিল। সেটা হলো শাচৌয়ের সঙ্গে ঢাকার বুদ্ধিজীবী মহলের স্বাভাবিক যোগাযোগ। শাচৌ, দেখা যাচ্ছে, ঢাকা গেলে সঙ্গে করে আনে আলতাফ মাহমুদের সুর করা নতুন গান, আরো পরমাশ্চর্য, সে একবার সঙ্গে করে আনল দুটি কবিতা। সেই কবির নাম বলা বারণ, কিন্তু খালেদ মোশাররফকে বলতে তো মানা নাই। শামসুর রাহমান। শামসুর রাহমান রয়ে গেছেন অবরুদ্ধ বাংলাদেশে, কিন্তু গোপনে লিখে শাচৌয়ের হাতে পাঠিয়েছেন একজোড়া আশ্চর্য কবিতা। গোপনে সেই কবিতা বয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে মেলাঘরের ক্যাম্পে খালেদের হাতে পৌঁছে দিল শাচৌ। সুলতানা কামাল পড়ে শোনাল কবিতা দুটো, খালেদ-সহ মুক্তিযোদ্ধাদের।

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা অবিনাশী গান
স্বাধীনতা তুমি কাজী নজরুল, ঝাঁকড়া চুলের বাবড়ি দোলানো
মহান পুরুষ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা–

আর

তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতকাল ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতকাল দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা
সকিনা বিবির কপাল ভাঙল
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।

কবিতা দুটো শুনে পুরো ক্যাম্প উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এরপরে শাচৌকে দেখেই শামসুর রাহমার লেখেন তাঁর আরেকটা অসাধারণ কবিতা, গেরিলা। ওই কবিতাটা যখন মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে পড়া হলো, আবেগে চোখ ভিজে এসেছিল অনেকেরই।

দেখতে কেমন তুমি? কী রকম পোশাক আশাক
পরে করো চলাফেরা? মাথায় আছে কি জটাজাল?
পেছনে দেখতে পারো জ্যোতিশ্চক্র সন্তের মতন?
টুপিতে পালক গুঁজে অথবা জবরজং ঢোলা
পাজামা কামিজ গায়ে মগডালে একা শিস দাও
পাখির মতন কিংবা চাখানায় বসো ছায়াচ্ছন্ন।
দেখতে কেমন তুমি?–অনেকেই প্রশ্ন করে, খোঁজে
কুলুজি তোমার আঁতিপাঁতি। তোমার সন্ধানে ঘোরে
ঝানু গুপ্তচর, সৈন্য, পাড়ায় পাড়ায়। তন্ন তন্ন
করে খোঁজে প্রতিঘর। পারলে নীলিমা চিরে বের
করত তোমাকে ওরা, দিত ডুব গহন পাতালে।

তুমি আর ভবিষ্যত যাচ্ছ হাত ধরে পরস্পর।

সর্বত্র তোমার পদধ্বনি শুনি, দুঃখ-তাড়ানিয়া;
তুমি তো আমার ভাই, হে নতুন, সন্তান আমার।

শাহাদত চৌধুরী আজ যুদ্ধের ১৪ বছর পরেও স্মরণ করতে পারেন, ভাই আর সন্তান বলে সম্বোধন করার এই শেষ পঙ্‌ক্তিটা তাদের শরীরে কী রকম বিদ্যুৎ খেলিয়ে দিয়েছিল।

ট্রেনিং শেষে হাবিবুল আলমের প্রথম ঢাকা আগমন আর ঢাকায় প্রথম অপারেশন ছিল মেজর নূরুল ইসলাম শিশুর স্ত্রী আর দু কন্যাকে ঢাকা থেকে মতিনগর নিয়ে যাওয়া। এ জন্যে নুরুল ইসলাম পুরস্কার হিসেবে হাবিবুল আলমকে দিতে চেয়েছেন একটা চাইনিজ এসএমজি আর কাজী কামালকে একটা চাইনিজ পিস্তল। এর আগে কাজী কামাল কাইয়ুমকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় এসে মেজর শাফায়াত জামিলের স্ত্রী ও দু পুত্রকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সাফল্য দেখিয়েছে। এবার মেজর নুরুল ইসলাম শিশুর পরিবারকে নিতে কাজী কামালের ডাক পড়লে হাবিবও তার সঙ্গে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, কারণ হাবিব শিশুর বাসাটা আগে থেকেই চেনে। আর কাজী কামালকে হাবিবুল আলম আগে থেকেই চেনে বাস্কেট বল খেলোয়াড় হিসাবে, তাকে ডাকে কাজীভাই বলে, হাবিবুল আলম নিজেও ফার্স্ট ডিভিশন লিগে হকি খেলে থাকে।

এই পিস্তলটা কাজী জিতে নিতে সক্ষম হয়, হাবিবও জিতে নেয় এসএমজিটা, মেজর নুরুল ইসলামের পরিবারকে তারা সীমান্তের ওপারে সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারে সাফল্যের সঙ্গে। এই পিস্তলটার কথা ঢাকার মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষভাবে মনে পড়ে যায় এজন্য যে জুয়েলের খুব লোভ ছিল পিস্তলটার ওপর। আজাদদের বাসা থেকে ধরা পড়ার দিনও জুয়েল তার পাশে এই পিস্তলটা রেখেছিল। ওখান থেকেই কাজী কামাল পিস্তলটাকে হারায় আর হারায় আজাদকে, জুয়েলকে, বাশারকে।

৩৩

আজাদ যুদ্ধে যাবার পরে, তার মাকে একাধিকবার বলেছিল, এটা তার খালাত ভাইবোনদের মনে আছে এখনও যে আজাদ বলছে, মা, আমি কিন্তু রাজনীতি করি না, পলিটিক্স করতে আমি যুদ্ধে যাই নাই, আমি যুদ্ধে গেছি বাঙালির উপরে পাকিস্তানীদের অত্যাচার মানতে পারছি না বলে, রাজারবাগের পুলিশ ব্যারাকে ওরা যা করছে...। ২৫ মার্চ রাতে রাজারবাগে কী ঘটেছিল, সেটা আজাদ আর বাশার কিছুটা নিজের চোখে দেখেছিল। আর এপ্রিল মে মাসে কী ঘটছে সেখানে, তার বিবরণ তারা পেয়েছিল এক পুলিশ সুবেদারের কাছ থেকে। এই পুলিশ সুবেদারের বাড়ি ছিল মাওয়ায়। আজাদরা তাকে ডাকত খলিল মামা বলে।

মা তাঁর কথা এরই মধ্যে মাঝে-মধ্যেই স্মরণ করতেন-'খলিলটা যে আর আসে না। বেঁচে আছে, নাকি মারা গেছে কে জানে? আজাদ, একটু খোঁজ নিস তো। খলিল বেঁচে আছে নাকি?'

এপ্রিলের মাঝামাঝি পুলিশের সুবেদার খলিল একদিন আসেন আজাদদের বাসায়।

মা বলেন, আলাহ মালিক। তুমি বেঁচে আছ খলিল।

'জি বুবু। হায়াত আছে। আপনাদের দোয়ায় বাঁইচা আছি।'

আজাদের সঙ্গেও তার দেখা হয়। মা তার জন্যে চাল চড়িয়ে দেন চুলায়।

মা বলেন, তোমার কোনো খবর পাই না। বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। চারদিক থেকে কত দুঃসংবাদ আসছে।

খলিল মামা বলেন, বুবু, কী দেখলাম এই জীবনে। দোযখ দেখা হইয়া গেছে। মার্চ মাসের ২৯ তারিখে কোতয়ালি থানায় পোস্টিং হইল। আমরা ৮জন। থানায় গিয়া দেখি, কী কবো বুবু, দেওয়ালে, মেঝেতে চাপ চাপ রক্ত, থানার দেওয়াল মনে করেন গুলির আঘাতে ঝাঁজরা হইয়া আছে। বুড়িগঙ্গার

পাড়ে গিয়া খাড়াইলাম। খালি লাশ আর লাশ। নদীর পানি দেখা যায় না। মনে করেন পুকুরে বিষ দিলে যেমন মাছে পানি ঢাইকা থাকে, বুড়িগঙ্গায় খালি মড়া মানুষ ভাসতেছে। একটা পুলিশের লাশ দেইখা আগায়া গেছি। দেখি, আমাদের পিআরএফ-এর কনস্টেবল আবু তাহের। আমি চোখের পানি আটকাইতে পারি না। আরও বহু সিপাহীর ক্ষত-বিক্ষত লাশ ভাসতেছে। আমি তাহেরের বডি ধরতে গেছি, বেহুঁশের মতো, পেছন থাইকা এক পাঞ্জাবি সোলজার চিলায়া উঠল, 'শুয়র কা বাচ্চা, তোমকো ভি পাকড়াতা হায়, কুত্তা কা বাচ্চা, তোম কো ভি সাথ মে গুলি করে গা।' আমি মনে মনে কই, আমি সাব ইন্সপেক্টর আর তুমি একজন সোলজার, আমার সাথে কুকুরের মত ব্যবহার করতেছ, করো। আলাহ বিচার করবে।

মা বলেন, মহুয়া দ্যাখো তো, চুলায় ভাতের কী অবস্থা। আঁচটা একটু কমিয়ে দিও মা। হ্যাঁ ভাই বলো।

খলিল বলে চলেন, কোতোয়ালি থানার বরাবর সোজাসুজি গিয়া বুড়ীগঙ্গার লঞ্চঘাটটা আছে না সেই পাড়ে খাড়াইলাম। দেখলাম বুড়ীগঙ্গার পাড়ে লাশ, খালি লাশ, পইচা গইলা যাইতেছে, বেশুমার মানুষের লাশ ভাসতেছে। দেখলাম কত মানুষ মইরা ভাইসা আছে। বাচ্চা, বুড়া, ছেলে, মেয়ে। যতদূর চোখ যায়, দেখলাম বাদামতলি ঘাট থাইকা শ্যামবাজার ঘাট পর্যন্ত নদীর পাড়ে অগণিত মানুষের পচা-গলা লাশ। বুবু, ভাগ্নে এখানে আছে, কওয়া যায় না আবার না কইয়াও পারি না, অনেক উলঙ্গ মহিলার লাশ দেখলাম, পাকিস্তানীরা অত্যাচার কইরা মারছে, দেইখাই বোঝা যাইতেছে। ছোট ছোট মাসুম বাচ্চাদের মনে হইল আছাড় মাইরা খুন করছে। সদরঘাট টার্মিনালের শেডের মধ্যে ঢুইকা খালি রক্ত আর রক্ত দেখলাম...দেখলাম মানুষের তাজা রক্ত এই বুড়ীগঙ্গা নদীর পাড়ে। বহু মানুষরে ধইরা আইনা টার্মিনালে জবাই করছে। বেটন আর বেয়নেট দিয়া খোঁচায়া মাইরা টাইনা হেচড়ায়া পানিতে ফেইলা দিছে। শেডের বাইরের খোলা জায়গাটায় গিয়া দেখি, কাক ও শকুনে ছাইয়া গেছে। সদরঘাট টার্মিনাল থাইকা পূর্বদিকে পাকমিলিটারির সদর আউট পোস্টটা আছে না সেই দিকে তাকাইলে দেখবেন নদীর পাড়ের সমস্ত বাড়িঘর ছাই কইরা ফেলছে। দেখলাম রাস্তার পাশে ঢাকা মিউনিসিপালিটির কয়েকটা ময়লা পরিষ্কার করার ট্রাক খাড়ায়া আছে, সুইপাররা হাত-পা ধইরা টাইনা হেঁচড়াইয়া ট্রাকে লাশ উঠাইতেছে। কাপড়ের বাজারের চারদিকে রূপমহল সিনেমা হলের সামনে খালি লাশ। খৃস্টান মিশনারি অফিসের সম্মুখে, সদরঘাট বাস ষ্টপেজের চারদিকে, কলেজিয়েট হাইস্কুল, জগন্নাথ কলেজ, পগোজ হাইস্কুল, ঢাকা জজকোর্ট, পুরাতন ষ্টেট ব্যাংক বিল্ডিং, তারপরে ধরেন সদরঘাট গির্জা, নওয়াবপুর রোডের চারদিকে, ক্যাথলিক মিশনের বাইরে ভিতরে আদালতের সামনে বহু মানুষের ডেড বডি পইড়া আছে।

আজাদ মাথা নিচু করে সব শুনছে। মার চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পড়ছে।

মা ভাত বাড়েন। আজাদ আর খলিল এক সঙ্গে ভাত খেতে বসে। খলিল এমনভাবে গোগ্রাসে খেতে থাকেন যে কতদিন তিনি খান না। আজাদ ভাতের থালায় ভাত নাড়ে-চাড়ে. কিন্তু ভাত তুলে মুখে দিতে পারে না। তার নাকে এসে লাগে লাশের গন্ধ।

আজাদের এই খলিল মামা পরে আবার আসেন তাদের বাসায়। বাশার ছিল সেদিন। আজাদ তাঁকে তাদের ঘরে নিয়ে আসে। বলে, খলিল মামা, কী অবস্থা বলেন তো।

তিনি বলেন, বাশার সাহেব তো আবার সাংবাদিক, সাংবাদিক মানে হইল সাংঘাতিক। আমি তার সামনে কিছু বলব না।

বাশার বলে, মামা, আমি এসব লিখব না। শুধু শুনে রাখি, দেশ যদি কোনোদিন স্বাধীন হয়, তখন লিখব।

খলিল মামা বলেন, বাবারে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আছি। যা দেখতেছি, তা আল্লাহ কেমনে সহ্য করতেছে, বুঝতেছি না। পাঞ্জাবি সৈন্যরা মিলিটারী ট্রাকে কইরা জীপে কইরা ডেলি স্কুল, কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্রীদের ধইরা আনে। ঢাকার নানান জায়গা থাইকা বাচ্চা মেয়ে ইয়ং মেয়ে সুন্দরী মহিলাদের ধইরা আনে। হাতে বইখাতা দেইখাই বোঝা যায় স্টুডেন্ট। মিলিটারী জীপে ট্রাকে যখন মেয়েদের পুলিশ লাইনে আনা হয়, তখন পুলিশ লাইনে হৈচৈ পইড়া যায়। পাকিস্তানী পুলিশ জিভ চাটতে চাটতে ট্রাকের সামনে আইসা মেয়েদের টাইনা হেঁচড়ায়া নামায়া কাপড়-চোপড় ছিঁইড়া-খুঁইড়া উলঙ্গ কইরা আমাদের চোখের সামনেই মাটিতে ফেইলা কুত্তার মতো অত্যাচার করে। সারাদিন নির্বিচারে রেইপ করার পর বৈকালে পুলিশ হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং-এর উপর চুলের সাথে লম্বা লোহার রড বাইন্দা রাখে। আবার রাতের বেলায় শুরু হয় অত্যাচার। গভীর রাতে আমাদের কোয়ার্টারে মেয়েদের কান্না শুইনা সবাই ঘুম থাইকা জাইগা জাইগা উঠি। খলিল সাহেব কাঁদতে থাকেন।

আজাদ আর বাশার নীরব।

তারা বুঝতে পারে না, খলিল মামাকে তারা কীভাবে সান্ত্বনা দেবে? তাদেরকেই বা সান্ত্বনা দেয় কে? আজাদ ভেতরে ভেতের ফুঁসতে থাকে। এই অত্যাচার মুখ বুঁজে যে সহ্য করে, সে কি মানুষ?

৩৪

আজাদকে যুদ্ধে এনেছিল কাজী কামাল উদ্দিন। তার বন্ধুরা, ক্রিকেট খেলার সঙ্গীরা যে অনেকেই আগরতলা গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে, আজাদ জানত না।

শরতকাল। রোদের তেজ কমে এসেছে। আকাশ নীল হতে শুরু করেছে। আজাদদের মগবাজারের বাসার দুবাসা পরের বাসাটার সামনে শিউলি গাছে ফুল ফুটে থাকে। একেকটা সকালে তার ঘ্রাণ এসে নাকে লাগে আজাদের। আজাদের কেমন ঘোর ঘোর লাগে। শিউলির গন্ধের সঙ্গে রাজারবাগে দেখা লাশের গন্ধ যেন মিশে যায়।

এক দুপুরে কাজী কামালের সঙ্গে দেখা আজাদের। ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের সামনে একটা সিগারেটের দোকানে। এটা আজাদের প্রিয় একটা সিগারেটের দোকান। ৩ টাকার সিগারেট কেনার জন্য আজাদ এখানে আসে তিনটাকা বেবিট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে হলেও।

কাজী কামালকে দেখেই আজাদ উলসিত, আরে কাজী, তুমি কই হারিয়ে গেলে। দেখা পাই না।

কাজী কামাল সন্ত্রস্ত। পাগল কী বলে! এইভাবে প্রকাশ্য রাজপথে এই ধরনের কথা বলার মানে ধরা পড়ে যাওয়া। কাজী কামাল কথা ঘোরানোর জন্য বলে, এরামে চলো। তোমারে সব কইতেছি।

এরাম রেস্তরাঁ এবং বার। দিনের বেলাতেও খোলা থাকে। আজাদ আর কাজী কামাল সেখানে যায়। বারটা এখন ফাঁকা। একটা কোনায় তারা দুজন বসে পড়ে।

কাজী কামাল বলে, আজাদ। তোমার একটু হেল্প দরকার। আমি তো ট্রেনিং নিয়া আসছি। গেরিলা ট্রেনিং।

আজাদ বলে, এটা তুমি কী করলা? আমাকে ফেলে রেখে একা একা চলে গেলা। তুমি ওঠো। যাও। তোমাকে আমি কিছুই খাওয়াব না।

কাজী কামাল বলে, আরে পাগলামো কইরো না। তুমি এখানে থাইকাই যুদ্ধ করতে পারো। হেল্প আস।

আজাদ বলে, কী ধরনের হেল্প।

'এবার আমরা অনেক অস্ত্রশস্ত্র আনছি। রাখার জায়গা নাই। আবার আমাদেরও থাকার জায়গা লাগে। হাইড আউট। তোমার বাসায় আমাদের জায়গা দিতে পারো।'

'অফ কোর্স।'

'বুইঝা বলো। এখনই বলার দরকার নাই। তোমার মার পারমিশন নাও। বাসায় বাইরের ছেলেরা থাকবে। অস্ত্রপাতি থাকবে। মাকে না জানায়া এসব করা উচিত হবে না।'

'মা কিছু বলবে না। রাজি হয়েই আছে।'

'তবুও তুমি মারে জিগাও। রান্নাবান্না কইরা খাওয়াইতে তো হবে।'

'মা তো খাওয়ানোর লোক পেলে খুশি হয়।'

'আরে তুমি জিগাও তো। আমি তোমার বাসায় কালকা আসতেছি। সকাল ১০টায় বাসায় থাইকো।'

দুজন খদ্দের এসে তাদের পাশের টেবিলে বসে। তারা আর আলাপ করতে পারে না। গেলাস শেষ করে উঠে পড়ে। আজাদ বিল মিটিয়ে দেয়।

আজাদ বাসায় যায়। মাকে বলে, মা শোনো, তোমার সাথে কথা আছে।

মা রান্নাঘরে ছিলেন। তার কপালে ঘাম। তিনি আঁচল দিয়ে ঘাম মোছেন। হাতের হলুদ তার মুখে লেগে যায়। 'বল, কী বলবি, চুলায় রান্না।'

'বসো। বসে মন দিয়া শোনো।'

'বলে ফেল।'

'আগে বলো না করবা না।'

'আরে তুই আগে বলে ফেল না।'

'মা আমার কয়জন বন্ধুবান্ধব আমাদের বাড়িতে এসে থাকবে।'

'থাকবে। থাকুক। এটা আবার জিজ্ঞেস করার কথা। বন্ধুগুলো কারা?'

'এই ধরো কাজী কামাল, জুয়েল।'

'কেন? ওদের বাড়িতে কী অসুবিধা হয়েছে কোনো?'

আজাদ কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলে, 'ওরা তো যুদ্ধে করছে। শুনছো না, ঢাকায় গেরিলা অপারেশন হচ্ছে। ওরাই করছে। তাই নিজের বাসায় থাকা নিরাপদ না। সাথে কিছু অস্ত্রশস্ত্রও থাকে তো।' আজাদ শেষের কথাটা বলে রাখে ইচ্ছা করেই। অস্ত্র রাখার অনুমতিটাও এই সুযোগে নিয়ে রাখা দরকার।

মা স্থির হয়ে যান খানিকক্ষণের জন্য। তাঁর কপালে ঘামের বিন্দুগলো শিশিরের মতো জমতে থাকে। এবার তিনি কী বলবেন?

একটা মাত্র ছেলে তাঁর। এই ছেলেকে মানুষ করার জন্যই যেন তিনি বেঁচে আছেন। ছেলে তাঁর এমএ পাস করেছে। এখন তার জীবন, তার নিজের জীবন। সত্য বটে, ছেলে তাঁর এখন আয়-রোজগার করবে, এখন মায়ের কষ্ট করে জমি আবাদ করার দিন শেষ, বীজ বোনা, নিড়ানি দেওয়া সব সমাপ্ত, এখন তার ফসল ঘরে তোলার দিন। এখন সংসারে তাঁর লাগার কথা নবান্নের আনন্দের ঢেউ, নতুন ভাতের গন্ধের মতোই আনন্দের হিলোলে তাঁর ঘরের মৌ-মৌ করার কথা।

ইতিমধ্যেই তিনি ছেলের জন্যে একটা বউ দেখে রেখেছেন। আলাপ-আলোচনা কেবল শুরু হয়েছে। আজাদকে নিয়ে তিনি একদিন যাবেন মেয়ের বাসায়, বেড়াতে যাবার ছলে দেখে আসবেন মেয়েকে।

এরমধ্যে এ কোন প্রস্তাব!

কিন্তু তিনি নাই বা করেন কোন মুখে! জুয়েলের মাও তো ছেড়েছে জুয়েলকে, কাজী কামালের মা কাজী কামালকে! আর তাছাড়া ২৫ মার্চের পরে ঢাকা শহরের ওপরে পাকিস্তানী মিলিটারি কী অত্যাচার নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে, সে খবর কি তিনি পাচ্ছেন না! বিনাদোষে মারা পড়ছে হাজার হাজার মানুষ।

রোজ মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে ক্যান্টনমেন্টে, রাজারবাগ পুলিশ লাইনে, অত্যাচার করছে মেয়েদের ওপর। তার জুরাইনের পীর সাহেব বলেন, মেয়েদের ওপরে অত্যাচার যখন শুরু হয়েছে, পাকিস্তান আর্মি তখন পারবে না। আলাহ্‌তালা এই অত্যাচার সহ্য করবেন না।

না। এই অত্যাচার চলতে দেওয়া যায় না। এটা অধর্ম। তাঁর অবশ্যই উচিত মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করা।

তিনি কপালের ঘাম মুছে বলেন, নিয়ে আসিস তোর বন্ধুদের।

আজাদ খুশি হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে। বলে, মা, তোমার কপালে হলুদ লেগেছে, সুন্দর দেখাচ্ছে।

কাজী কামাল আসে পরদিন সকাল ১০টায়। মা তার সামনে আসেন। বলেন, কেমন আছ বাবা। কী খাবে? আজাদ আমাকে বলে কামাল জুয়েল এরা এসে বাসায় থাকবে। এ জন্য কি পারমিশন নিতে হয় নাকি! তোমরা আমার ছেলের মতো না? আসবে। যখন সুবিধা মনে করবে আসবে

জায়েদের মনে পড়ে, আজাদদের মগবাজারের বাসাটা ছিল একটা ছোটখাটো ক্যান্টনমেন্ট। প্রচুর অস্ত্র গোলাবারুদ আসত এ বাসায়। আবার এখান থেকে বিভিন্ন বাসায় সেসব চালান হয়েও যেত। সে নিজেও বস্তায় ভরে অস্ত্র নিয়ে গেছে আশেপাশের বাসায়। দিলু রোডের হাবিবুল আলমের বাসায় যেমন।

তার এই বীরত্ব নিয়ে কৌতুক করত মর্নিং নিউজের সাংবাদিক আবুল বাশার। বলত, কীরে, ভয় পেয়েছিস নাকি! আয় তো এদিকে আয়। জায়েদের প্যান্ট একটানে খুলে বলত, দেখি, প্যান্টের মধ্যে হেগে ফেলেছিস নাকি!

জায়েদ খুবই বিরক্ত হতো। সে কত কষ্ট করে পিঠে বয়ে রেললাইন ধরে এগিয়ে গিয়ে দিলু রোডের পেছন দিয়ে ঢুকে অস্ত্র রেখে এল। আর তার সঙ্গে কিনা এই ইয়ারকি। বাশারের লুঙ্গিটা ধরে একটা টান দেবে নাকি সে!

দাদার বন্ধু। সে কিছু বলতেও সাহস পায় না।

জুয়েল আর কাজী কামাল মাঝেমধ্যেই এ বাসায় আসে। রাতে থাকে। কোনো অপারেশন না থাকলে তাস খেলে। টিভি দেখে। আর আজাদের সঙ্গে গল্প করে।

জুয়েল বলে, দোস্তো, যখন তুই আর্মস হাতে নিবি, ফায়ার করবি, তখন কিন্তু ইরেকশন হয়। ঠিক কিনা কাজী ভাই।

কাজী কামাল স্বীকার করে, হয়।

জুয়েল বলে, আজাদ, তুমি তো দোস্তো বুঝবা না। তুমি তো আর্মস নাড়ো নাই।

আজাদ হাসে। কী কয়। আমাদের আর্মসের দোকান ছিল না। আমার টার্গেট তোদের চাইতে ভালো। আরে আমি যতগু লান পাখি শিকার করছি, আর কেউ করতে পারছে।

জুয়েল হাসে। পাখি শিকার করা আর পাক আর্মি মারা আলাদা ব্যাপার। পাঞ্জাবি হইলেও তো মানুষ।

আজাদ বলে, দ্যাখো। পাখি মারতে মায়া লাগে। পাঞ্জাবি মারতে আবার মায়া কীরে! ওরা কেমনে মারতেছে!

আজ মনে হয় তাদের গল্পে পেয়েছে। জুয়েল আর কাজী কামাল আজাদকে শোনাচ্ছে তাদের অপারেশনের কথা।

জুয়েল শোনায় তাদের ফার্মগেট অপারেশনের গল্প।

ধানমন্ডি ২৮-এর হাইড আউটে মিটিং। আলম, বদি, স্বপন, চুলু-ভাই ছাড়াও মিটিঙে ছিলেন শাহাদাত চৌধুরী। ঠিক হলো ফার্মগেটের আর্মি চেকপোস্ট এটাক করা হবে। সবচেয়ে বেশি উৎসাহ বদির। এক সপ্তাহ ধরে রেকি করা হলো। তারপর আবার মিটিং। সে মিটিঙে ঠিক হলো ফার্মগেটের

সঙ্গে সঙ্গে দারুল কাবাবেও আক্রমণ চালানো হবে। ওটাও একই ময়মনসিংহ রোডে। দুটো গ্রুপ গঠন করা হলো। ফার্মগেট অপারেশনে থাকবে বদি, আলম, জুয়েল, পুলু আর সামাদ ভাই। আহমেদ জিয়ার নেতৃত্বে চুলুভাই, গাজি থাকবে দারুল কাবাব ঘর অপারেশনে। ফার্মগেট অপারেশন শেষ হলে গ্রেনেড চার্জ করা হবে, এটাই হবে দারুল কাবাবে হামলা করার সংকেত।

রাত সাতটা তিরিশে ফার্মগেটে মিলিটারি ক্যাম্পে হামলা করার সময় ঠিক হলো। ওই দিন বিকালে সবাই মিলিত হলো সামাদ ভাইয়ের মগবাজারের বাসায়। আলমের হাতে মেজর নূরুল ইসলাম শিশুর দেওয়া এসএমজি। অন্য সবার হাতে থাকে স্টেনগান। অপারেশন করতে দুতিনমিনিট লাগার কথা। এর মধ্যে আলম একটা ঝামেলা করে ফেলে। তার সাব মেশিন গান পরিষ্কার করতে গিয়ে পরিষ্কার করার নিজস্ব উদ্ভাবিত পুল নলের ভেতরে আটকে যায়। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। সাড়ে ছয়টা বাজে। সবাই উৎকণ্ঠিত। এসএমজি চালু না হলে আজকের অপারেশনই হবে না। শেষে কেরোসিন ঢেলে ভেতরে আটকে যাওয়া দড়ির গিটে আগু ন লাগিয়ে ওটাকে জঞ্জালমুক্ত করা যায়।

নিয়ন সাইনের মালিক সামাদভাই গাড়ি চালাবেন। বদি আর আলম থাকবে সামনের সিটে। জানালার ধারে থাকবে আলম। পেছনের সিটে স্বপন, জুয়েল আর পুলু। এর আগে আলম, বদি, সামাদ ভাই ফার্মগেট এলাকা অনেকবার রেকি করেছে। এমনকি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ওখানে পাকিস্তানী সৈন্যরা কে কী করে, তাও তারা জানে।

এখনও কিছু সময় বাকি আছে। জুয়েল স্বভাবমতো চুটকি বলতে শুরু করে। সামাদ ভাই মেটালিক সবুজ টয়োটা সেডান গাড়িটা শেষবারের মতো চেক করে নেন। ৭টা ১৫ মিনিট। সবাই তাদের পোশাক-আশাক পরিপাটি করে নেয়। কেশবিন্যাস করে। এর কারণ এলোমেলো পোশাকে গাড়িতে গেলে তাদেরকে সন্দেহ করা হতে পারে। ঠিক সাড়ে সাতটায় তারা গাড়িতে উঠে বসে। আলমের হাতে এসএমজি, অন্যদের হাতে স্টেন, এ ছাড়া জুয়েল আর পুলুর হাতে ফসফরাস গ্রেনেড, আরেকটা ইন্ডিয়ান পাইন এপেল গ্রেনেড। ওপেনিং কমান্ড দেবে বদি। ফেরার কমান্ড দেবে স্বপন।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। মগবাজার থেকে ধীরে ধীরে এসে পড়ছে ময়মনসিংহ রোডে। রাস্তায় পাকিস্তানী আর্মির গাড়ি চলাচল করছে। শত্রুর গাড়ির কাছে আসতেই মুক্তিযোদ্ধাদের হাত আপনা-আপনিই অস্ত্রের গায়ে চলে যাচ্ছে। তারা ধীরে ধীরে দারুল কাবাব পেরিয়ে ফার্মগেট মোড়ে যায়। ডান দিকেই তাদের লক্ষ্যবস্তু। আর্মি চেক পোস্ট। দুটো তাঁবু। দুজন সৈন্য নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। আরেকজন সৈন্য একটা বেবিট্যাক্সি থামিয়ে যাত্রীকে তলাসি করছে। বাকি সৈন্যরা হয়তো তাঁবুতে রাতের খাবার খাচ্ছে, বা বিশ্রাম নিচ্ছে। তাদের গাড়ি ডানে ঘুরে তেজগাঁ সড়কে পড়ে। কিছুদূর গিয়ে সামাদ ভাই গাড়ি ঘুরিয়ে ফেলেন। তারপর গাড়ির হেড লাইট নিভিয়ে স্টার্ট বন্ধ করে গাড়ির নিজস্ব গতিজড়তায় গাড়িটাকে এনে দাঁড় করান হলিক্রস কলেজের গেটের কাছে। পানের দোকানে বিকিকিনি চলছে যথারীতি। সামাদ ভাই বলেন, আল্লাহ ভরসা। ৫ জন নেমে পড়ে। একমিনিটের মধ্যে সবাই যার যার পজিশন নিয়ে ফেলে। দুজন সৈন্য এখনও গল্প করছে। তৃতীয় সৈন্যটিও তাদের কাছে এসে গল্প জুড়ে দেয়। গেরিলাদের বুক কাঁপছে। বদি নির্দেশ দেয়ঃ ফায়ার। আলম গু লি চালায় তিন সেন্ট্রিকে লক্ষ্য করে। আর বাকি চারজন একযেগে ব্রাশ ফায়ার করতে থাকে দুই তাঁবু লক্ষ্য করে। তিনজন প্রহরারত সৈন্যকে ধরাশায়ী করে আলমও তাক করে তাঁবু দুটো। রচিত হয় গু লির মালা। স্বপন নির্দেশ দেয়ঃ রিট্রিট। জুয়েল আর পুলু বোমা চার্জ করে। সবাই দৌড়ে এসে উঠে পড়েগাড়িতে। সামাদ ভাই গাড়িতে টান দেন। ময়মনসিংহ সড়ক ধরে গাড়ি এগিয়ে চলে। তখন সবার খেয়াল হয় গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয় নাই। দারুল কাবাব ঘরের অপারেশন তাই হতে পারে না।

জুয়েল তাদের এই অপারেশনের বিবরণ পেশ করে রসিয়ে রসিয়ে।

আজাদ বলে, কয়জন মিলিটারি মারা গেল, বুঝলি কেমনে!

১২ জন সোলজার মারা গেছে। আমরা পরদিন গেলাম আশরাফুলের বাড়ি। ওইখানে আমগো বন্ধু হিউবার্ট রোজারিও সব কইল। অর বোন হলিক্রসের টিচার। উনিই সব দেখছে। সারারাত আর্মিরা লাশ লইতে আসতেও সাহস পায় নাই। ভোরবেলা আসছে। হিউবার্টের বোন ১২বার বুকে কপালে ক্রস করছে। মানে ১২টা লাশ লইয়া গেছে। চিন্তা কর। এরা নাকি দুনিয়ার সবচাইতে সাহসী সোলজার। সারারাত সৈন্যরা পইড়া থাকল, কেউ তো উন্ডেডও থাকতে পারে, আইসা দ্যাখ, হসপিটালে লইয়া যা, ঢাকা শহরের মধ্যে এই সাহসটা পাইল না। আরে নিউজ শুইনা নাকি ক্যান্টনমেন্টে সব সোলজার গো পিশাব পাইছে, একলগে এতজন বাথরুমে যাইব কেমনে, সব কাপড় নষ্ট কইরা ফেলাইছে, মুতের গন্ধে ক্যান্টনমেন্ট যাওয়া যাইতেছে না...

শুনে আজাদ উত্তেজিত। জুয়েল, যুদ্ধ যখন শেষ হবে, তোদেরকে অনেক এওয়ার্ড দেবে রে। শোন আমিও যাব নেক্সট অপারেশনে। আমাকে তোরা অবশ্যই নিবি।

'যেতে চাইলে যাবি। কিন্তু খালাম্মার পারমিশন লাগবে। খালাম্মার পারমিশন ছাড়া তরে নেওন যাইব না'-জুয়েল বলে।

'মা ঠিক পারমিশন দিবে। ঘরে অস্ত্রশস্ত্র রাখতেছি। তাতে যখন আপত্তি করে নাই, তখন...'

সেই রাতেই ভাত খেতে খেতে আজাদ মাকে বলে, মা, এরা এরপর যেই অপারেশনে যাবে, আমি সেইটাতে যেতে চাই। এত বড় জোয়ান ছেলে, ঘরে বসে থাকে, আর দেশের মানুষ মার খায়, এটা হতে পারে না।

মা কথার জবাব দেন না।

'এই দেখ মার এপ্রুভাল আছে। মা আপত্তি করল না।' আজাদ কায়দা করে।

মা বলেন, আমি কালকে তোকে ফাইনাল কথাটা বলব। আজকের রাতটা সবুর কর।

'ঠিক আছে। কিন্তু দেখো মা, না কোরো না।'

মা সারারাত বিছানায় ছটফট করেন। কী বলবেন তিনি ছেলেকে। যুদ্ধে যাও! পরে যদি ছেলের কিছু হয়। এই ছেলে তাঁর বহু সাধনার ধন। তাঁর প্রথম সন্তানটা একটা মেয়ে। কানপুরেই জন্ম হয়েছিল মেয়েটার। চৌধুরী সাহেব মেয়ের নাম রেখেছিল বিন্দু। সেই মেয়ে এক বছর বয়সে মারা যায়। প্রথম সন্তান বিয়োগের কষ্ট যে কী কষ্ট! বহুরাত সাফিয়া কেঁদেছেন। মেয়েটা তাঁর কথা শিখেছিল। মা মা দাদা দাদা বলতে পারত। সুন্দর করে হাসত। চৌধুরী সাহেব বলতেন, ফেরেশ্‌তারা হাসাচ্ছে। বিন্দু তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে ছিল। সেই মেয়ে বসন্ত হয়ে মারা গেল। সাফিয়া বেগমের মনে হলো সমস্ত জগতই শূন্য। জীবনের কোনো মানে নাই। বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া সমান কথা। বিন্দু মারা যাবার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর পেটে সন্তান এসে গেল। নতুন করে তিনি মাতৃত্বের স্বপ্ন বুনতে লাগলেন। জন্ম নিল আজাদ। তখন আজাদির স্বপ্নে পুরো ভারতই উত্তাল। তাই ছেলের নাম, চৌধুরী রাখলেন আজাদ। আজাদকে তিনি যত্ন করেছেন অনেকটা আদেখলার মতো করে। সারাক্ষণ কপালে টিপ পরিয়ে রেখেছেন যেন কারো নজর না লাগে। মাজারে গিয়ে মানত করেছেন তার সুস্থতার জন্য। আজাদের কোনো অসুখবিসুখ হলে তিনি পাগলের মতো করতেন। তাঁরা পাকিস্তানে চলে আসার পরে তাঁর শাশুড়ি এসবকে বাড়াবাড়ি বলে সমালোচনা করতেন। কিন্তু তাঁর কীইবা করার ছিল। ছেলের অমঙ্গল আশঙ্কায় সর্বদা তাঁর মন কুপিত হয়ে থাকত। আজাদের পরেও তাঁর কোলে একটা বাচ্চা এসেছিল। সেও তো বাঁচে নাই। আজাদ তাঁর সর্বস্ব। তাকে বুকের মধ্যে আগলে না রেখে তিনি পারেন?

সেই ছেলে আজ কেমন ডাগরটি হয়েছে। মাশালা-স্বাস্থ্য-টাস্থ্য সুন্দর। ছেলের জন্য তিনি মেয়ে দেখে রেখেছেন। ছেলের বিয়ে দিতে পারলে তাঁর দায়িত্বপালন সম্পূর্ণ হয়। পুত্রপালনের দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায়

একা কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এই দায়িত্ব কঠিন। আজকে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত তিনি কী করে একা নেবেন? ছেলের বাবার সঙ্গে পরামর্শ করতে পারলে ভালো হতো। তা তিনি জীবন থাকতেও করবেন না। যে বাবা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েও স্থূল বাসনা থেকে নিজেকে নিরত রাখতে পারে না, সে আবার বাবা কিসের? সাফিয়া বেগম আজ সত্যি অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি।

কিন্তু দেশ যখন তাঁর ছেলেকে চাচ্ছে, তখন মা হয়ে কি তিনি ছেলেকে আটকে রাখতে পারেন? বলতে পারেন, আমার একটা মাত্র ছেলে, আর কেউ নাই ত্রিজগতে, আমার ছেলেকে ছাড় দাও। এই কথা বলার জন্য কি তিনি ইস্কাটনের বাসা ছেড়েছিলেন? এই সুবিধা নেওয়ার জন্যে? না। ওটা ছিল তাঁর নিজস্ব সংগ্রাম। আজকে দেশ অন্যায় শাসনে জর্জরিত। সাফিয়া বেগম যতটুকু বোঝেন, রেডিও শুনে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনে, ছেলেদের আলোচনা শুনে, বাসায় আগত লোকদের কথাবার্তা যতটুকু তার কানে আসে তা বিচার-বিশেষণ করে, আর পুলিশ সুবেদার খলিলের বয়ান শুনে, তাতে পাঞ্জাবিদের এই জুলুম মেনে নেওয়া যায় না, মেনে নেওয়া উচিত না। তিনি ছেলেকে মানুষ করেছেন কি নিজে ছেলের আয়-রোজগার আরাম করে ভোগ করবেন বলে! কক্ষনো নয়। এটা তিনি ছেলেকে চিঠিতেও লিখে জানিয়েছেন, ছেলেকে তিনি মানুষ করেছেন মানুষের যা কিছু কর্তব্য তাই করবে বলে। দেশ আর দশের কাজে লাগবে বলে।

অমঙ্গল-আশঙ্কায় আবার তাঁর বুক কেঁপে ওঠে, সমস্ত অন্তরাত্মা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যায়। যদি ছেলের কিছু হয়। তিনি কল্পনা করার চেষ্টা করেন, কেউ এসে তাঁকে খবর দিচ্ছে যে তার ছেলের গায়ে গুলি লেগেছে, না, তিনি কল্পনা করতে পারেন না, অশ্রুর প্লাবন এসে তাঁর দুচোখ আর সমস্ত ভাবনা ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

একজন কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু কার সঙ্গে! হঠাৎই মার মনে পড়ে যায় জুরাইনের পীর সাহেবের কথা। বড় হুজুর আর তাঁর স্ত্রী দুজনেই বড় ভালো মানুষ। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করলেই তো চলে।

মা সকালবেলা রওনা দেন জুরাইন মাজার শরিফ অভিমুখে। পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, ছেলে যুদ্ধে যেতে চায়, তিনি কি অনুমতি দেবেন।

পীর সাহেব বলেন, ছেলেকে যেতে দাও। পাকিস্তানীরা বড় অন্যায় করতেছে। জুলুম করতেছে। আর তাছাড়া, ছেলে বড় হলে তাকে আটকায়া রাখার চেষ্টা করে ফল নাই। তুমি না করলেও সে যুদ্ধে যাবেই।

মার মন থেকে সব দ্বিধা দূর হয়ে যায়। ফিরে এসে তিনি আজাদকে ডাকেন। বলেন, ঠিক আছে, তুই যুদ্ধে যেতে পারিস। আমার দোয়া থাকল।

ছেলে মার মুখের দিকে ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে থাকে। বোঝার চেষ্টা করে, মা কি অনুমতিটা রেগে দিচ্ছেন, নাকি আসলেই দিচ্ছেন।

'মা, তুমি কি অন্তর থেকে পারমিশন দিচ্ছ, নাকি রাগের মাথায়।'

'আরে রাগ করব ক্যান। দেশ স্বাধীন করতে হবে না?'

'থ্যাংক ইউ মা। আমি জানি তোমার মতো মা আর হয় না। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে একটা গান হয় না, আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী, ওগো মা... তুমি হলে সেই মা।'

৩৫

আজাদের সঙ্গে রুমীর দেখা হয়ে যায় ধানমন্ডির হাইড আউটেই। এটার কোড-নাম আটাশ নম্বর। ওটা একটা ওষুধ কোম্পানির ছেড়ে যাওয়া অফিস। এখানে থাকেন শাচৌ আর আলম। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা তখন একত্রিত হয়েছে। উলফত, হ্যারিস, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, কাজী কামাল, আলম আর রুমী। মেলাঘর থেকে নতুন অস্ত্র আসবে। আরো আরো বিস্ফোরক। ঢাকায় গেরিলাদের অভিযান এখন একটা নতুন মাত্রা পেয়েছে। ফার্মগেট অপারেশনের পর গেরিলাদের মনোবল এখন তুঙ্গে। তারা এখন বড় এটাকে যেতে চায়। যদিও শাহাদত চৌধুরী বার বার সাবধান করে জানিয়ে দিচ্ছেন ক্যাপ্টেন হায়দারের উক্তি, গেরিলারা কিন্তু পাকিস্তানী মিলিটারির সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ করবে না, তারা হঠাৎ আক্রমণ করবে, লুকিয়ে যাবে জনারণ্যে। স্মরণ করিয়ে দেন মেজর খালেদ মোশাররফের রণকৌশল, আক্রমণ হবে তিনদিক থেকে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সামরিক। কিন্তু গেরিলারা এখন সামরিক আক্রমণের জন্য অস্থির।

আজাদ আসে। শাচৌ-এর কথা শোনে। কে এই ক্যাপ্টেন হায়দার। দেখতে কেমন তিনি। শোনা যায়, দাড়ি ছিল, এখন ক্লিন শেভ্ড। প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে যায়। মেলাঘরে একবার যাওয়া দরকার। আর মেজর খালেদ মোশাররফ। দুই নম্বর সেক্টরের প্রধান। তাকে তো ছেলেরা একেবারে হিরোর মতো দেখে। কিংবদন্তী যেন তিনি। শাহাদত চৌধুরী তো বলেন, প্রথম দেখার দিনটায় ক্যাপ্টেন হায়দারকে তাঁর মনে হয়েছিল গ্রীক দেবতার মতো, বিকালবেলা তাঁকে প্রথম দেখে শাচৌ, জিপ থেকে নামছেন, পেছনে অস্তগামী সূর্যটা লাল আর গোল, সোনালি রঙের গ্রীক দেবতা নেমে এলেন...

শাচৌ অনেক কথা বলেন। বুঝিয়ে বলেন, ঢাকার যুদ্ধটা কনভেনশনাল যুদ্ধ নয়। এটা সাইকোলোজিক্যাল যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয় বা মাটি দখল উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো, মানুষের মনোবল অক্ষুণ্ন রাখা।

পরিবেশটা গম্ভীর। এখানে জুয়েল থাকলে ভালো হতো। এখনই একটা কৌতুক বলে পরিবেশটা জমিয়ে তুলতে পারত।

'এই আজাদ তুমি?'

একটা জুনিয়র ছেলে তাকে তুমি করে বলছে ব্যাপার কী! 'হ্যাঁ। তুমি?'

'চিনতে পারছ না। আশ্চর্য তো! আমি রুমী!'

'রুমী! এই তোমার কী চেহারা হয়েছে।'

'মেলাঘরে ট্রেনিং নিতে গেছলাম না। বোঝোই তো। আমার শরীরে কি ওই সব সহ্য হয়। এই, খালাম্মা কেমন আছেন?'

'আছেন ভালো। তোমার মা?'

'আছেন। মার সঙ্গে দেখা করতে বাসায় চলো। কাজী, জুয়েল ওরা থাকে তো মাঝেমধ্যে। আজকে আমার সঙ্গে চলো। তোমাকে একটা জিনিস দেব।'

'কী জিনিস?' রুমী জিজ্ঞেস করে।

'তুমি না গান ভালোবাসো। রেকর্ড শোনো। আমাদের বাসা থেকেও তো রেকর্ড ধার নিতা!

'হ্যাঁ। তো?'

'একটা গান দেব তোমাকে।'

'রেকর্ড!'

'না রেকর্ডটা পাই নাই। গানের লিরিকটা পেয়েছি। আমি কপি করে রেখেছি। তোমাকেও দেব এখন।'

'কোন্ গান বলো তো!'

'জর্জ হ্যারিসনের। কনসার্ট ফর বাংলা দেশ।'

'ও মাই গড। তুমি ওর রেকর্ড পেয়েছ?'

'রেকর্ড পাই নাই। জর্জ হ্যারিসনের গানের কপিটা পেয়েছি। বাংলা দেশ বাংলা দেশ।'

'চলো। এখনই যাই। শাহাদত ভাই, আমি একটু আজাদের বাসায় যেতে পারি!'

'কেন?'

'আগেই বলব না। আগে আনি, তারপরে আপনাদের সবাইকে দেব।'

'কী জিনিস?'

'জর্জ হ্যারিসনের গানের লিরিক। কনসার্ট ফর বাংলা দেশ।'

বলো কী! শাচৌ উত্তেজিত বোধ করেন।

শাচৌও খুব গান শোনেন। তবে গানের ব্যাপারে, সাহিত্যের ব্যাপারে তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না। তিনি মনে করেন, জনপ্রিয় জিনিস ভালো হয় না। তার ঝোঁক ক্লাসিকের দিকে। যুদ্ধ অবশ্য আস্তে আস্তে তার মনোভাব পাল্টে দিচ্ছে। জনরুচির প্রতি শ্রদ্ধা তার বাড়ছে। কনসার্ট ফর বাংলা দেশ সম্পর্কে তিনি জানেন। পহেলা আগস্ট এই কনসার্ট হয়েছে। আমেরিকায় মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে। জর্জ হ্যারিসন, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, বব ডিলান। এরিখ ক্লাপটন। একেকজন দিকপাল। এরা সবাই মিলে খোদ আমেরিকায় করেছে এই কনসার্ট। হাজার হাজার তরুণ-তরুণী অংশ নিয়েছে এই কনসার্টে। ভয়েস অফ আমেরিকা, বিবিসি, আকাশবাণী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-সর্বত্র ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে এই কনসার্টের খবর।

শাচৌ বলেন, এই একটা কপি করে আমাকেও দিও তো।

রুমী বেরিয়ে পড়ে আজাদের সঙ্গে। রিকশায় সহজেই চলে যাওয়া যায় মগবাজার। রেল লাইনের ধারে বাসাটা।

মাকে ডাকে আজাদ। মা দেখো। কাকে এনেছি।

মা মাথায় কাপড় দিতে দিতে এগিয়ে আসেন। কে?

রুমী সালাম দেয়। মা সালামের জবাব দেন। আজাদ বলে, রুমী।

রুমী বিস্মিত। খালাম্মার শরীর এতো খারাপ হয়ে গেল কীভাবে। শুকিয়ে গেছেন। শাদা শাড়িতে তাকে লাগছে বিধবার মতো। আর তাছাড়া আজাদরা এত বড় বাসা ছেড়ে এই ছোট বাসাতেই বা এল কীভাবে!

মা রুমীর জন্য নাশতা আনতে যান। রুমী আর আজাদকে তার ব্যক্তিগত বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করে না। বরং তার উৎসাহ জর্জ হ্যারিসনের বাংলাদেশ গানটা নিয়ে।

আজাদ একটা বইয়ের ভেতর থেকে একটা কাগজ বের করে। সেই কাগজে সে কপি করে রেখেছে গানটা। তাকেও সে কাগজকলম এগিয়ে দেয়। রুমী কপি করার আগে গানটা একবার পড়ে নেয়।

My friends came to me
With sadness in his eyes

(রুমী ভাবে, আজাদ কপি করতে একটু ভুল করেছে। ফ্রেন্ডস না হয়ে ফ্রেন্ড হলে তো গ্রামারটা ঠিক থাকে।)

He told me that he wanted help
Before his country dies
Although I couldn`t feel the pain
I knew I had to try

Now I am asking all of you
To help us save some lives
Bangla Desh, Bangla Desh

রুমী পড়ে। তার দুচোখে পানি এসে যায়। বলে, কতদূরে বসে একজন গায়ক বাংলাদেশের মানুষের জন্য ভাবছে, লিখছে, গান করছে, ফান্ড কালেক্ট করছে, মানুষ যখন মানুষের জন্য করে, তখন কেমন লাগে, না! সে কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়ে অনুলিপি করতে। আজাদও কপি করতে থাকে অন্য সহযোদ্ধাদের জন্য।

মা বলেন, আজাদ, চা হয়েছে।

আজাদ বলে, আসছি। সেও কপি করতে থাকে। শাচৌকে দিতে হবে, জুয়েল কাজী কামাল-ওরাও তো চাইবে এর কপি।

জাহানারা ইমাম ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন। বিকালবেলা। রুমী বলেছে, আম্মা চলো তোমাকে এক বাসায় নিয়ে যাই। তোমার মন একদম ভালো হয়ে যাবে।

'কোথায়?'

'আগে থেকে বলব না। সারপ্রাইজ।'

মগবাজার চৌমাথা থেকে তেজগাঁও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার দিকে একটু এগিয়েই রেললাইন পার হয়ে গাড়ি খানিক সামনে গিয়ে ডানে একটা গলিতে ঢোকে। আরো একটুখানি গিয়ে আবার ডানে ঢুকে থামে একটা একতলা বাড়ির সামনে। ৩৯ বড় মগবাজার। দুধাপ সিঁড়ি উঠেই ছোট্ট একটা বারান্দা-রেলিংঘেরা। এ কার বাসায় যে রুমী আনল তাকে-জাহানারা ইমাম ভাবেন। তিনি দেখতে পান, বারান্দায় চেয়ারে বসে আছে এক স্বাস্থ্যবান যুবক। উঠে দাঁড়িয়ে আদাব দেয় তাকে। রুমী বলে, 'মা এ হলো আজাদ। একে তুমি এর ছোটবেলায় অনেক দেখেছ। আগে আমরা এদের বাসায় আসতাম। দাওয়াত খেতাম।'

জাহানারা ইমাম আজাদের মুখের দিকে ভালো করে তাকান। কিন্তু মনে করতে পারেন না। তিনি বারান্দা পেরিয়ে ভেতরে যান। আজাদের মা তার সামনে আসেন। আরে এ যে সাফিয়া আপা। জাহানারা ইমাম উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। আজাদের মাকে জড়িয়ে ধরেন। বলেন, কতদিন পরে আপনার সাথে দেখা হলো বলেন তো দশবারো বছর তো হবেই।

আজাদের মা বলেন, তাই হবে।

জাহানারা ইমামের মনে পড়ে, তিনি শুনেছিলেন বটে যে আজাদের আব্বা আরেকটা বিয়ে করেছে। তাই রাগ করে আজাদের মা ছেলেকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেছেন।

আজাদের মা চা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। জাহানারা ইমাম বলেন, আপনি বসুন, আপনার সঙ্গে গল্প করি।

আজাদের মা হাঁক ছাড়েন, কচি, একটু শুনে যেও। খালাম্মাকে কী খাওয়াবে। তারপর জাহানারার দিকে চেয়ে বলেন, আমিও আজাদকে নিয়ে আলাদা হয়েছি, আমার বোনটাও মারা গেছে, ওর ছেলেমেয়েদের নিজের কাছে রেখেছি। মাঝখানে কয়েক বছর অনেক কষ্ট করেছি আপা। এখন তো মনে করেন আজাদ এমএ পাস করেছে। দেশের পরিস্থিতি ভালো হলে ব্যবসাপাতি করবে। এখন তো ভালোই আছি ইনশালাহ আপনাদের দোয়া।

জাহানারা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন সাফিয়ার দিকে। তাঁকে তাঁর বরাবরই মনে হয়েছে বাইরে নম্র মৃদুভাষিণী, আর ভেতরে ভেতরে দৃঢ়চেতা, কিন্তু তাই বলে এই মহিলা যে এতটা একরোখা, তাতো

তিনি আগে বোঝেন নাই। এখন আজাদের মা অনেক শুকিয়ে গেছেন। আগে তাঁর ছিল স্বাস্থ্য-সুখী কান্তি। এখন পরনে সরুপাড় শাদা শাড়ি, গায়ে কোনো গয়না নাই, আগে ছিল শরীরভরা গয়না, দামি শাড়ি, মুখে পান আর মৃদুহাসি, আঁচলে চাবি। কী কন্ট্রাস্ট।

তবে আজাদ ছেলেটাকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সুন্দর হয়েছে ছেলেটা, স্বাস্থ্যবান। মায়ের মতোই মুখে সবসময় হাসি লেগে আছে।

রুমী আর আজাদ অন্য ঘরে গল্প করছে। এরই মধ্যে আরেকজন ছেলে আসে। লম্বা। ফরসা। রুমী মাকে ওইঘরে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দেয় তার সঙ্গে, আম্মা এনাকে চেন। কাজী কামাল উদ্দিন। উনি প্রভিন্সিয়াল বাস্কেট টিমের খেলোয়াড়। ন্যাশনাল টিমেও ডাক পেয়েছিল। কাজী ভাই যায় নাই। ওনার সাথে আমার দেখা হয়েছে মেলাঘরে, ট্রেনিং ক্যাম্পে। এখানেও কাজী ভাইয়ের অনেক নাম। হিরোইক ফাইটার।

৩৬

আজকে আজাদের প্রথম অপারেশনে যাওয়া। দুপুরবেলা বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেভ করতে করতে আজাদ মাকে বলে, মা, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। আজকে রাতে ফিরব না।

মা বলেন, কোথায় যাচ্ছিস?

আজাদ বলে, যাব একদিকে। দোয়া করো। ইনশালাহ কালকে ফিরে আসব।

মা বলেন, একা যাবি?

আজাদ বলে, না। কাজী, জুয়েল ওরাও যাবে। মা, আর কিছু জিজ্ঞেস করো না।

মার বুকটা ধক করে ওঠে। শরীরটা অবশ অবশ লাগে। তিনি বুঝতে পারেন, ছেলে আজকে এমন কোথাও যাবে, যেটা ঠিক সে বলতে চায় না। তিনিও আর বাড়তি কিছু জিজ্ঞেস করেন না।

শেভ করা হয়ে গেলে ছেলের মুখের দিকে তিনি তাকান। ছেলের ফরসা গাল। শেভ করার পরে সবুজ হয়ে আছে। তিনি বলেন, ভাত খেয়ে যাবে তো?

আজাদ বলে, হুঁ।

মা তাড়াতাড়ি করে ভাত বাড়েন। আজকে তরকারি তেমন ভালো নয়। যুদ্ধের কারণে আজাদের ব্যবসাপাতি বন্ধ। ঘরে টানাটানি চলছে। বাজার তেমন করে আর করা হয় না। ছেলে তাঁর কী খেয়ে যাবে? তিনি তাড়াতাড়ি একটা ডিম ভাজতে চলে যান। তখন তাঁর মনে হয়, ছেলের পরীক্ষার দিনে তিনি তাকে কিছুতেই ডিম খেতে দিতেন না, দেখতেও দিতেন না। আজ ছেলে তাঁর যে অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, তাতে তো ডিম খেতে অসুবিধা নাই। নিশ্চয় নাই।

আজাদেরও মনের মধ্যে উত্তেজনা। উত্তেজনা বেশি হলে তার বারবার পেশাব পায়। সে এরই মধ্যে দুবার জলবিয়োগ করে এসেছে। সে কোনো দিকে তাকাচ্ছে না। ঘাড় না ঘুরিয়ে সামনে নাকের দিকে তাকিয়ে থাকছে। ব্যাপারটা আর কারো চোখে ধরা পড়ছে না বটে, মার চোখে ঠিকই পড়ছে। মা অবশ্য কিছুই বলছেন না।

আজাদের বাঁ চোখের পাতা লাফাতে শুরু করে দেয়। এটা কেন হচ্ছে? এর মানে কী?

আজাদ ভাত খেতে বসে। ভাতও সে খাচ্ছে মুখ নিচু করে। মা লক্ষ করেন, আজাদ ভাত মুখে নিয়ে চিবুচ্ছে না, গিলে ফেলছে, বার বার গেলাসে করে পানি খাচ্ছে। মা মুখটা হাসিহাসি করে বলেন, আস্তে আস্তে খাও বাবা, চিবিয়ে চিবিয়ে খাও। পানি পরে খেও।

ভাত খেয়ে উঠে আজাদ কাপড়চোপড় গোছাতে থাকে। একটা ছোট্ট হাত-ব্যাগে দুটো ঘরে পরার কাপড় নেয়। কাজটা করার সময় সেগুনগুন করে গান গাইতে থাকে, এলভিস প্রিসলির গান।

তারপর বোনদের ঘরে উঁকি দেয়। মহুয়ার একটা বাচ্চা হয়েছে। সে ঘরে যাওয়া যাবে কিনা, কে জানে। দরজায় দাঁড়িয়ে সে গানের আওয়াজ বাড়িয়ে দিয়ে তারপর গলা খাঁকারি দেয়। তারপর বলে, মহুয়া, শরীর ঠিক আছে?

'জি দাদা।'

'বাবুটা রাতে খুব কেঁদেছে মনে হলো?'

'জি দাদা। কী যে হইছিল।'

'কী রে কচি, তোর কী অবস্থা? রোজ দশটা করে অঙ্ক করতে বলেছিলাম, করিস?'

'জি দাদা।' কচি ভয়ে ভয়ে জবাব দেয়। দাদা যদি এখন খাতা আনতে বলে তাহলেই সে ধরা পড়ে যাবে।

দাদা তেমন কিছুই বলে না। সে বেঁচে যায়।

জায়েদ কই? আজাদ বলে।

মা বলেন, ওতো বাইরে গেছে।

আজাদ বলে, ওকে বেশি বাইরে যেতে মানা কোরো।

মা বলেন, ও তোকে মানে বেশি। তুই একদিন ভালো করে কড়া করে বুঝিয়ে বলিস।

আচ্ছা। আজাদ তার ঘরে আসে আবার। জর্জ হ্যারিসনের গান লেখা কাগজটা সঙ্গে নেয়। সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার ঠিক আছে কিনা পরখ করে। তারপর মার সামনে এসে মার মুখের দিকে তাকায়। এই প্রথম সে গত এক ঘণ্টায় মার মুখের দিকে তাকাল। ঠোঁটটা কামড়ে ধরে মুখে একটা ঝাঁকি দিয়ে সে বলে, যাই তাহলে।

মা বলেন, বাবা, যাই না, বলো আসি।

আজাদ বলে, আসি। দোয়া করো।

মা বলেন, সাবধানে থেকো। সাবধানে চলো। বিসমিলাহ করে বের হয়ো। বিপদে লা ইলাহা ইলা-আন্তা সোবহানাকা পড়ো। মাথা ঠাণ্ডা রেখো।

আজাদ একটা বড় শ্বাস টেনে নিয়ে বলে, ওকে ওকে।

সে আর পেছনে তাকায় না। সোজা বের হয়ে বেবিট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে যায়।

মা তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেন। ছেলে অদৃশ্য হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকেন তার চলে যাওয়ার দিকে।

কাজী কামালের নেতৃত্বে জনা দশেক মুক্তিযোদ্ধা যাচ্ছে সিদ্ধিরগঞ্জে পাওয়ার স্টেশন কীভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায়, সেটা সার্ভে করতে। মেজর খালেদ মোশাররফ কাজী কামালকে মেলাঘর থেকে অস্ত্রশস্ত্র আর লোকজন দিয়ে পাঠিয়েছেনই সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন উড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে। এটা করতে পারলে ঢাকা শহরের বেশির ভাগটা অন্ধকার হয়ে পড়বে। এর আগে দুবার যোদ্ধারা চেষ্টা করেছিল এটা উড়িয়ে দিতে, পারে নাই। এবার কাজী কামালের দল বেশ ভারি। দশজনের গ্রুপ নিয়ে সে ঢুকেছে ঢাকায়। একটা সাড়ে তিনইঞ্চি রকেট লাঞ্চারও আনা হয়েছে। ৮ টা রকেট শেল। ভীষণ ভারি।

রকেট লাঞ্চার চালানোর জন্যে আর্টিলারির গানার দেওয়া হয়েছে। তার নাম ল্যান্স নায়েক নুরুল ইসলাম। আর আছে কানা ইব্রাহিম। একচোখ কানা তার। কোনোভাবে যদি পাওয়ার স্টেশনের ভেতরে ঢোকা না যায়, বাজার থেকে শেল মারলে কী হয়! এই হলো মেলাঘরের পরামর্শ। অস্ত্রের মধ্যে আরো আছে দুটো এসএলআর, সঙ্গে আন্যার্গালাঞ্চার। প্রত্যেকের জন্য একটা করে স্টেনগান, চারটা ম্যাগজিন, দুটো গ্রেনেড আর অসংখ্য বুলেট।

আশ্বিন মাস। আকাশে মেঘ। তাই একটা গুমোট ভাব। সন্ধ্যার পরে বাড্ডার ওপারের পিরুলিয়া গ্রামের হাইড আউট থেকে দুটো নৌকাযোগে গেরিলারা রওনা হয় সিদ্ধিরগঞ্জের দিকে। বেরুনোর আগে আজাদ বুক-পকেট থেকে বের করে একবার দেখে নেয় জর্জ হ্যারিসনের গানের কপিটা। তারপর আবার সেটা রাখে যথাস্থানে। তারা দুটো নৌকায় ওঠে। নৌকা চলতে শুরু করলে বাতাস এসে গায়ে স্পর্শ রাখে, একটুখানি শীতল হয় শরীর। একটা নৌকায় বদি, কাজী, জুয়েল, আরো দুজন। আরেকটা নৌকায় আজাদ, জিয়া, ইব্রাহিম, রুমী। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। আজাদ উত্তেজিত। তার হাতে একটা স্টেনগান। বলা যায় না হয়তো আজই তার শত্রুর দিকে গুলি ছোড়ার উদ্বোধন হতে পারে। উত্তেজনা গোপন করতে সে গান ধরেছে, তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে। সামনের নৌকা থেকে তার গান শুনে জুয়েল বলে, ঢেউয়ের সাগর নারে, এটা আসলে ডোবা।

সামনে কাজী কামালদের নৌকা। সবাই যার যার স্টেনগান নৌকার পাটাতনে নামিয়ে রেখেছে। কারণ কেউ অস্ত্র দেখে ফেললে তাদের আসার উদ্দেশ্যই মাটি হয়ে যাবে। কিন্তু বদি কিছুতেই তার স্টেনগান নামিয়ে রাখবে না। সে রেখেছে তার কোলের ওপরে।

কাজী কামাল এই অপারেশনের কমান্ডার। সে বলে, বদি, স্টেনটা নামায়া রাখো।

বদি গম্ভীর গলায় বলে, 'আপনেরা নামায়া রাখছেন রাখেন। আমারে কন ক্যান। আর্মি আসলে কি বুড়া আঙুল টাইনা ইনডেক্স দিয়া গুলি করব?'

আজাদ বদির কথা শুনে অবাক। কাজী না এই অপারেশনের কমান্ডার। তার আদেশ কি বদির মেনে নেওয়া উচিত ছিল না।

দুই নৌকা ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে পাওয়ার স্টেশনের কাছাকাছি। সব নিস্তব্ধ। কেবল নৌকার ছলাত-ছলাত শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। ঘন অন্ধকার। আকাশে মেঘ থাকায় তারা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। আজাদের ব্যাপারটাকে বেশ রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে। নাজ বা গুলিস্তান সিনেমা হলে সে কত কত যুদ্ধ-চলচ্চিত্র দেখেছে। আজকে সে নিজেই এক যুদ্ধ-অভিযানের কুশীলব।

হঠাৎই সামনে একটা নৌকার মতো নড়তে দেখা যায়। কী নৌকা, কাদের নৌকা অন্ধকারে কিছু বোঝা যায় না। তবে তাদের মাঝি বাঙালি। সে হাঁক ছাড়ে, কে যায়!

আজাদ ভাবে, হয়তো কোনো সাধারণ নৌকা। বাঙালি কেউ যাচ্ছে। কাজী জবাব দেয়, সামনে যাই।

কাছে আসতেই দেখা যায় সর্বনাশ। ওই নৌকায় পাকিস্তানী মিলিটারি। একটা মুহূর্ত সময় শুধু। আজাদ এখন কী করবে। তার সামনে কাজীদের নৌকা। সে ফায়ার ওপেন করলে তো কাজীরা মারা পড়বে। তার নিজেকে দিশেহারা লাগে। বদি কারো নির্দেশের অপেক্ষা না করে স্টেন তুলে ব্রাশ ফায়ার করে। পুরা ম্যাগাজিন খালি করে দেয়। ওপাশ থেকেও গুলি বর্ষিত হয়। তবে তাতে এদের কারো তেমন ক্ষতি হয় না। কেবল বদি পানিতে পড়ে যায়। মিলিটারিদের নৌকা ডুবে যায় আর বেশির ভাগই গুলিবিদ্ধ হয়।

আজাদ এরই মধ্যে নৌকার পাটাতনে রাখা অস্ত্র তুলে নিয়েছে। ফায়ার করার জন্যে সে প্রস্তুত। কিন্তু কমান্ডারের অর্ডার ছাড়া ফায়ার করাটা উচিত হবে না। সে চিৎকার করে অর্ডার চায়, কাজী, কাজী...

কাজী তাড়াতাড়ি বলে, ডোন্ট ফায়ার, ডোন্ট ফায়ার।

আজাদ বলে, ওকে। ওকে।

কাজী বলে, এই ওই নৌকা এদিকে আনো। এইটা ফুটা হইয়া গেছে। পানি উঠতেছে। কাম শার্প।

ওটাও বোধ হয় ডুববে। আজাদদের নৌকা তাড়াতাড়ি সামনে যায়। ভাসন্ত বদিকে নৌকায় তোলা হয়। অন্যরাও নৌকা বদল করতে না করতেই প্রথম নৌকাটা ডুবে যায়।

একমাত্র নৌকাটি দ্রুত বাইতে বাইতে তারা ফিরে আসছে। জুয়েল বলে, আমার আঙুলে কী যেন হইছে রে। পেন্সিল টর্চ জ্বালিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখা যায়, ডান হাতের তিনটা আঙুল গুলিতে জখম। রক্তে জায়গাটা একাকার। মনে হয় গুলি আঙুল ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। তারা তাড়াতাড়ি করে ফিরে আসে পিরুলিয়া গ্রামে।

আজাদের শরীর কাঁপছে। উত্তেজনায়। জুয়েলের হাতে রক্ত দেখে সে বুঝতে পারে, তারা মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরছে।

রাত্রিবেলা পিরুলিয়া গ্রামের হাইড আউটে থাকে তারা। এটাও আজাদের জন্যে এক নতুন অভিজ্ঞতা। কাঁচা ঘর। প্রাকৃতিক শৌচাগার।

জুয়েলের দিকে তাকিয়ে আজাদের মায়া লাগতে শুরু করে। তার হাতের রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না। আহা বেচারা এরপরে ব্যাট করতে পারবে তো।

হ্যারিকেনের আলোয় জুয়েলের রক্তকে মনে হচ্ছে খয়েরি।

এই হ্যারিকেনের আলোতেই বদি একটা চটি বই মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। কী বই? আজাদ এগিয়ে যায়। দেখে আল বেয়ার কামু-র দি আউট সাইডার। বদিউল আলম স্ট্যান্ড-করা ছাত্র। তার পাঠরুচিতো ভালোই হবে। আজাদ ভাবে।

কাজী কামাল বেরিয়ে যায় ফার্স্ট এইডের জন্যে সরঞ্জাম জোগাড় করতে। আজাদ বলে, জুয়েল, ব্যথা করছে?

জুয়েল বলে, হেভি আরাম লাগতেছে। দেশের জন্যে রক্ত দেওয়াই হইল, আবার জানটাও রাখা হইল। কইয়া বেড়াইতে পারুম, দেশের জন্যে যুদ্ধ কইরা তাঁর আঙুল শহীদ হইছিল। হাহাহা।

আজাদ জুয়েলের কথায় হাসতে পারে না। বোঝাই যাচ্ছে তার খুবই ব্যথা লাগছে। সে ব্যথা ভোলার জন্যে রসিকতা করার চেষ্টা করছে।

কাজী কামাল তুলা আর ডেটল যোগাড় করে আনে। জুয়েলের হাতে ফার্স্ট এইড দেওয়া হয়।

৩৭

পরদিন সন্ধ্যাবেলা কাজী আর বদি জুয়েলকে নিয়ে আসে ডাঃ রশিদ উদ্দিরে চেম্বারে। কাজীর বন্ধু কুটু, তার বাবা ডাক্তার, তিনি আবার ডা. রশিদের বন্ধু। সেই সূত্রে তাদের আগমন রশিদ উদ্দিনের চেম্বারে।

কুটু বলে, আংকেল। ওর হাতটা একটু দেখতেন যদি...

'কী হয়েছে?'

ডাক্তারকে কি মিথ্যা বলা যায়? কাজী বলে, গুলি লাগছে।

রশিদ উদ্দিন বলেন, এহ। একেবারে থেতলে গেছে। হাড় ভেঙেছে কিনা, কে জানে! গুলি লাগল কী করে!

এই কেমন করে যেন লাগল আর কী! জুয়েল বলে।

ডা. রশিদ বলেন, আমার এখানে তো ওটি নাই। তোমরা এক কাজ করো। রাজারবাগে ডা. মতিনের ক্লিনিকে নিয়ে যাও। আমি আসছি।

রাজারবাগ! কাজী কামাল ঢোক গেলে। ওতো বিপজ্জনক জায়গা!

ডা. রশিদ উদ্দিন বুঝে ফেলেন। বলেন, ঠিক আছে। আমি আমার গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছি।

ডা. রশিদ তাঁর রেডক্রস চিহ্ন আঁকা গাড়িতে করে জুয়েলকে নিয়ে যান রাজারবাগে ডা. মতিনের ক্লিনিকে। ওখানে অপারেশন থিয়েটারে জুয়েলের হাতে তিনি ব্যান্ডেজ করে দেন। সেখান থেকে জুয়েলকে নিয়ে যাওয়া হয় দিলুরোডে হাবিবুল আলমের বাসায়। হাবিবুল আলমের তিনবোন জুয়েলের যত্নের ভার নেয়। বড়বোন আসমা তাকে ড্রেসিং করে দেয় নিয়মিত।

তবে ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসক ছিলেন ডা. আজিজুর রহমান। জুয়েলের হাতে আঙুলের অবস্থা খারাপ দেখে তাকে ডা. আজিজের এলিফ্যান্ট রোডের পলিক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

ডা. আজিজ আর তাঁর স্ত্রী ডা. সুলতানা জুয়েলের হাতের ব্যান্ডেজ খোলেন। আঙুলের অবস্থা দেখে আঁতকে ওঠেন। আজিজ বলেন, তিনটা আঙুল এক সঙ্গে ব্যান্ডেজ করেছে কেন! আর ব্যান্ডেজ এত বড়ই বা কেন। তিনি তিনটা আঙুল আলাদা আলাদা করে ব্যান্ডেজ করে দেন।

জুয়েল বলে, স্যার, দেশ স্বাধীন হলে আমি হব ন্যাশনাল ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন। আঙুল তিনটা রাইখেন।

মিটিং বসেছে ২৮ নম্বরের হাইড আউটে। শাচৌ, বদি, আলম, কাজী উপস্থিত সেখানে। সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কি ওড়ানো যাবে না? মেজর খালেদ মোশাররফ, ক্যাপ্টেন হায়দার-এরা খুবই চান যে ওটা উড়ে যাক। কিন্তু কীভাবে!

আলম বলে, ওখানে আর্মিরা যেভাবে বাঙ্কার করে পজিশন নিয়ে সব সময় এলার্ট থাকে, এটাক করে ওদেরকে সরানো যাবে না। তার চেয়ে গেরিলা ওয়ারফেয়ার করব গেরিলা কায়দায়। আমরা ওখানকার স্টাফদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। দুইজন কর্মচারীর সঙ্গে তো আমাদের যোগাযোগ আছেই। ওদেরকে ট্রেনিং দিয়ে ওদের হাতে এক্সপোসিভ পাঠিয়ে দিয়ে ওদের দ্বারাই ওগুলো বাস্ট করানো হবে।

আলম এক্সপেলাসিভের ব্যাপারটা খুব ভালো বোঝে। সে বলে যায়, এখন আশি নব্বই পাউন্ড পিকে (প্লাস্টিক এক্সপোসিভ) লাগবে। এতটা পিকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া যাবে কী করে?

অনেক আলোচনার পরে ঠিক হয়, পাওয়ার স্টেশনের ইঞ্জিনিয়ারের জিপের দরজার ভেতরের দিকের হার্ডবোর্ড কভার খুলে পিকে নিয়ে যাওয়া হবে। একবারে ৮/১০ পাউন্ড পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাবে।

যাক, সিদ্ধিরগঞ্জ বিষয়ে তবু একটা ফয়সালা হলো। কিন্তু বিশেষ ট্রেনিং নিয়ে এসে গেরিলারা কি শুধু বসে থাকবে? 'তা হবে না। চলো, একটা কিছু করি।' বদির উত্তেজনা সবচেয়ে বেশি।

কাজী কামাল বলে, খালি প্যাচাল না পাইড়া কিছু একটা একশন করি। হাতেপায়ে জং ধইরা যাইতেছে তো।

ঠিক হয়, তারা আবার বেরিয়ে পড়বে। এক সঙ্গে একই সময় দুটো গ্রুপে। একটা আলমের নেতৃত্বে। আরেকটা জিয়ার নেতৃত্বে। আলমের গ্রুপে থাকবে আলম, বদি, কাজী কামাল, রুমী আর স্বপন। দ্বিতীয় গ্রুপে হ্যারিস, মুখতার, জিয়া, আনু, চুলু-আর আজাদ।

বদি আর আলম মিলে ধানমণ্ডি থেকে হাইজাক করে একটা মাজদা গাড়ি। গাড়িটার কাগজপত্রে দেখা যায় গাড়ির মালিক মাহবুব আনাম। আর হ্যারিস আর মুখতার হাইজ্যাক করে ফিয়াট ৬০০ গাড়ি।

আজাদরা অপেক্ষা করছে ধানমণ্ডির হাইড আউটে। বদি আর আলম গেছে এক গ্রুপের জন্য গাড়ি হাইজাক করতে। হ্যারিস আর মুখতার গেছে তাদের গ্রুপের জন্য গাড়ি হাইজ্যাক করতে। বদি আর আলম চলে আসে আগে। তারা হাইজ্যাক করেছে একটা শাদা মাজদা। তাতে উঠে কাজী কামাল, রুমী, স্বপন বিদায় নেয়। আজাদ, আনু, চুলুভাই অপেক্ষা করছে হ্যারিস আর মুখতারের জন্য। হ্যারিস আর মুখতার আসে ফিয়াট ৬০০ গাড়ি নিয়ে। তাতে উঠে পড়ে আজাদরা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। রাস্তার লাইটগুলো জ্বলছে। হ্যারিসদের কাজ হলো রাজারবাগ পুলিশ লাইনের কাছে থাকা। আর আলমরা ধানমণ্ডি এলাকায় চিনা কূটনীতিকের বাসার সামনে প্রহরারত সৈন্যদের ওপরে হামলা করে ওদিকেই আরেকটা বাসায় শেখ মুজিব পরিবারকে নজর-বন্দি রাখা প্রহরারত পুলিশ আর সৈন্যদের ওপরে চড়াও হবে। তারপর এসে জিয়াদের সঙ্গে যোগ দেবে। তখন দুটো গ্রুপ এক সঙ্গে আরো কিছু অভিযান পরিচালনা করবে। বেরুনোর আগে শাচৌ যখন জানতে চেয়েছেন এই অপারেশনের নাম কী, তখন আলম বলেছে, এর নাম অপারেশন আননোন ডেসটিনেশন।

আজাদদের গাড়ি চালাচ্ছে হ্যারিস। সে গাড়ি নিয়ে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সামনে একটা চক্কর দেয়।

হ্যারিস বলে, কী করব। ইঞ্জিন গরম হয়ে যাচ্ছে। রেডিয়েটরে মনে হয় পানি নাই। মিটারে হট দেখাচ্ছে।

জিয়া বলে, কোথাও থেকে পানি নিলে হবে?

হ্যারিস বলে, হবে।

মুখতার বলে, শাহজাহানপুরে চলেন। আমার চেনা পানের দোকান আছে। ওখান থাইকা পানি নেওন যাইব।

হ্যারিস গাড়ি থামায় শাহাজানপুরে, মুখতারের দেখিয়ে দেওয়া পানের দোকানের সামনে। স্টেন হাতে সবাই নামে। এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা যায়।

আজাদ একটা পান কেনে। দোকানদার কিছুতেই দাম দেবে না। বলে, স্যার মুক্তি গো কাছ থাইকা দাম লই না। ইঞ্জিনে পানি ভরে নিয়ে ওরা আবার আসে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের গেটে। দুটো চক্কর দেয়। আরে, আলমদের কী হলো! ওরা আসে না কেন!

জিয়া বলে, চল, আমরা নিজেরাই একটা একশন করি। দারুল কাবাবের দিকে যাই।

কাকরাইলের মোড়ে আসতেই কয়েকজন বাঙালি পুলিশ বলে ওঠে, হল্ট। ওরা গাড়ি থামায়। জিয়া ঘাড় বাড়িয়ে বলে, সরেন তো। আমরা বাঙালি পুলিশ মারি না।

পুলিশও উঁকি দিয়ে দেখে, এদের হাতে যে অস্ত্র, তাতে বাড়াবাড়ি করা মানেই মৃত্যু। বলে, ওরে বাবা, মুক্তিবাহিনী। তারা সরে এসে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন তারা কিছুই দেখে নাই।

আজাদরা ময়মনসিংহ রোডে এসে পড়ে। চলে যায় দারুল কাবাবের দিকে। দারুল কাবাবের সামনে একটা আর্মির জিপ দাঁড় করানো। এটাকে মারা যায়। আজাদের হাত স্টেনগানে চলে যায়। জিয়া বলে, গাড়িটা ইউ টার্ন করে ঘুরিয়ে আন। তাহলে মগবাজার দিয়ে পালিয়ে যেতে সুবিধা হবে। হ্যারিস গাড়িটাকে ইউ টার্ন করে ঘুরিয়ে আনে খানিকটা দূরে গিয়ে। ফিরে এসে দেখা যায়, আর্মির জিপটা চলে গেছে।

তারা সোজা চলে আসে পিজি হাসপাতালের মোড়ে। সেখান থেকে এলিফ্যান্ট রোড হয়ে মিরপুর রোডে পড়তে যাবে। সামনে দেখা যায়, একটা আর্মির জিপ। হ্যারিস বলে, লেটস এটাক দি জিপ। জিয়া বলে, দাঁড়াও। পেছনে আলো নেভানো কতগুলো আর্মির ট্রাক আছে। মিরপুর রোডেও গাড়ি দাঁড় করিয়ে চেক হচ্ছে। হ্যারিস, গাড়ি ২ নম্বর দিয়ে সাত মসজিদ রোডে নাও।

আজকের অপারেশনেও কোনো গুলি করতে না পেরে আজাদ হতাশ। ২৮ নম্বরে তারা তাদের হাইড আউটে যায়।

২৮ নম্বরে পরে যখন সবাই মিলিত হয়, তখন জিয়ারা আলমদেরকে বকাবকি করে তাদের সঙ্গে তারা কেন রাজারবাগে যোগ দেয় নাই!

আলমরা তাদের অপারেশনের যে গল্প করে, তা শুনে আজাদের রোম খাড়া হয়ে যায়। এ যে সিনেমাকেও হার মানায়।

আলম বলে, আমি মাজদার ড্রাইভিং সিটে বসলাম। আমার এসএমজিটা দিলাম বদিকে। বদি আমার বাঁ পাশে ফ্রন্ট সিটে বসল। পেছনে বাঁয়ে কাজী, মধ্যখানে রুমী আর ডান দিকে স্বপন। ২৮ নম্বর থেকে বেরিয়ে মাঠের কাছে চাইনিজ ডিপোম্যাটের বাসার সামনে গেলাম। গিয়ে দেখি কোনো সেন্ট্রি নাই। ধানমণ্ডি ১৮ নম্বর রোডে পাকিস্তানী আর্মির হোমড়াচোমড়ার বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি ৭/৮ জন সেন্ট্রি রাইফেল কাঁধে, তাদের জনা দুয়েক দাঁড়িয়ে, বাকিরা বসে, সবাই গল্পগুজব হাসিঠাট্টায় মশগুল। আমি বললাম, 'ওকে ফ্রেন্ডস, জন্তুরা আমাদের হাতের নাগালে, আর ঠিক তিন মিনিট সময় আমাদের হাতে।'

সাত মসজিদ রোডে গিয়ে আমি গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম। এতে সুবিধাও হলো। আমাদের শত্রুরা আমাদের বাঁয়ে পড়ল। বদি আর কাজী তাদের বাঁয়ের জানালা ব্যবহার করতে পারবে। আমি স্বপন আর রুমীকে বললাম, তোমরা রাস্তা দ্যাখো। রুমী পেছনটা। স্বপন, সামনেরটা।

সেন্ট্রিদের খুব কাছে চলে আসলাম। মাজদার সুবিধা হলো শব্দ করে না। গাড়ি স্লো করে বললাম, ফায়ার। বদি পেট বরাবর, কাজী বুক বরাবর গুলির মালা রচনা করল তাদের স্টেন গান আর মেশিন গান দিয়ে। সৈন্যরা মুহূর্তে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কোনো প্রতিরোধ করার ফুরসত পেল না। রুমী বলল, লেটস কালেকট দ্য উইপন। আমি বললাম, মাথা খারাপ নাকি। প্রতিটা সেকেন্ড মূল্যবান। সেখান থেকে গাড়ি একটান দিয়ে চিনা ডিপোম্যাটের বাসভবনে আবার গিয়ে দাঁড়ালাম কিন্তু কোনো শিকার পেলাম না। স্বপন আর রুমী বলল, এটা কী, আমাদের তো শুটিং প্রাকটিসই হলো না। আমি আবার মিরপুর রোডে উঠলাম। যাচ্ছি নিউমার্কেটের দিকে। ৫ নম্বরের কাছে এসে দেখি, আর্মি চেক পোস্ট বসিয়েছে। দুটো ট্রাক আর একটা জিপ আমাদের দিকেই মুখ করে দাঁড়ানো। রাস্তায় দুজন সৈন্য শুয়ে পড়ে লাইট মেশিনগান নিয়ে পজিশন নিয়েছে। চারটা পাঁচটা গাড়ি দাঁড় করিয়ে আর্মি চেক করছে। ভয়ে আমার কলজে শুকিয়ে এল। এখন আর থামিয়ে গাড়ি ঘোরানোরও সময় নাই। একমাত্র উপায় ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়া। আমি বললাম, বাঁচার একমাত্র উপায় হলো আমরা গাড়ি না থামিয়ে বাঁয়ে চলে যাব। স্বপন, এলএমজি ম্যানকে সাবাড় করবা। বদি, কাজী, রাস্তার বামে দাঁড়ানো সৈন্যদের টার্গেট করবা। আমি গাড়ি বাঁয়ে ঘোরানোর সাথে সাথে ফায়ার করবা। আমি শুধু একবারই বলব, ফায়ার।

আমি গাড়ি স্লো করে দাঁড়ানো গাড়িগুলো কাটিয়ে সামনে চলে গেলাম। তিনজন সেন্ট্রি হাত উঁচিয়ে বলল, হল্ট। আমি হেডলাইট বন্ধ করে ডানদিকে যাবার ইনডিকেটর জ্বালালাম। ডানে ঘোরানোর একটু ভানও করলাম। সেন্ট্রি চিৎকার করে বলল, হারামজাদা, কিধার যাতা হ্যায়, রোকো, আমি এক্সেলেটরে চাপ দিয়ে গাড়ি বামে ৫ নম্বরের দিকে নিতে নিতে বললাম, ফায়ার, ফায়ার।

স্বপনের গুলি এলএমজিম্যানকে শেষ করে দিল নিশ্চয়। নইলে কোনো পাল্টা গুলি তো হলো না। একই সঙ্গে বদি আর কাজীর গুলি শেষ করে দিল বাঁয়ের সৈন্যদের। আমার ঘাড়ের মধ্যে স্বপনের ছোড়া গুলির খালি কার্তুজ এসে পড়ল। গরমে ঘাড়ে ফোস্কা পড়ে গেল। আমি গাড়ি নিয়ে গ্রীন রোডে পড়লাম। ইনডিকেটরে বাঁ দিক দেখিয়ে আমি গাড়ি ঘোরালাম ডানদিকে। মিরপুর রোডের দিকেই। হেডলাইট নেভানো। হঠাৎই রুমী বলল, লুক লুক দেয়ার ইজ আ জিপ, দি বাস্টার্ডস আর ট্রায়িং টু ফলোয়িং আস।

রুমীকে কোনো নির্দেশ দিতে হলো না। সে নিজেই স্টেনের বাট দিয়ে গাড়ির পেছনের কাচ ভেঙে ফেলল। তারপর স্টেন বাগিয়ে টার্গেট করল জিপের ড্রাইভারকে। তার টার্গেট, উরে ব্বাস। জিপটা গিয়ে একটা ল্যাম্প পোস্টের গায়ে ধাক্কা খেল। পেছনে তাকিয়ে রুমীরা দেখল আরো একটা জিপ দুটো ট্রাক গ্রীন রোড ধরে ফার্মগেটের দিকে যাচ্ছে। আমরা মিরপুর রোড ধরে এলিফ্যান্ট রোডের দিকে চলে আসলাম।

আজাদ আলমের মুখে সব শুনে তার বন্ধুদের সাফল্যে আর সাহসিকতায় মুগ্ধ। বলে, ইস, আমি যে কবে নিজ হাতে পাক আর্মি মারতে পারব। তোরা ভাই হেভি দেখাইতেছস।

৩৮

হাবিবুল আলমদের দিলু রোডের বাসাতেই জুয়েল আহত হবার পরের কটা দিন ধরে ছিল। ভালোই ছিল। হাবিব আলমের বাবা হাফিজুল আলম ইঞ্জিনিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের বেশ পছন্দই করেন। তিনি নিজেও তার হেরাল্ড ট্রাম্প গাড়িতে করে মুক্তিযোদ্ধাদের আনা-নেওয়া করেছেন। বাড়ির মেয়েরা, আসমা, রেশমা, শাহনাজ-এরাও একেকজন অস্ত্র-এক্সপার্টে পরিণত হয়েছে। রেশমা আর শাহনাজ অস্ত্রের ব্যারেল পরিষ্কার করা, ম্যাগাজিনে গুলি ভরার কাজ এমনভাবে করে যে মনে হয় এটাই তাদের প্রধান কাজ। শাহনাজ আবার শুধু ডান হাত দিয়েই অস্ত্র পরিষ্কার করার কাজটা করে। শাচৌ একবার তো জিজ্ঞেস করেই ফেলেন, তুমি শুধু ডান হাত লাগাচ্ছ কেন? পরে শাচৌ এ প্রশ্ন করার লজ্জা জুয়েলদের কাছে স্বীকার করেছিলেন। আসলে শাহনাজ যখন ছোট, তখন কেমন করে যেন ওর বাঁ হাতে চোট লাগে। ডাক্তাররা ঠিকভাবে হাতটা জোড়া লাগাতে পারেন নাই বলে ওর বাঁ হাতের আঙুলগুলো কাজ করে না। জুয়েল যখন তার জখম-হওয়া ডানহাত নিয়ে ওই বাসায় যায়, তখন শাহনাজ বলে, জুয়েলভাই, কী আর হবে, সবচেয়ে খারাপ হবে যদি আপনি আমার মতো একহাতি হয়ে যান। কিন্তু আমার দিকে দেখেন, আমি তো সব কাজই ঠিকমতো করছি। তবে আসমা এ কথা শুনে একটু মন খারাপ করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী আসমা। আলমের বন্ধুরা, ছোটবড় সবাই, তাকে ডাকে মেজপা বলে। কারণ সে আলমের মেজপা। সেপ্টেম্বরে যখন আসমা সীমান্ত অতিক্রম করে চলে গিয়ে সেক্টর টুর ফিল্ড হাসপাতালে যোগ দেবে, তখনও বড় ছোট সব সৈনিক ও যোদ্ধারা তাকে ডাকবে মেজপা বলে। সেই জুয়েলের হাত নিয়মিত ড্রেসিং করে দেয়।

জুয়েলের ভালো নাম আবদুল হালিম চৌধুরী। তার বাবা আব্দুল ওয়াজেদ চৌধুরী একাউন্টেন্ট পদে চাকরি করেন একটা বেসরকারি প্রাইভেট ফার্মে। জুয়েলেরা চার বোন আর তিন ভাই। এর মধ্যে বড় ভাই মারা গেছে ছোটবেলাতেই। জুয়েলই এখন বড়। ৬৯ সালে সে জগন্নাথ কলেজ থেকে বিএসসি পাস করেছে। এখন চাকরি করে সাত্তার গাস ওয়ার্কে এনালিস্ট কেমিস্ট হিসেবে। ইচ্ছা আছে, দেশ স্বাধীন হলে সে এই বিষয়ে ট্রেনিং নিতে বিদেশে যাবে। তবে তার আসল পরিচয় সে ক্রিকেটার। আজাদ বয়েজে খেলেছে। মোহামেডানে খেলেছে। নিউজিল্যান্ড টিমের বিরুদ্ধে খেলার জন্যে অল পাকিস্তান দলের

ক্যাম্পেও ডাক পেয়েছিল। চূড়ান্ত টিমে অবশ্য তার জায়গা হয় নাই। সে ট্রেনিং নিতে আগরতলা বর্ডার অতিক্রম করতে বাসা ছাড়ে ৩১ মে। বাসার কাউকে কিছু বলে যায় নাই। ফার্মগেট অপারেশনের পরে বাসার চারবোনের জন্য তার মধ্যে উদ্বেগ দেখা দেয়। এ কারণে তাদেরকে সে পাঠিয়ে দিয়েছে গ্রামের বাড়ি বিক্রমপুরে। এখন অবশ্য সে ঝাড়া হাত-পা। মাঝখানে ঝামেলা হলো নিজের ডান হাতের আঙুল জখম হওয়ায়। তার প্রধান চিন্তা, সে কি আর ক্রিকেট খেলতে পারবে? তবে মুখে সে এই কথা কাউকে বলে না। নিজেও হাসিমুখ করে থাকে। সঙ্গীদেরও হাসায়।

ড্রেসিং করার সময় জুয়েল যেন ব্যথা টের না পায়, সে জন্য আসমা জুয়েলের সঙ্গে নানা গল্প করে। এর মধ্যে একটা হলো ক্রিকেট। জুয়েল ঢাকা শহরের ব্যাটিং-এ তুফান বলে খ্যাত। সে ব্যাট করে ঝড়ের গতিতে। যতক্ষণ সে উইকেটে থাকে, ততক্ষণ রানের চাকা ঘোরে। শুধু ঘোরে না, বনবন করে ঘোরে।

আসমা জিজ্ঞেস করে, জুয়েল, রকিবুল হাসান তো অল পাকিস্তান টিমে চান্স পেয়েছে। তুমি পাবে না।

জুয়েল কিন্তু স্বভাবে জন্ম রসিক। আরে আমারে এইবার নিউজিল্যান্ডের এগেইনস্টে নিল না বলেই তো আমি অল পাকিস্তানই ভাইঙ্গা দিতেছি। দেশটা স্বাধীন হইলে আমরা বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম বানাব। এইটাতে আমি ঠিকই চান্স পাব, দেইখেন মেজপা।

আসমা বলে, তাতো পাবেই। পাকিস্তান টিমেও চান্স পেতে।

জুয়েল বলে, আরে আবার পাকিস্তান। পাকিস্তানকে বোল্ড কইরা দিতেছি। মিডল স্টাম্প আউট। উফ। ব্যথা লাগে তো।

আসমা পুরোনো তুলাটা সরিয়ে একটা পরিষ্কার তুলা নেয়। জুয়েলের ক্ষতস্থান মুছে দেয় ডেটল ভেজা তুলা দিয়ে। জুয়েলকে বলে, তোমার বাসা না টিকাটুলিতে। বেঙ্গল স্টুডিওর পাশে। নায়িকাদের দেখো না!

জুয়েল বলে, গেটের সামনে পাবলিকে ভিড় কইরা থাকে। একদিন দেখি আজিম সুজাতা ঢুকতেছে।

জুয়েল আজিম সুজাতার ঢোকার দৃশ্যটা মনে করতে না করতেই আসমার ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ হয়ে আসে।

তো জুয়েল দিলু রোডে ভালোই ছিল। কিন্তু ওখানে একা একা আটকে থাকাটা কতক্ষণ সম্ভব। একটু সিগারেট খাওয়া, একটু কার্ড খেলা-এসব করতে ইচ্ছা করে কিনা! আজাদদের বাসা এদিকে থেকে উত্তম।

২৯ আগস্ট ১৯৭১। আজকে বিকালবেলা আজাদদের বাসায় জুয়েল, কাজী কামাল, বাকি, হ্যারিস-সবাই এক সাথে এসেছে। বাকি অনেক্ষণ ছিল, রাত আটটার দিকে চলে গেছে। হ্যারিস অবশ্য চলে গেছে খানিকক্ষণ পরেই। বিকালেই জায়েদ একবার ঢোকে আজাদের ঘরে, আড্ডার মধ্যে রসভঙ্গ করে বলে, দাদা, কামরুজ্জামানরে চিনো না। ওই বেটা তো আর্মির দালাল। আজকা কিন্তু খানিক আগে ওই বেটা আইসা বাসার সামনে থাইকা ঘুইরা গেছে। আমার কেমুন সন্দেহ হয়। আইজকা রাইতে এই বাসায় থাকাটা নিরাপদ না।

'আরে রাখ তো। কামরুজ্জামান। কামরুজ্জামানরে কামান বানায়া দেব। কত কামরুজ্জামান আসলো গেল। ওই এমনি ঘোরে। ইস্কাটনের বাসায় তো কাজ করে।' আজাদ পাত্তাই দেয় না জায়েদের কথায়।

'আরে না। ওই বেটা আর্মির ইনফর্মার। সবাই জানে।' জায়েদ ঘাড় গোঁজ করে বলে।

'তরে কইছে সবাই জানে। আজাইরা কথা বলিস না তো ভাগ।' আজাদ তাকে হাত নেড়ে কেটে পড়ার সংকেত দেয়। জায়েদ বেরিয়ে যায়।

ওই সময় আড্ডা জমে উঠেছিল খুব।

আজাদ বলে, কাজী, শাহাদত ভাই মেলাঘরে গেছে না?

কাজী কামাল বলে, গেছে। আলমও সাথে গেছে।

'মেজর খালেদ মোশাররফ আর ক্যাপ্টেন হায়দার যখন জিজ্ঞেস করবে, সিদ্ধিরগঞ্জে কী করলা, কী জবাব দেবে!' আজাদ ফোঁড়ন কাটে।

'আছে জবাব আছে। সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের ব্যাপারে একটা প্লান করা হইছে। ওই স্টেশনের দুই কর্মচারী ইব্রাহিম আর শামসুল হককে ট্রেনিং দেওয়া হইতেছে। ট্রেনিং চলতেছে ধানমণ্ডি দুই নম্বরের একটা আর্ট গ্যালারিতে। চিনছ তো বাসাটা। ভাস্কর আব্দুলাহ খালিদের। উনি একটা রুম দিছে। ট্রেনিং চলতেছে। এই ধরো টাইম পেন্সিল ব্যবহার করা। পিকে ফিট করা। এইসব। একদিকে খালিদ মূর্তি বানায়, খটখট আওয়াজ হয়, আরেকদিকে ট্রেনিং চলে। কেউ বুঝব না।' কাজী কামাল জবাব দেয়।

জুয়েল বলে, ওই দুইজনকে তো তোরা খরচের খাতায় ধইরা রাখছস। যদি পাওয়ার স্টেশন উড়ে তাইলেও অগো পাকিস্তানী আর্মি ছাড়ব না।

কাজী কামাল বলে, অরাও জাইনা শুইনাই আইছে। সাহস আছে। তবে অগো ঢাকার কোনো হাইড আউট কোনো গেরিলার নাম-ঠিকানা জানানো হয় নাই। কওয়া যায় না, সাবধানের মাইর নাই।

আজাদ বলে, তাইলে তো তোর মুখরক্ষা।

কাজী কামাল বলে, ক্যান। ঢাকা শহরটা যে কাঁপায়া দিলাম, মাউড়াগুলানের যে হাঁটু কাঁপা রোগ শুরু হইছে, তার কী হইব। এইটার একটা এপ্রিসিয়েশন দিবে না!

তা অবশ্য দেওয়াই উচিত। ঢাকার চারটা পাওয়ার স্টেশনের দুটো উড়ে গেছে। আলমের দল পিজির পাশে এলিফ্যান্ট রোডের স্টেশন ওড়াতে গিয়ে কাউন্টার এটাকে পড়ে গিয়ে লড়াই করে বেরিয়ে আসে। পাওয়ার স্টেশন ওড়ানোর পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেও খালেদ মোশাররফ সবচেয়ে খুশি হন এটার জন্যেই। কারণ পৃথিবীর বহু কাগজে বাংলাদেশ খবর হয়ে আসেঃ ঢাকায় গেরিলারা স্ট্রিট ফাইটে নেমে পড়েছে। এ ছাড়া স্ট্রিট ফাইট হয়েছে গ্রীন রোডে, উড়ে গেছে ফার্ম গেটের আর্মি ক্যাম্প। আজিজের দল গ্রীন রোডে উড়ে দিয়েছে আর্মি বহর। ঢাকার ছেলেরা এখন তুচ্ছ মনে করছে সবকিছুকে। ঢাকাবাসীর মনোবল ফিরে এসেছে। ভয়টা এখন পাকিস্তানী আর্মির। এসব খবর তো খালেদ মোশাররফের অজানা নয়।

এখন রাত আটটার পরে জমে উঠেছে তাস খেলা। আজাদ, জুয়েল, কাজী কামাল আর সেকেন্দার। জয়েন সেক্রেটারির ছেলে সেকেন্দার এসেছিল টিভি দেখতে। তাসের টানে সে বসে পড়েছে।

মর্নিং নিউজের রিপোর্টার বাশার আসে রাত ৯টার পরে। এসেই এই ঘরে উঁকি দেয়। কী ভাই, কেমন চলছে।

জুয়েল বলে, বাশার, তোমাদের মর্নিং নিউজ ফিউজ হইয়া গেছে। বাল্বটা বদলাও।

বাশার শার্ট খুলতে খুলতে বলে, বুঝলাম না।

জুয়েল বলে, তোমরা তো রাজাকারেরও অধম হইয়া গেছ। এত মিথ্যা কথা লেখো কেমনে!

বাসার বলে, পিছন দিয়া বন্দুকের নলা ঢুকায়া দিলে মুখ দিয়া আপনি যা চাইবেন তাই বাইর করতে পারবেন।

জুয়েল বলে, মর্নিং নিউজরে একটু নাইট নিউজ বানাইয়া দিতে হইব। দুইটা পাইন এপেল গড়ায়া দিলেই তো বোঝা যাইব পেন ইজ মাইটার দ্যান সোর্ড, উইকার দ্যান গান।

পাইন এপেল মানে কী? বাশার কও তো! আজাদ বলে।

আনারস যে না এটা বুঝি। বাশার উত্তর দেয়।

কাজী কামাল কোনো কথা বলছে না। সে একমনে তার হাতে পাওয়া তাসগুলো পর্যবেক্ষণ করে ক্রমানুসারে সাজিয়ে নিচ্ছে।

জুয়েলের ডানহাতে ব্যান্ডেজ। অন্য হাত দিয়েই সে চমৎকার তাস বাটতে পারে, ধরতে পারে।

আজাদ বলে, তুই তো জুয়েল একটা জিনিয়াস। ওয়ান্ডারফুল বয়। একহাতে কেমনে শাফল করতেছস!

জুয়েল বলে, আরে আমি তো ভাবতেছি একহাতে ব্যাট চালাব।

তখন ঘরে নীরবতা নেমে আসে। এত ভালো একটা ক্রিকেটারের তিনটা আঙুল মোটামুটি থেতলে গেছে। সে কি আর এ জীবনে ক্রিকেট খেলতে পারবে!

জায়েদ আসে ঘরে। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরে ঢোকা মুশকিল। বলে, দাদা, ওঠেন। খেলায় বিরতি দেন। আম্মা ভাত নিয়া বইসা আছে।

আজাদ বলে, আরেক দান। এই তোরা খেয়েছিস?

জায়েদ বলে, খাইছি।

আজাদ বলে, টগর, চঞ্চল, কচি, মহুয়া, টিসু-সবাই খেয়েছে?

'হ।'

'তোর দুলাভাই খেয়েছে?'

'জি খাইছে।'

তারা আরেক দানের নাম করে তিনদান খেলে ফেলে। তখন ও ঘর থেকে মার গলা ভেসে আসে, আজাদ, খাবে না তোমরা?

আজাদ বলে, মা ডাকতেছে। এইবার উঠতেই হয়। এই ওঠো।

খাবার টেবিলটা ছোট। এক সঙ্গে ছয়জনের বেশি বসা যায় না। বড় টেবিল যে ফেলা হবে, তার জায়গাই বা কোথায়! বাসাটাই তো ছোট। আগে, ইস্কাটনের বাসায় তাদের ডাইনিং টেবিলে এক সঙ্গে ১০ জন বসতে পারত। সেসব দিনের জন্যে সাফিয়ার মনে কি একটা ছোট্ট গোপন আফসোস রয়ে গেছে! সাফিয়া তা স্বীকার করবেন না। যুদ্ধ বেধে যাবার পরে আজাদও আর টাকাপয়সা দিতে পারছে না। গয়না বিক্রি করতে হচ্ছে। এখন ঘরের আত্মীয়-স্বজন বাদ দিয়েও বাসায় রোজই আজাদের বন্ধুবান্ধব ভিড় করে থাকে। তারা খায়-দায়। গাদাগাদি করে এখানেই শোয়। আজাদের মার এটাই ভালো লাগে। লোকজন খাওয়ানোটা তাঁর প্রিয় একটা শখ। আর নিজের ছেলের বন্ধুবান্ধবদের তদারকি করতে পারা, আদর-যত্ন করতে পারাটায় এক ধরনের তৃপ্তি পাওয়া যায়। কলজের মধ্যে এক ধরনের আরাম লাগে।

টেবিলে পেট বিছিয়ে ভাত-তরকারি বেড়ে তিনি অপেক্ষা করছেন। জুয়েল, আজাদ, কাজী কামাল, সেকেন্দার আসে। বেসিনের কলটা নষ্ট। তিনি একটা গামলা দিয়েছেন টেবিলে। বলেন, সবাই গামলায় হাত ধুয়ে নাও। তিনি পানি এগিয়ে দেন। গামলাটা একজনের সামনে থেকে নিয়ে ধরেন আরেকজনের সামনে। শুধু জুয়েলের হাত ধোওয়ার দরকার পড়ে না। তার ডানহাতের তিন আঙুলে ব্যান্ডেজ। সে বাকি দুআঙুলে চামচ দিয়ে তুলে খাবে। মা বলেন, 'বাশার কই বাশার। তুমিও আসো। খেয়ে নাও। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর ভালো লাগবে না।' বাশার আসে।

কী হয়? টিভিতে শাহনাজ বেগমের গান হয় নাকি! আজাদ বাশারকে খেপানোর চেষ্টা করে।

রান্না হয়েছে গরুর মাংস, আলু ভর্তা, পটল ভাজা, লাউ শাক আর ডাল।

এত অল্প তরকারি দিয়ে ভাত দিতেও সাফিয়ার লজ্জা লজ্জা লাগে। কিন্তু কিছুই করার নাই। একে তো আয় বুঝে ব্যয় করতে হয়, তার ওপর মাছ খাওয়া বন্ধ। দেশের সব নদীতে এখন শুধু মানুষের লাশ

ভাসে। মানুষের লাশ ঠুকরে খেয়ে খেয়ে মাছগুলো হচ্ছেও বেশ নধরকান্তি। মাছ খেলে কলেরা না হয়েই যায় না। তাই মাছ-খাওয়া সবাই বন্ধ করে দিয়েছে।

সবাই খেতে বসেছে। জুয়েল ছেলেটা সব সময় রসিকতা করতে পছন্দ করে। সে বলে, খালাম্মা, আপনি নিজে রানছেন!

'হ্যাঁ বাবা।'

'আর কতদিন কষ্ট করবেন খালাম্মা। আজাদরে একটা বিয়াশাদী দেন। বউয়ের হাতের সেবাযত্ন খান।'

'দ্যাখো তোমরা পাত্রী দ্যাখো। বিয়ে তো দিতেই হবে।' মা যে একটা মেয়ে ঠিক করে রেখেছেন, এটা আর বলেন না।

'তা খালাম্মা যৌতুক হিসাবে কী নিবেন! ডিম্যান্ড কী!'

'নানা। ছেলে বিক্রি করতে পারব না।'

'না। এই যুদ্ধের বাজারে এই কথা কইবেনই না। আপনার ডিম্যান্ড না থাকতে পারে। আমাদের আছে। ছেলেকে একটা অন্তত এলএমজি আর চারটা ম্যাগাজিন আর ২০০০ রাউন্ড গুলি দিতে হইব।'

বাশার বলে, একেবারে ট্যাঙ্ক ডিম্যান্ড করো। ট্যাঙ্ক চাইলে পিস্তল পেতেও পারো।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাই ওঠে। মা গামছা পর্যন্ত এগিয়ে দেন।

তারা সবাই আবার আজাদের ঘরে গিয়ে ঢোকে। মা বলেন, 'পানের অভ্যাস থাকলে বলো। পান দিতে পারি।'

বাশার বলে, দ্যান। যার লাগে, সে খাবে।

তারা ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে আবার আজাদের ঘরে আসে।

বাশার বলে, ঘরে সিগারেট আছে? রাতে লাগবে না? আজাদ চলো, সিগারেট আনি!

আজাদ বলে, জায়েদরে দিয়া আনাই।

বাসার বলে, আরে চলো না। তোমার সাথে কথা আছে।

আজাদ আর বাসার ঘর থেকে বের হয়। এরই মধ্যে রাস্তাঘাট সব ফাঁকা হয়ে পড়েছে। হওয়ারই কথা। গেরিলারা প্রায় প্রতিদিনই ঢাকার নানা জায়গায় নানা অপারেশন চালাচ্ছে। গাড়ির চাকার নিচে ছোট ছোট মাইন পুঁতে গাড়ির চাকা সশব্দে বাস্ট করা থেকে শুরু করে একেবারে সুসজ্জিত আর্মি শিবিরে হামলা করা পর্যন্ত। আর মিলিটারিও হয়ে পড়েছে পাগলা কুকুরের মতো। কখন যে কাকে ধরে নিয়ে যাবে, তার ঠিক নাই। তার ওপর কারফিউ।

বাশার বলে, শোন মিলি নাকি দেশে ফিরেছে।

মিলির কথায় আজাদের বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। হাত-পা অবশ হয়ে যায়। সে অতি কষ্টে স্বাভাবিক থাকার ভঙ্গি করে বলে, তাতে আমার কী!

'আছে। তোমারও কিছু আছে। মিলির আসলে বিয়ে হয় নি। তোমার কাছ থেকে দূরে রাখার জন্য মিথ্যা কথা বলেছিল।'

'বলো কী!'

'দেশে এসেছে।' বাশার একটু ভাবগম্ভীর হবার চেষ্টা করে।

'তুমি কেমন করে জানলা!'

'জানলাম। খবরের কাগজে চাকরি করি। সব খবরই রাখতে হয়। তবে আরেকটা অসমর্থিত সূত্রের খবর, মিলির ডিভোর্স হয়ে গেছে।'

'তার মানে বিয়া হয়েছিল।'

'হ্যাঁ। তার ইচ্ছার এগেইনস্টে।'

'তুমি এটা কী শোনাচ্ছ। আমার তো হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে আসতেছে। বাট আই জাস্ট ক্যাননট বিলিভ দিস নিউজ এটঅল।'

'ওকে। উই ক্যান চেক ইট।'

'পুরানা পল্টনে বাসা। চেক তো করাই যায়। তুমি যাবা। তোমার সাথে তো আর কোনো সমস্যা নাই।'

'ঠিক আছে যাব।'

'তুমি আমারটা খোঁজখবর করো। আমি তোমারটা দেখতেছি। তোমাকে আর কষ্ট করে পাত্রী খুঁজতে হবে না। পাত্রী আমাদের বাসা থেকেই বের করে ফেলব।'

বাশার লজ্জা পায়। গলির ভেতরে একটা হোটেলের মধ্যে একটা মাত্র দোকান আছে। দোকানটা বাইরে থেকে বন্ধই থাকে। তবে টুকটুক করে টোকা দিলে একটা ছোট্ট জানালা খুলে যায়। টাকা দিলে সিগারেট বেরয়। এখানেই কেবল রাত্রিবেলা সিগারেট পাওয়া যায়। বেনসন এন্ড হেজেস-এর প্যাকেট কেনে আজাদ।

সিগারেট জ্বালিয়ে টানতে টানতে ফিরে আসে। রাস্তায় শুধু কুকুর। গলির মুখটা অন্ধকার। আকাশে পোয়াখানেক চাঁদও দেখা যাচ্ছে। নিজেকে কেমন তুচ্ছ, সামান্য লাগে আজাদের। সে আরো জোরে সিগারেটে টান দেয়। মনে হচ্ছে সিগারেটের মুখের আগুনটুকুকে সে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিতে চায়। অন্ধকারে প্রতিটা টানে তার মুখে লাল আভা পড়ে।

মহুয়া, কচি, টিসু, আজাদের তিন খালাত বোন, আর আজাদের মা এক ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে বালিকা কচির ঘুম ভেঙে যায় কিসের যেন শব্দে। সে দেখতে পায়, ঘরে আলো। আর আলোর মধ্যে সে দেখতে পায়, চোখে সুরমা, ফরসা যেন চাঁদের আলো দিয়ে তার দেহ গড়া, লম্বা, স্বাস্থ্যবান এক যুবক, যেন রাজপুত্র, বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। সে মহুয়াকে ধাক্কা দেয়, বলে, বুজি দ্যাখো, কী সুন্দর, সে বুঝতে পারে না সে স্বপ্ন দেখছে নাকি এই দৃশ্য বাস্তবে ঘটছে, মহুয়ার ঘুম ভেঙে যায়, সে ঘরের মধ্যে মিলিটারি দেখে ভয়ে কুঁকড়ে যায় আর কচির মুখ চেপে ধরে।

তারও আগে নিঃশব্দ আততায়ীর মতো পাকিস্তানী সৈন্য এসে ৩৯ মগবাজারের বাসাটা, হাজি মনিরুদ্দিন ভিলা, ঘিরে ফেলে। তারা দরজায় সজোরে ধাক্কা দিতে থাকে। তখন আজাদের ঘরে জুয়েল বিছানায় শোয়া। কাজী কামালের পিস্তলটা, যেটা মেজর নুরুল ইসলাম শিশু তাকে দিয়েছিল, জুয়েলের কাছে। এটার প্রতি তার লোভ ছিল। বিকালেই কাজী কামাল বলেছে, থাকুক পিস্তলটা তোর কাছেই থাকুক। সেটাকে সে বিছানার ওপরেই রেখে শুয়েছিল। নিচে পাটিতে বসে তাস খেলছে কাজী কামাল, আজাদ, সেকেন্দার আর বাশার। আজাদের খালাত ভাইরা, জায়েদ, চঞ্চল, কচি আর খালাত দুলাভাই মনোয়ার হোসেন শুয়েছে আরেক ঘরে। দরজায় আঘাতটা বেড়েই চলেছে। আজাদরা তখন হতচকিত। জায়েদের ঘুম ভেঙে যায়। সে ভাবে, শব্দ হয় কেন? মাথা তুলে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে দাদাদের রুমে এখনও আলো জ্বলছে। দরজায় আবার প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা। জায়েদ বিছানা ছাড়ে। দাদারা জেগে আছে, দরজা খোলে না কেন? উঠে জানালার পর্দাটা ফাঁক করে জায়েদ, তখন বয়স ১৭-র মতো, বাইরে তাকায়, দেখতে পায়, সাক্ষাৎ সর্বনাশ বাইরে দাঁড়িয়ে। জায়েদ কী করবে বুঝতে পারে না। পাশের ঘরে যায়, দেখে আম্মা সবাইকে নিয়ে কই লুকাবেন কী করবেন বুঝতে পারছেন না। আর জুয়েলের পিস্তলটা আলুর বস্তার পেছনে ফেলা হচ্ছে। জায়েদের একটা গোপন দরজা আছে, মেথরদের আসার চোরা রাস্তা। ওই রাস্তা দিয়ে সে অনেকবার অস্ত্র নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে আলমদের দিলুরোডের বাড়িতে। ওই দরজা খুলে

হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে সে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সামনে যমদূতের মতো খাড়া হয়ে আছে পাকিস্তানী আর্মি। হ্যান্ডস আপ। জায়েদ হাত উঁচু করে। দরজা খোলা পেয়ে জায়েদকে বন্দুকের মুখে ঠেলে ভেতরে নিয়ে আসে সৈন্যরা। এসে সামনের দরজা খুলে দেয়। একে একে ঢুকে যায় বেশ কজন। একজন কমান্ডো ধরনের। বোঝা যায় অফিসার, কিন্তু তার ব্যাজ নাই। একজনের বুকে লেখাঃ ক্যাপ্টেন বুখারি। ক্যাপ্টেন বুখারির হাতে স্টেন গান।

এসেই বলে, আজাদ কোন হ্যায়।

কেউ স্বীকার করে না।

আজাদকে ওরা জিজ্ঞাসা করে, তুমারা নাম কিয়া?

আজাদ বলে, মাগফার আহমেদ চৌধুরী হ্যায়।

কম্যান্ডো ধরনের লোকটা বলে, তুম আজাদ হ্যায়।

মে আজাদ নেহি হ্যায়।

শালা মাদারচোত, তুম নাম কিউ নিদানা হ্যায়। সে আজাদের ঘাড়ে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুসি মারে।

ইতিমধ্যে অন্যঘর থেকে টগর, চঞ্চল, মনোয়ারকেও এনে একপাশে লাইনে দাঁড় করানো হয়েছে। মোট সাতজন বাঙালি বিভিন্ন বয়সের পুরুষ এখানে বলির পাঁঠার মতো লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, কাজী কামাল খেয়াল করে। আজাদ, জুয়েল, বাশার, সেকেন্দার, জায়েদ, টগর, চঞ্চল। তার মনে হয়, তাকে ল্যান্স নায়েক নুরুল ইসলাম সব সময় বলেছে, স্যার দুইজন সেন্ট্রি দাঁড় করায়া রাখেন। এইভাবে সেন্ট্রি ছাড়া আপনারা থাকেন। কোনদিন জানি বিপদে পড়েন। ইস দুইজন গার্ড যদি বাইরে দাঁড় করানো থাকত, পজিশন নেওয়ার সময় পেলে ওদের গুলি করেই উড়িয়ে দেওয়া যেত। এভাবে বিনা চ্যালেঞ্জে মরতে হতো না।

আর্মস কিধার হ্যায়? বুখারি নির্দেশ দিচ্ছেন। স্টিলের একটা আলমারি আছে ঘরে। আজাদের মা আঁচল থেকে চাবি খুলে দিলে একজন সৈন্য আলমারি খোলে। সবাই আগ্রহ ভরে অস্ত্র খুঁজছে।

হঠাৎই ক্যাপ্টেন বুখারি লক্ষ্য করে, একটা ছেলের হাতের আঙুলে ব্যান্ডেজ দেখা যায়। সে জুয়েলের জখমি জায়গাটা চেপে ধর বলে, বাস্টার্ড হয়ার আর দি আর্মস?

ব্যথায় জুয়েল ও মাগো বলে কঁকিয়ে ওঠে। কাজী কামালের মাথায় রক্ত উঠে যায়। সে নিজের ডান হাতের দিকে তাকিয়ে দেখে, আয়ুরেখা বড় আর স্পষ্ট। তার মানে এখানে তার মরণ নাই। সে হঠাৎই মেজরের হাতের স্টেনগানটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাতে স্টেন ধরে ফেলে। মুহূর্তের মধ্যে এ কাণ্ড ঘটে যায়। স্টেনের দখল কে নেবে এই নিয়ে টানাটানি হতে থাকে। ট্রিগারে কাজীর হাতে। গুলি বেরুতে থাকে। কাজীর পরনে ছিল শুধু একটা লুঙ্গি। ধস্তাধস্তিতে তার লুঙ্গি খুলে যায়। ক্যাপ্টেন আর কাজী দুজনেই খাটে পড়ে গেলে খাট ভেঙে পড়ে যায় মেঝেতে। ক্যাপ্টেন আহত হয়ে মেঝেতে গড়ায়। স্টিলের আলমারির সামনের সৈন্যটা গুলিবিদ্ধ হয় আর পড়ে যায়। ওপাশে ব্যাজহীন অফিসারটা ফায়ার ওপেন করলে জায়েদ আর টগর গুলিবিদ্ধ হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। কাজী জানে এখানে ধরা পড়ার মানে হলো মৃত্যু। সে সোজা খোলা দরজা দিয়ে বাইরে আসে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ কাজী গেট দিয়ে বাইরে যায়। বাইরে বাউন্ডারি দেওয়ালের কাছে দুপাশে দুজন সৈন্য দাঁড়িয়ে। চাঁদের আলোয় এক নগ্ন লম্বা ফরসা যুবককে দেখে তারা মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত হয় হয়তো। নইলে কেন তারা তাকে চার্জ করে নাই, ১৪ বছর পরেও কাজী সেটা অনুমান করতে পারে না। কাজী এক দৌড়ে বেরিয়ে রেল লাইন ধরে সোজা দিলু রোডে চলে যায়।

রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। জায়েদ আর টগর বুঝি মারাই গেছে। তিনজন মিলিটারিও রক্তাক্ত। আরো মিলিটারি প্রবেশ করে ঘরে। তারা আজাদ, জুয়েল, বাশার, মনোয়ার আর চঞ্চলকে ধরে প্রচণ্ড

মার দিতে দিতে নিয়ে গাড়ির দিকে চলে যায়। আজাদের মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে তাকে, বাশারের হাত ভেঙে যায়, জুয়েলেরও নাকমুখ দিয়ে রক্ত ঝরে।

আজাদের মা দেখেন তাঁর চোখের সামনে থেকে তাঁর ছেলে চলে যাচ্ছে। তিনি কেঁদে ফেলেন। আর্তনাদের সুরে বলেন, আজাদ, তুই চলে গেলে আমি কাকে নিয়ে থাকব।

আজাদ বলে, আলাহ আলাহ করো মা। আরেক দফা মার তার ঘাড়ে এসে পড়লে সে সেটা সহ্য করে শেষ বারের মতো তার মার দিকে তাকায়।

চঞ্চল তখন খুবই ছোট। নিতান্তই বালক। তাকে কেন আর্মি ধরে নিয়ে গাড়িতে তুলছে। সে তো যুদ্ধ করে নাই। কোনো পক্ষ বিপক্ষ বোঝেও না। আর্মি তার পেটে ঘুষি মারছে আর বলছে, বাতাও, হাতিয়ার কিধার হ্যায়, সে চিৎকার করে বলছে, হাম বেকসুর হ্যায়, হাম বেগু না হ্যায়। আজাদের মা দৌড়ে যান গাড়ির কাছে, ছো মেরে তুলে নিয়ে আসেন চঞ্চলকে।

গুলিবিদ্ধ, আহত অথবা নিহত তিন পাকিস্তানী সৈন্যকে ওরা একটা গাড়িতে তোলে। বন্দি সবাইকে গাড়িতে তুলে নিয়ে পাকসেনারা বিদায় হলে হঠাৎ করেই পুরো পাড়া নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে।

মা আজাদের ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখেন শুধু রক্ত আর রক্ত। যেন রক্তের পুকুরে ভেসে আছে জায়েদ আর টগর। তারা বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে কে জানে! তিনি ধপাস করে পড়ে যান, জ্ঞান হারান। তাঁর ভাগ্নিরা তাঁর মাথায় পানি ঢেলে তাঁকে সুস্থ করে তুললে তিনি উঠে কর্তব্য স্থির করেন।

টগর আর জায়েদকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তিনি পাশের বাসায় গিয়ে হাজির হন, যেখানে টেলিফোন আছে। পাশের বাসায় থাকতেন একজন মাড়োয়ারি মহিলা। মা মাড়োয়ারির বাসার দরজায় ধাক্কা দেন। কিন্তু মহিলা দরজা খোলে না। তিনি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেন মহিলা কোরান শরিফ নিয়ে বসেছে। তিনি আরেকবার ধাক্কা দেন। মহিলা কোরান শরিফ থেকে মুখ তোলে না। তখন তিনি জানালার ধারে দাঁড়িয়েই থাকেন। মহিলা কোরান শরিফ পড়েই চলেন। মহূর্ত মুহূর্ত করে ঘণ্টা চলে যায়। মহিলা কোরান শরিফ থেকে চোখ সরায় না। আজাদের মাও জানালা থেকে সরেন না। ফজরের আজানের ধ্বনি শোনা যায়। মহিলা মুখ তোলেন। আজাদের মা বলেন, বুবু দরজা খোলেন। একটা ফোন করব।

তখন একা বাসায় তিনটা মেয়ে, তার মধ্যে কচি ভাবে, তার স্বপ্নের রাজপুত্ররা ঘরে ঢুকে এ কোন রক্তের খেলা খেলে গেল। তাহলে ওরা কি রাজপুত্র ছিল না, ছিল রাজপুত্রের ছদ্মবেশে দুষ্ট রাক্ষস!

৩৯

কাজী কামাল দৌড়াচ্ছে। রেল লাইন ধরে। বড় রাস্তা পেরিয়ে সে ঢুকে পড়ে দিলুরোডের দিকে। সোজা চলে যায় আলমদের বাসায়। আলমদের নিচতলার জানালার কাচে টুকটুক করে শব্দ করে। ঘুম ভেঙে যায় আসমার। সে জানালার কাছে এসে জানতে চায়, কে? কাজী কামাল, সম্পূর্ণ জন্মদিনের পোশাকপরা, বলে, একটা লুঙ্গি দ্যান আগে। অবস্থা খারাপ। আজাদের বাসা আর্মি রেইড করছে। আমি স্টেন কাইড়া নিয়া গুলি কইরা পালায়া আসছি। আসমা তাকে একটা পেটিকোট জানালা দিয়ে ছুড়ে দেয়। তারপর তারা দরজা খোলে। কাজী বলে রেশমাকে, একটা হাতিয়ার দাও। আর তোমরা সবাই পালাও। এই বাড়িতেও আর্মি সিয়োর আসবে।

হাফিজুল আলম, আলমের বাবা, বলেন, কাজী তুমি পালাও। এখন আর অস্ত্র নেবার দরকার নাই। আর আমরা দেখি নিজেরা কী করতে পারি। এবার হাফিজুল আলম একটা পাজামা আর শার্ট এনে দেন কাজীর হাতে।

কাজীকে ওরা ধাক্কা দিয়ে পেছনের দেওয়াল পার করে। হাফিজুল আলমকেও তাঁর মেয়েরা পাশের বাড়ির দেয়ালের ওপারে ঠেলে পাঠায়। কাজী ইস্কাটনের রাস্তায় আসতেই দেখে দুটো ট্রাক আরেকটা জিপ দিলু রোডে আলমের বাড়ির দিকেই যাচ্ছে। কাজী নিজেকে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ফেলে। সেখান থেকে সে যায় সৈয়দ আশরাফুল হকের বাড়িতে। আশরাফুল তাকে নিয়ে লুকিয়ে রাখে ড্রাইভারদের থাকবার জায়গায়। পরে সেই জায়গাটাও নিরাপদ মনে না হওয়ায় কাজী বেরিয়ে যায় এখন যেখানে সোহাগ কমিউনিটি সেন্টার সেখানে আশরাফুলের বড়ভাই গাজির বাসায়। তখন ভোর ৫টা।

সৈন্যরা আলমদের বাসায় ঢুকে প্রথমেই জানতে চায় রান্নাঘর কোথায়, রান্নাঘরের মেঝের নিচে গোপন কুঠুরিতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ লুকোনো ছিল। শাবল দিয়ে মেঝে ভেঙে তারা এইসব অস্ত্র উদ্ধার করে। আর বাসায় বেড়াতে আসা আলমের চাচা আর চাচাত ভাইকে ধরে নিয়ে যায়।

২৯ শে আগস্টের সকাল ১১ টার দিকে বদি ধরা পড়ে ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপ্যালের বাসা থেকে। প্রিন্সিপ্যালের ছেলে ফরিদ ছিল বদির বন্ধু। প্রচণ্ড মারের মুখে বদি বলে দেয় সামাদভাই আর চুলুভাইয়ের নাম। বিকাল সাড়ে চারটার দিকে ধরা পড়েন সামাদ ভাই। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অমানুষিক নির্যাতন আর জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েন সামাদ ভাই, আলতাফ মাহমুদের বাসা চিনিয়ে দিতে সৈন্যরা তাকেই বাধ্য করে সহ্যাতীত নির্যাতনের মুখে।

৩০শে আগস্টের ভোর। রাজারবাগের বাসায় শিমুল বিলাহর মা তখনও ফজরের নামাজ শেষে জায়নামাজে বসে তসবিহ গুনছেন। শিমুল বিলাহ, তখন কিশোরী, সকালের রেওয়াজ করছে। শিমুল দেখতে পায়, তাদের বাড়ি ঘিরে ফেলেছে পাকিস্তানী সৈন্যরা। সে দৌড়ে তার মায়ের কাছে যায়, মা মোনাজাত করছেন। পাকসেনারা নেটের দরজা ভেঙে ফেলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে। তাদের একজন শিমুলের বুক বরাবর অস্ত্র উঁচিয়ে ধরলে শিমুল তারস্বরে চিৎকার করে ওঠে, আর বাড়ির চারদিকে একদল কাক কাকা রবে ডেকে উঠে পাখার ঝাপ্টায় আকাশ মাতায়। সৈন্যরা ধাতবস্বরে বলে ওঠেঃ মিউজিক ডিরেক্টর সাব কৌন হ্যায়? কিধার হ্যায়? তখন, ভোরের চাল-ধোয়া পানির মতো পবিত্র আলো সত্তায় মেখে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসেন আলতাফ মাহমুদঃ আমি।

হয়ার আর দি আর্মস এন্ড এমুনিশেনস? হাতিয়ার কিধার হ্যায়?

আলতাফ মাহমুদ বুঝতে পারেন, তারা সব কিছু জেনেই এসেছে। তিনি বুঝতে পারেন, এ বাড়ির আর সবাইকে বাঁচাতে হলে সব কিছুর দায়দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হবে, যা তিনি একজীবনে আর একাত্তরের মার্চের পরে করেছেন। তিনি সুর দিয়েছেন আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানে, যুক্ত ছিলেন বাম রাজনীতির সঙ্গে, তিনি ২৫ মার্চের রাতে প্রত্যক্ষ করেছেন কীভাবে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা পুলিশ ব্যারাকে হামলা চালিয়েছে, আগুন লাগিয়েছে, বাঙালি পুলিশ কীভাবে পাক-আক্রমণ প্রতিরোধ করতে চেয়েছে শুধু রাইফেল দিয়ে, বাঙালি পুলিশেরা পজিশন নিয়েছিল তাদের আর পড়শিদের বাসার ছাদেও, ভোরে টিকতে না পেরে চলে গেছে অস্ত্র আর ইউনফির্ম ফেলে, সেই অস্ত্র আলতাফ মাহমুদ তুলে দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে, শাহাদত চৌধুরী মেলাঘর থেকে জুলাইয়ে এসেছে তাঁর কাছে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্য গান রেকর্ড করে তার টেপ নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাঁর কাছে এসেছে মুক্তিযোদ্ধা গাজী দস্তগীর, ঢাকায় মেলাঘর থেকে খালেদ মোশাররফ আর হায়দার যে ১৭ জনকে পাঠিয়েছিলেন হাবিবুল আলমের নেতৃত্বে তাদেরই একজন এই দস্তগীর। সামাদভাই

অনেকবার এসেছে তাঁর কাছে। শাচৌ পূর্বপরিচিত আলতাফ মাহমুদের, যুদ্ধের মধ্যে একদিন রাস্তা থেকে আলতাফ মাহমুদ ধরে আনেন শাচৌ আর আলমকে। তিনি এইভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে। ফতেহ আর বাকেরও এসেছে। অস্ত্র রাখতে হবে, এ প্রস্তাব শুনে আলতাফ মাহমুদ নিজে গাড়ি চালিয়ে গাড়ির বুটে করে নিয়ে এসেছেন দুট্রাঙ্ক অস্ত্র, সেগুলো পুতে রাখা হয়েছে তাঁদের পড়শির বাসার পেছনের লেবুগাছটার নিচে আঙিনায়, মুক্তিযোদ্ধাদের দেখলেই তিনি খুশি হতেন, বলতেন, আমার যা সাহায্য লাগবে তোমরা আমাকে বলবে আমি অবশ্যই করব।

তিনি পাকিস্তানী সৈন্যদের বলেন, তোমরা কেন এসেছ, আমি বুঝতে পারছি। আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। আসো। এই গাছের নিচে আছে দুটো ট্রাঙ্ক।

সৈন্যরা তাঁর হাতেই তুলে দেয় কোদাল, একা আলতাফ মাহমুদ খুঁড়তে থাকেন মাটি, কিন্তু তিনি ক্লান্তি বা অনিচ্ছা বোধ করছিলেন, একজন সৈন্য রাইফেলের বাট দিয়ে তার মুখে আঘাত করে, তার একটা দাঁত ভেঙে মাটিতে পড়ে যায়, তিনি আবার খুঁড়ে চলেন উঠোন, একজন পাকিস্তানী সৈন্য বেয়নেট চার্জ করলে আলতাফ মাহমুদের কপালের চামড়া কেটে গিয়ে তার চোখের ওপরে ঝুলতে থাকে।

দুই ট্রাঙ্ক অস্ত্র উদ্ধার করে আলতাফ মাহমুদ, তাঁর শ্যালক নুহেল, খনু, লিনু, দিনু বিলাহ আর আগের রাতে বেড়াতে এসে কারফিউয়ের ফাঁদে আটকে পড়া মুক্তিযোদ্ধা-শিল্পী আবুল বারক আলভীকে, আর যন্ত্রশিল্পী হাফিজকে, আরো দুজন পড়শিকে ধরে নিয়ে গাড়িতে তোলে মিলিটারিরা, তখন প্রতিবাদে ভীষণ কান্না জুড়ে দেয় আলতাফ মাহমুদের চার বছরের কন্যা শাওন।

একই রাতে, ২১টা বাসায় হানা দেয় পাকিস্তানী মিলিটারি। বদি আর সামাদ ভাইয়ের গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে ২৯ আগস্ট বিকালেই মুক্তিযোদ্ধা উলফত চক্কর মেরে ঘুরতে থাকে বিভিন্ন হাইড আউটে, সে বেবিট্যাক্সিতে চড়ে যায় শাহদাত চৌধুরীদের হাটখোলার বাসায়, শাচৌ-এর ভাই মুক্তিযোদ্ধা ফতেহকে বলে রেইড আসন্ন, একই বেবিতে চড়ে ফতেহ আর তিনবোন চলে যায় তাদের এক বোনের বাসায়। শাহাদত আর ফতেহ চৌধুরীর বাবা অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ আব্দুল হক চৌধুরীর অভ্যাস ছিল রাত ১২টা পর্যন্ত কোরান শরিফ পাঠ, সেদিন তিনি আর জায়নামাজ থেকে ওঠেন না। পাকিস্তানী আর্মি তাঁর বাসায় হানা দেয় রাত দুটোয়। তারা তাঁর কাছে তাঁর পরিচয় জানতে চায়। চৌধুরী সাহেব জানান, তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ। তখন আর্মি অফিসার তাঁকে স্যালুট করে। জিজ্ঞেস করে, আপনার ছেলেরা কোথায়?

তিনি বলেন, 'জানি না।'

'তারা কি ভারতে গেছে?'

'যেতেও পারে।'

'যুদ্ধে গেছে?'

'আমার জানামতে গ্রামে গেছে থাকতে। তবে যুদ্ধে গেলে যেতেও পারে। আমি তাদের সিকিউরিটি দিতে পারব না, তাই তাদের আটকে রাখতেও পারি না।'

অফিসারটি বিস্মিত হয়ে চৌধুরী সাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তারপর বলেন, আপনার কথা আমি আমার ওপরের অফিসারকে জানাব।

আর রাত দুটোয় বাসা ঘেরাও করে কাউকে না পেয়ে বাড়ির জামাতা কলকাতা থেকে বেড়াতে আসা বেলায়েতকে ধরে নিয়ে যায় পাকবাহিনী। ধানমণ্ডি ২৮-এর আশ্রয়স্থলটাও তলাসির আওতায় পড়ে, কাউকে না পেয়ে মালি জামানকে প্রচণ্ড মারধোর করে আর্মিরা, রাত দুটোয় হানা দেয় চুলুভাইয়ের ভাই এএসএইচকে সাদিকের বাসায়, ধরে নিয়ে যায় চুলু-ভাইকে, কিন্তু ওয়ারড্রবের ভেতরে কাপড়ের আড়ালে রাখা অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করতে পারে না। ফতেহ আলী চৌধুরী বিকালেই যায় এলিফ্যান্ট রোডে

জাহানারা ইমামের বাসার খোঁজে, কিন্তু সে বাসাটা চিনত না বলে খুঁজে না পেয়ে ফিরে যায়, আর রাত দুটোয় চারদিক থেকে কণিকা নামের বাসাটা ঘিরে ফেলে আর্মিরা ধরে নিয়ে যায় রুমী, জামী, তাদের বাবা শরীফ ইমাম, কাজিন মাসুম, বন্ধু হাফিজকে। স্বপনের বাড়ি ঘেরাও হওয়ার সময় টের পেয়ে স্বপন বাড়ির পেছনের গোয়ালে ঢুকে পড়ে গরুর পেছনে আশ্রয় নিলে কোনোমতে বেঁচে যায়। মেলাঘরের আরেক গেরিলা উলফতকে না পেয়ে তার বাড়ি থেকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে যায় তার বাবা আজিজুস সামাদকে।

এইসব খবর নিয়ে ফতেহ, তার ভাই ডাক্তারির ছাত্র মোরশেদ আর তার ইডেন কলেজের অধ্যাপিকা সহমুক্তিযোদ্ধা জাকিয়া চলে যায় সীমান্ত পেরিয়ে মেলাঘরে, সেখানে আলম আর শাচৌ ইতিমধ্যে পদোন্নতি পাওয়া লেঃ কর্নেল খালেদ মোশাররফ আর মেজর হায়দারকে শোনাচ্ছে ঢাকায় সেক্টর টু-র গেরিলা ওয়ারফেয়ারের সাফল্যের একেকটা অভিযানকাহিনী, তাঁদের দুজনই দারুণ খুশি এই সাফল্যে, এবং তাঁরা রাজি ঢাকার গেরিলাদের হাতে আরো ভারি অস্ত্র আর গোলাবারুদ দিতে, তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে শহীদুলাহ খান বাদল, আর এর কিছুক্ষণ পরই ঢাকা থেকে সদ্য আসা ফতেহর মুখে এই বিয়োগান্তক খবর শুনে খালেদ মোশাররফ আর হায়দার থমকে থাকেন, তারপর খালেদ মোশাররফের চাউনির বাইরে চলে যান হায়দার, ঢুকে পড়েন নিজের তাঁবুতে, দাঁড়িয়ে থাকে বিপন্ন বাদল, আর যে-মেজর হায়দারকে কেউ কোনোদিনও এক ফোঁটা জল ফেলতে দেখেনি, সেই শক্ত যোদ্ধাটি সোজা বিছানায় চলে যান, বালিশ চাপা দেন মুখে, তারপর হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেনঃ মাই বয়েস মাই বয়েস...

৪০

আজাদের মা টেলিফোন করেন এম্বুলেন্স-এর জন্য। কিন্তু কোনো এম্বুলেন্স আসে না। রক্তাক্ত দেহ নিয়ে পড়ে আছে দুটো ছোট মানুষঃ জায়েদ আর টগর। তিনি একা একা রিকশা নিয়ে যান হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে। ভাড়া করে আনেন ট্যাক্সি। ট্যাক্সিওয়ালাকে বলেন, বাবা, দুইটা ছোট ছোট ছেলেরে গুলি লাগছে। একটু ধরতে হইব। ট্যাক্সিচালক, আজাদের মা, মহুয়া-অতিকষ্টে ধরে জায়েদ আর টগরকে গাড়িতে তোলে। মা বলেন, ঢাকা মেডিকালে চলো। ট্যাক্সিওয়ালা বলে, ঢাকা মেডিক্যালে আর্মি গিজগিজ করে, ওইখানে গুলিখাওয়া রোগী নিয়া গেলে ওরা গায়েব কইরা ফেলব। এর চায়া হলিফ্যামিলিতে লন।

'তাই চলো।'

টগর আর জায়েদকে হলিফ্যামিলিতে ভর্তি করানো হয়। তারা অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে থাকে হাসপাতালের বিছানায়। আজাদের মার দিনগুলো যে তখন কী করে কাটছে! দুটো ভাগ্নে, তারা তার ছেলের মতোই, হাসপাতালে, বাঁচে কি মরে ঠিক নাই। তাদের জন্য ওষুধপাতি, রক্ত যোগাড় করা, হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করা-এসব তাঁকে করতে হচ্ছে। ওদিকে তার নিজের ছেলে ধরা পড়েছে আর্মিদের হাতে। একা একটা মানুষ তিনি কী করবেন, কোথায় যাবেন। এরই এক ফাঁকে প্রথম সুযোগে তিনি তাঁর বাসায় গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখা অস্ত্রশস্ত্রগলো সরিয়ে ফেলেন হাঁড়ির মধ্যে ভরে, ভাগ্নে টিসুর মাথায় চাপিয়ে দিয়ে।

৪১

আজাদদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয় তেজগাঁ বিমানবন্দরের উল্টোদিকে ড্রাম ফ্যাক্টরির কাছে এমপি হোস্টলে। রুমী, জামী, তাদের বাবা, বন্ধু প্রমুখকে ধরে বাইরে রাস্তায় জিপের সামনে এনে হেডলাইট জ্বালানো হয়, তখন কেউ একজন রুমীকে সনাক্ত করে। হতে পারে সেই কেউ একজনটা বদি, হতে পারে সামাদভাই, হতে পারে অন্যকোনো ইনফর্মার। রুমীকে সনাক্ত করার পরে তাকে আলাদা করে জিপে তোলা হয়। চুলুকে চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু স্বপনের বাড়ির সামনে গিয়ে আর্মিরা যে স্বপন ভাগ গিয়া বলেছিল, এটা চুলু শুনতে পায়।

এখন রাত কত হবে, আজাদ জানে না। সময়ের হিসাব এখন তাদের কাছে গৌণ হয়ে গেছে। তাকে একটা ঘরে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে। ধরা পড়ার পর থেকেই তার ওপরে মারটা বেশি পড়ছে। তাদের বাড়িতে পাকিস্তান আর্মির যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তরই রেশ ধরে তার ওপর দিয়েই ঝড়টা যাচ্ছে বেশি। পিটিয়ে তার মুখ ক্ষতবিক্ষত করে ফেলা হয়েছে। সমস্ত শরীরে ব্যথা। ওই ঘরে যখন সবাই মিলে এক জায়গায় ছিল, তখন থেকেই শুরু হয়েছে মারধোর। বুকে পেটে মুখে লাথি। ঘুসি। বেত, চাবুক, লাঠি দিয়ে বেধড়ক পিটুনি। বিশেষ করে গিটে গিটে, কনুইয়ে, হাঁটুতে, কব্জিতে মার। চারদিকে বাঙালির আর্তনাদ, চিৎকার। গোঙানি।

এরপর আজাদকে একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। এ-ঘরে একজন বসে আছে। অফিসার। নেমপ্লেটে লেখা নামঃ ক্যাপ্টেন হেজাজি।

'তুম আজাদ হ্যায়।'

আজাদ বলে, নেহি, হাম মাগফার হ্যায়।

সঙ্গে সঙ্গে হান্টারের বাড়ি এসে পড়ে গায়ে পিঠে, ঘাড়ে, মাথায়।

ফের ঝুট বলতা হ্যায়।

এরপর একজনকে আনা হয়। তার মুখ কাপড়ে ঢাকা। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, এ আজাদ?

মুখ-ঢাকা মাথা নেড়ে বোঝায়, হ্যাঁ। এই আজাদ।

আবার শুরু হয় জেরা।

'তুমি ইন্ডিয়া কবে গেছ?'

'যাই নাই।'

'কোন জায়গায় ট্রেনিং নিয়েছ?'

'নেই নাই।'

আবার মার। মারতে মারতে মেঝেতে ফেলে দেয়া হয় আজাদকে। তারপর জেরাকারী বুটসহ উঠে পড়ে তার গায়ে-পায়ে মাথায়! প্রথম প্রথম এই মার অসহ্য লাগে। তারপর একটা সময় আর কোনো বোধশক্তি থাকে না। ব্যথাও লাগে না। আজাদ পড়েই থাকে মেঝেতে। খানিকক্ষণ বিরতি দেয় জোয়ানটা।

আজাদের চোখ বন্ধ। সে প্রায় সংজ্ঞাহীন। পানি এনে ছিটানো হয় তার চোখেমুখে। আবার চোখ মেলতেই আজাদকে বসানো হয় মেঝেতে।

'কোন কোন অপারেশনে গিয়েছিলে?'

'যাই নাই।'

'আর কে কে মুক্তিযোদ্ধা আছে তোমার সাথে?'

'জানি না।'

আবার মার। প্রচণ্ড। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই টের পাচ্ছে না আজাদ।

'শোনো। সব স্বীকার করো। বন্ধুদের নাম বলে দাও। অস্ত্র কোথায় লুকিয়ে রেখেছ, বলে দাও। তাহলে কথা দিচ্ছি, তোমাকে ছেড়ে দেব।'

'আমি কিছু জানি না। আমি নির্দোষ।'

'জানো না? তোমার বন্ধুরাই তোমার কথা বলেছে। তোমার বাসা দেখিয়ে দিয়েছে। তোমাকে চিনিয়ে দিয়েছে। যে সব স্বীকার করছে, তাকে আমরা ছেড়ে দেব। তাহলে তুমি কেন বোকার মতো মরবে। স্বীকার করো।'

'আমি কিছু জানি না। তোমরা ভুল করছ!'

আবার প্রচণ্ড জোরে মার। দড়ির মতো করে পাকানো তার দিয়ে। হাত চলে যায় অজান্তেই, পিঠে। হাতের আঙুলে গিয়ে পড়ে চাবুক। আঙুল থেতলে যায়। নখগু লো মনে হয় খুলে খুলে পড়বে।

আজাদ ওরে বাবারে ওরে মারে বলে কেঁদে ওঠে। তখন তার নিজেরই বিস্ময় লাগে। যে বাবাকে সে দুই চোখে দেখতে পারে না, যে বাবাকে সে স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছে, যার ওপরে তার অনেক রাগ, তাকে কেন তার মহান মায়ের সঙ্গে এক করে ডাকল।

তার ওপর দিয়ে মারের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। যাক। আজাদ এ সব কথা মনে করবে না। সে অন্য কিছু ভাববে। সে তার মাকে ভাববে। তার মায়ের মুখ মনে করবে। তার মা দেখতে খুব সুন্দর। তার সব সময়ই মায়ের মুখটা মিষ্টি লেগেছে। তার মার মুখে সব সময় হাসি লেগেই থাকে। এই সে সুখে দুখে দেখে এসেছে। সে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে। সে শুধু তার মার মুখটা মানস চোখে ফুটিয়ে তুলতে চায়। এই তো তার মা। সেই ঠোঁট, সেই মুখ। সেই পান খাওয়া লাল ঠোঁট। মা তার মিটি মিটি হাসছে। সেদিন কেন সে জানে না, হঠাৎ করেই দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে বলেছে, মা, তুমি কিন্তু আমাকে কোনোদিনও মারো নাই। আশ্চর্য, না! এমন মা বাংলাদেশে আছে, যে মা তার সন্তানকে কোনোদিনও মারে নাই! আমার মা আছেন। তিনি তাঁর সন্তানকে কোনোদিনও মারেন নাই। কিন্তু বিনিময়ে মাকে সে কী দিয়েছে! শুধুই অবাধ্যতা! মাকে জড়িয়ে ধরে সে কোনোদিনও বলে নাই, মা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। অনেক ছেলের সঙ্গেই মায়ের এ রকম সম্পর্ক আছে। তার মার সঙ্গে তার নাই। কিন্তু মা কি তার বোঝে না, এই জগতে মা ছাড়া তার আর কেউ নাই। সে তো ইচ্ছা করলে বাবার কাছে চলে যেতে পারত। তার ছোটমা তাকে নানাভাবে আদর করতে চেয়েছেন। কিন্তু সে তো সেই আদর, সেই প্রাচুর্য ভোগ করবে বলে মাকে ফেলে চলে যায় নাই। বা, ফেলেই বা চলে যেতে হবে কেন, সে তো মাকেও বলতে পারত, মা পাগলামো করে না, কতজনই তো দ্বিতীয় বিয়ে করে, তাদের সবার প্রথম স্ত্রী কি সংসার ছেড়ে চলে গেছে! করাচিতে তার হোস্টেলের তিন রুমমেটের বাবাই তো দ্বিতীয়বার সৎকার্য করেছিল, সে চিঠি লিখে সেটা জানিয়েওছিল। সে তো বলতে পারত, চলো মা, বাবার সঙ্গে একটা আপসরফা করে নেই। কোনোদিন বলে নাই তো! বলবার কথাও ভাবে নাই। বাবার সঙ্গে তার তো কোনো গোলযোগ হয় নাই। বাবা তাকে আদরই করতেন। কিন্তু সে বাবাকে ছেড়েছে শুধু তার মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। বাবাকে ছাড়া মানে তো শুধু বাবাকে ছাড়া নয়, আরাম-আয়েশ অর্থ-প্রতিপত্তি গাড়ি-বাড়ি সম্পত্তির উত্তরাধিকারের মোহ-সব ছাড়া। সে ছেড়েছে তো সব। প্রথম প্রথম অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু মেনে কি সে নেয়নি? মা, এর মধ্য দিয়েই আমার বলা হয়ে গেছে যে আমি তোমাকে ভালোবাসি। মা তুমি কি তা বুঝেছ। মা যদি আমি আর ছাড়া না পাই, তা হলে তোমার আর কী থাকবে মা? আমি জানি তুমি শুধু আমাকেই মানুষ করতে চেয়েছ। আর তার বিনিময়ে আমার কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা তুমি করো না। এটা তুমি চিঠিতেও লিখেছিলে। কিন্তু আমি তো তোমার পাশে থাকতে চাই। না, তোমার ভালোবাসার প্রতিদান দেবার জন্য নয়, তোমাকে খুব ভালোবাসি বলে।

প্রথম রাতের নির্যাতনে আজাদের মুখ থেকে কোনো কথাই আদায় করা যায় না।

সময় কীভাবে, কোথায় দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, আজাদ টের পায় না। এক সময় দেখতে পায়, বদি, রুমী, চুলুভাই, সামাদ ভাই, আলতাফ মাহমুদ, আবুল বারক আলভী, বাশার, জুয়েল সেকেন্দার, মনোয়ার, আলতাফ মাহমুদের শ্যালকেরা, রুমীর বাবা, ভাই, আরো অনেকের সঙ্গে সেও একই ঘরে। তার কী রকম একটা অভয় অভয় লাগে। একই সঙ্গে এতগুলো পরিচিত, অভিন্ন-লক্ষ্য মানুষ, সতীর্থ মানুষ।

আলতাফ মাহমুদ শিখিয়ে দেন তাঁর শ্যালকদের, আলভীকে, একই সঙ্গে ধরা পড়া তাঁর দুই পড়শিকে, তোমরা বলবে তোমরা কিছু জানো না। যা জানার আমিই জানি।

রুমী শিখিয়ে দেয় তার বাবাকে, ভাইকে, বন্ধুকে, তোমরা কিছু জানো না। বলবে, ছেলে কোথায় কী করে বেড়ায় আমরা জানি না। ব্যাস।

গাদাগাদি করে বসে আছে সবাই। পানির পিপাসায় সবার অবস্থা খারাপ। পানি পানি করে চিৎকার করে ওঠে একজন। তখন সবার মনে পড়ে, সবাই বড়ো তৃষ্ণার্ত। একজন সেন্ট্রি দরজার ওপারে। কিন্তু তার কানে এই আবেদন পৌঁছুচ্ছে বলে মনে হয় না। ঘরের ভেতরেই একটা পানির কল আছে। কেউ দেখে নাই। একজনের চোখে পড়ে। তখন সবাই একেক করে উপুড় হয়ে দু আঁজলা ভরে পানি খায়। প্রত্যেকের চেহারা বিধ্বস্ত। আলতাফ মাহমুদের গেঞ্জিভরা রক্তের দাগ। আবুল বারক আলভীর নখ মারের চোটে খুলে খুলে যাচ্ছে। যারা আগে মার খেয়েছে, তাদের গা ফেটে ফেটে বেরুনো রক্ত শুকিয়ে আরো বিভৎস দেখাচ্ছে। বাশারের হাতভাঙা। বোঝাই যাচ্ছে যে ওটা ভেঙে গেছে মাঝ বরাবর। বাশারের মুখে আঁজলা ভরে পানি দেয় আজাদ।

আজাদকে ধরা হয়েছে গতকাল রাত ১২টার পরে। এখন সন্ধ্যা। প্রায় ১৮ ঘণ্টা হয়ে গেছে তাদেরকে কিছুই খেতে দেওয়া হয় নাই।

জাহানারা ইমাম সারাদিন চেষ্টা করেছেন ফোনে, আর্মি এক্সচেঞ্জে। তিনি ক্যাপ্টেন কাইয়ুমকে চাইছেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন কাইয়ুমকে কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। এই ক্যাপ্টেন গতরাতে তাদের বাসায় রেইডের নেতৃত্বে ছিলেন। আর এ বাসায় এসেছিল সুবেদার সফিন গুল। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে জাহানারা ইমাম সুবেদার সফিন গুলকে পেয়ে যান। এই সুবেদার বলে গিয়েছিল, এক ঘণ্টা পরে ইন্টারোগেশন শেষে সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

জাহানারা বলেন, কী এত ইন্টারোগেশন। ওদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে না কেন? ওরা কেমন আছে। আমি কি ওদের কারো সাথে কথা বলতে পারি।

সফিনগুল জামীকে ডেকে দেন।

জামী সংক্ষেপে সারে। ভালো আছি। আমাদের ছেড়ে দেবে।

'তোরা খেয়েছিস কিছু?'

'না।'

'দে তো সুবেদার সাহেবকে ফোনটা দে।'

জাহানারা মিনতি করে আল্লার দোহাই পেড়ে সুবেদারকে অনুরোধ করেন, ওদের কিছু খেতে দিতে।

এই সুবেদার, নাকি অন্য কেউ, আবুল বারক আলভী, বহুদিন তার কথা ভুলতে পারবে না যে, তাদের মেস থেকে হাতে বেলা রুটি আর চিনি এনে দিয়েছিল খেতে। তাকে আলভীর মনে হয়েছিল সাক্ষাৎ দেবদূত। তবে প্রত্যেকের মুখে প্রহারের ক্ষত থাকায় কেউই কিছু খেতে পারেনি।

ওরা যখন এক ঘরে, কখনও খানসেনারা আসে, দলে দলে বা জোড়ায় জোড়ায়, ইচ্ছামতো পেটাতে থাকে ওদের, যেন ওরা খেলার সামগ্রী, বা বক্সিং প্র্যাকটিস করার বস্তা।

রাত ১১ টার পরে রুমীকে বাদ দিয়ে সবাইকে রমনা থানায় আনা হয়।

রমনা থানায় দুটো সেল। দুটো লাইন করা হয়েছে।

আবুল বারক আলভী, তখন সবে আর্ট কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়েছে, তাকে দেখতে বালকের মতো দেখায়, মেলাঘর থেকে এসেছে, ভাবে, আমাকে আলতাফ মাহমুদের ফ্যামিলির সঙ্গে দাঁড়াতে হবে। সে নিজে থেকে গিয়ে আলতাফ মাহমুদের পরিবারের লাইনে ভিড়ে যায়। আর মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, তার নাম সে বলবে সৈয়দ আবুল বারক। আলতাফ মাহমুদের বাসায় এসেছে নিতান্তই আত্মীয় হিসাবে, বেড়াতে, সে তার শ্বশুরপক্ষের আত্মীয়।

সৈন্যরা এক এক করে ডেকে ডেকে নাম এন্ট্রি করছে, আলভী তার নামের প্রথম অংশ বলে, বাকিটা আর বলে না। সবাইকে সেলে ঢোকানো সাঙ্গ করে সৈন্যরা চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণ সেলে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকা আগে থেকে ঢোকানো আসামীরা জেগে ওঠে। তাদের কেউ হয়তো চোর, কেউ বা পকেটমার। তারা জানে রোজ রাতে মুক্তিরা আসে, তারা দিনের বেলা তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে নোভালজিন ট্যাবলেট, আয়োডেক্স এসব নিয়ে রেখে দিয়েছে। তারা সবাই মুক্তিদের সেবায় লেগে যায়। আজাদের সারা গায়ে আয়োডেক্স লাগায় একজন। বলে, ভাইজান, আমি পকেট মারার কেসে ধরা পড়ছি, অনেক মার খাইছি, হাটুরা মাইর, আপনাগো মতো মাইর খাই নাই।

বাশারের হাতে রুমাল বেঁধে দেয় একজন।

নিজের গামছা খুলে পুরোটা মেঝে মুছে দেয় কেউ। তারা শিখিয়ে দেয় মার থেকে বাঁচার উপায়, বলে, প্রথমে দুএক ঘা মার খাওনের সাথে সাথে অজ্ঞান হওনের ভান কইরা পইড়া যাইবেন, চোখ উল্টায়া রাখবেন, দেখবেন তাইলে মাইর থামায়া চোখেমুখে পানি ছিটাইব।

ভাত আর তরকারি আসে কিছু। দুচামচ করে ভাত, একটু করে নিরামিষ তরকারি। বন্দিরা খায়। তারপর হাজতিরা পুলিশকে টাকা-পয়সা দিয়ে এদের জন্য পান আর সিগারেট জোগাড় করে।

অল্প ভাত। সবাই ভাগাভাগি করে খায়। আজাদ গিয়েছিল হাতমুখ ধুতে। এসে দেখে ভাত ফুরিয়ে গেছে। তার রেজেকে ভাত নাই! কী আর করা! সে পান মুখে দেয়। তার মা খুব পান পছন্দ করে। কী জানি মা এখন কী করছে!

৪২

আজাদের মার সময়গুলো যে কীভাবে কেটে যাচ্ছে, আলাহ জানে। জায়েদ আর টগরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি করলেই তো আর ঝামেলা শেষ হয়ে যায় না। কাগজে ছাপা হয়েছে সংবাদ, ঢাকায় পুলিশ আর সেনাবাহিনীর অভিযান, দুষ্কৃতিকারী গ্রেফতার, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার, দেশপ্রেমিক নাগরিকদের কাছ থেকে গোপন খবর পেয়ে সেনাবাহিনী এই মহান সাফল্য দেখিয়েছে। গুলিবিদ্ধ দুজন দুষ্কৃতিকারী হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে অচেতন হয়ে আছে। এই খবর কাগজে প্রকাশিত হবার পরে মিলিটারি চলে আসে হলি ফ্যামিলিতে। এদের মধ্যে একজন ক্যাপ্টেন ইমতি। তারা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলে, এই রোগী দুজনকে তাদের চাই। হলি ফ্যামিলি কর্তৃপক্ষ বলে, এটা রেডক্রসের হাসপাতাল। এখান থেকে কোনো রোগীকে কখনও ছাড়া হবে না। কাপ্টেন রোগীর সঙ্গে আসা লোকদের খুঁজতে থাকে। আজাদের মাকে পাওয়া যায়। ক্যাপ্টেন তাঁকে জিজ্ঞেস করে, ঘটনা কী? এরা গুলিবিদ্ধ হয়েছে কীভাবে। আজাদের মা ঘটনাটা, যতটুকু বলা নিরাপদ মনে করেন, বিবৃত করেন। তাঁর ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে জানতে পেয়ে ক্যাপ্টেন জানতে চায়, ছেলের নাম কী। মা ছেলের

ভালো নাম বলেন। ক্যাপ্টেন চমকে ওঠে। জানতে চায়, ডাকনাম কী। মা বলেন। ক্যাপ্টেন বলে, আজাদের কোনো তসবির তাঁদের সঙ্গে আছে কিনা। আজাদের মা তাঁর সঙ্গে সারাক্ষণ রাখা আজাদের একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি বের করে দিলে ক্যাপ্টেন সেটা হাতে নেয়। ভালো করে দেখে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্যাপ্টেনের দুচোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি ঝরতে থাকে। ছবিটা ফেরত দিয়ে ক্যাপ্টেন কিছু না বলে চলে যায়। আজাদের মা ঘটনার কোনো কারণ বের করতে পারেন না, তবে ঘটনা শুনে অন্যরা এই অনুমান ব্যক্ত করে যে সম্ভবত এই ক্যাপ্টেনটা করাচি ইউনিভার্সিটিতে আজাদের সহপাঠী ছিল।

রক্ত যোগাড় করা দরকার। জায়েদ-টগরকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে রক্ত আর স্যালাইন দিয়ে। টাকা সংগ্রহ করতে হবে। হাতে কোনো নগদ টাকা নাই। এর মধ্যে আবার চেষ্টাচরিত্র করতে হবে আজাদ, মনোয়ার, বাশারকে ছাড়িয়ে আনার। তিনি কার কাছে যাবেন? টাকা যোগাড়ের সহজ পথ সোনার গয়না বিক্রি করা। ওটা করা যাবে। রক্তও যে কার কাছে পাওয়া যাবে, খোদা জানেন। তিনি নিজেই দিতে পারেন, কিন্তু ডাক্তাররা তাঁর রক্ত নিতে চায় না। কেন যে নিতে চায় না কে জানে।

ডাক্তাররা তাঁর কাছে একটা ফরম নিয়ে আসে। জায়েদের পা কেটে ফেলতে হবে। আপনি গার্জিয়ান হিসাবে পারমিশন দেন। এখানে আপনার সাইন লাগবে। সাইন করেন।

পা কেটে ফেলতে হবে? আজাদের মা চিন্তায় পড়েন। ছেলে তাঁর নয়। ছেলের মা বেঁচে থাকলে সেই সিদ্ধান্ত দিতে পারত। ছেলের বাবা তো থেকেও নাই। এখন এই সিদ্ধান্ত তিনি কীভাবে দেবেন। তখন তাঁর মনে পড়ে যায় জুরাইনের মাজার শরিফের বড় হুজুরের কথা। আজাদকে যুদ্ধে যেতে দেবেন কি দেবেন না, এই দোটানায় যখন তিনি ভুগছিলেন, তখন তিনি হুজুরের কাছে গিয়েছিলেন। হুজুর তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, আজাদকে যুদ্ধে পাঠাও। এখন তার এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় হুজুরের কাছে বুদ্ধি নেওয়া যেতে পারে।

আমি একটু বুদ্ধি পরামর্শ নিয়ে আসি।

তিনি জুরাইনে চলে যান। বড় হুজুরের সঙ্গে দেখা করেন। হুজুর পাকের স্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর সুসম্পর্ক। তাঁর সঙ্গেও দেখা করেন। তাঁদের খুলে বলেন তাঁর বিপদের কথা। ছেলেকে, ছেলের বন্ধুকে, ভাগ্নি-জামাইকে ধরে নিয়ে গেছে আর্মিরা। আর্মির গুলিতে দুই ভাগ্নে মরণাপন্ন। ছেলে কি তাঁর ফিরে আসবে না? আর জায়েদের পা কাটার অনুমতি তিনি দেবেন কি দেবেন না!

হুজুর বলেন, উসকো পাও মাত কাটো।

ব্যস। মা তাঁর সিদ্ধান্ত পেয়ে যান। আর আমার ছেলে আজাদের কী হবে হুজুর!

ও আপাস আয়েগা। আসবে। ফিরে আসবে। সহি সালামতেই ফিরে আসবে।

আজাদের মা কিছুটা আশ্বস্ত হন। হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ফিরে আসেন। ডাক্তারদের বলেন, না, জায়েদের পা কাটতে পারবেন না। আমার অনুমতি নাই। শুনে ডাক্তাররা বিরক্ত হয়। পায়ে গুলি লেগেছে। পা না কাটলে এ ছেলেকে তো বাঁচানোই যাবে না।

জায়েদ এ কথা চিরদিনের মতো স্মরণ করে রাখবে যে, জুরাইনের হুজুরের জন্য তার পাটা আজো আছে। নইলে তো কবেই সেটা কেটে ফেলে দিতেন হলি ফ্যামিলির ডাক্তাররা।

আজাদের মা বাসায় ফেরেন। ঘরের মধ্যে এখনও পড়ে আছে ভাঙা খাট। ইস্পাতের আলমারি এখনও গুলিতে ছ্যাঁদা হয়ে আছে। মেঝেতে রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে, কে মুছবে আর এসব!

এরই মধ্যে হঠাৎ করে কামরুজ্জামান আসে, তাকে জায়েদ সব সময়ই সন্দেহ করে এসেছে আর্মির ইনফর্মার বলে, তার সঙ্গে আরেকজন ছেলে, সেই ছেলে বলে, নানি, অস্ত্রগুলা দেন।

আজাদের মা বলেন, তুমি কে?

আমি বদির মামা। আজাদের বন্ধু। আজাদদের সাথে ছিলাম।

আজাদের মা'র মাথায় মুহূর্তে এ প্রশ্ন উদিত হয় যে, আজাদের কোনো বন্ধু তো তাকে নানি বলে না। এ কে? কেন এসেছে? তিনি বলেন, বাবা, এ বাসায় তো কোনো অস্ত্র নাই। তুমি ভুল শুনেছ! কামরুজ্জামান আগন্তুককে নিয়ে চলে যায়। আজাদের মা ভাবেন, ভাগ্যিস অস্ত্রগুলো তিনি আগেই সরিয়ে ফেলেছিলেন।

মা সারাক্ষণ ব্যস্ততার মধ্যে থাকেন। এর মধ্যে যতটুকু সময় পান তিনি নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, আলাহর দরবারে মোনাজাত করেন।

৪৩

৩১ আগস্ট সকাল সাতটা। রমনা থানা। বন্দিরা হঠাৎ গাড়ির আওয়াজ পায়। পাকিস্তানী সৈন্যরা এসে পড়ে। তাদের আবার তোলা হয় একটা জানালা-বন্ধ বাসে। তাদের নিয়ে আসা হয় আবার এমপি হোস্টেলে। একটা কক্ষে সবাইকে কিছুক্ষণ রাখার পরে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় পেছনের আরেকটা বিল্ডিঙে। আজাদ শুনতে পায়, এখানে সবার স্টেটমেন্ট নেওয়া হবে। স্টেটমেন্ট মানে একজন আর্মি অফিসার বন্দিদের একে একে প্রশ্ন করবে। জবাব শুনে সেগুলো কাগজে লিখে নেবে। এই স্টেটমেন্ট নেওয়ার সময় যে টর্চার করা হয়, তা আগের দুদিনের অত্যাচারের চেয়েও ভয়াবহ।

আজাদের পালা আসে। একজন অফিসার নাম ধরে ডাকে। আজাদ। আজাদ ওঠে না। আজাদ আলিয়াস মাগফার। আজাদ ওঠে।

আজাদকে একটা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে তিনজন অফিসার এক সঙ্গে ঘিরে ধরে আজাদকে।

আজাদ।

আজাদ কোনো কথা বলে না।

তোমাকে তোমার বন্ধুরা দেখিয়ে দিয়েছে তুমি আজাদ, তুমি সেটাই স্বীকার করছ না। এটা ঠিক না। আমাদের কাছে সব কিছুর রেকর্ড আছে। তুমি সিদ্ধিরগঞ্জ অপারেশনে গিয়েছিলে। ২৫ তারিখে তুমি রাজারবাগ অপারেশনে ছিলে। প্রথমটার কম্যান্ডার ছিল কাজী কামাল। পরেরটার আহমেদ জিয়া।

এসব ঠিক নয়। আমার নাম মাগফার। ওরা আমার বাসায় এসেছিল তাস খেলতে। ওরা তাসটা ভালো খেলে। এ-ছাড়া আমি ওরা কোথায় কী করে না করে কিচ্ছু জানি না।

হারামজাদা। সিপাইদের ডেকে তার হাওলায় সমর্পণ করা হয় আজাদকে, আচ্ছা করকে বানাও। দুজন সিপাই এসে আজাদের পায়ে দড়ি বাঁধে। তারপর তাকে ঝুলায় সিলিং ফ্যানের সঙ্গে উল্টো করে। ফ্যান ছেড়ে দেয়। আর চলতে থাকে চড় চাড় কিল ঘুষি। আজাদ মা মা বলতে বলতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

তাকে নামিয়ে তার চোখে মুখে পানি দেওয়া হয়। জ্ঞান ফিরে পেলে সে প্রথম যা বলে, তা হলো, মা। যেন সে মায়ের কোলে শুয়ে আছে।

অফিসাররা আজাদের ফাইলটা আবার দেখে। মার সঙ্গে বাবার সম্পর্ক নাই। মায়ের একমাত্র ছেলে। মার সঙ্গে একা থাকে।

অফিসার বলেন, তুমি মাকে দেখতে চাও?

'হুঁ।'

'মার কাছে যেতে চাও?'

'হুঁ।'

'তাহলে তুমি বলো, অস্ত্র কোথায় রেখেছ?'

আজাদ বলে, 'জানি না।'

আবার এক প্রস্থ প্রহার চলে।

আজাদ আবার তার মার মুখ মনে করে নির্যাতন ভোলার চেষ্টা করে।

'ওকে। তোমার মা বললে তুমি সব বলবে?'

'বলব।'

'ঠিক আছে। তোমার মাকে আনা হবে।'

অফিসার ইনটেলিজেন্সের এক লোককে ডেকে বলেন, এর মাকে আনো।

আবুল বারক আলভী দেখে একে একে আলতাফ মাহমুদের বাসার সবাইকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে তো ডাকে না। সে নিজেই উঠে যায়, বলে, আমাকে যে ডাকলেন না! আমি তো ওই বাসায় গেস্ট হিসাবে ছিলাম।

তাকে ডাকা হয়। অফিসার বলেন, তোমার নাম কী!

সে বলে, সৈয়দ আবুল বারক।

অফিসার তালিকায় তার নাম পান না। তোমাকে কেন ধরেছে?

জানি না। আমি মিউজিক ডিরেক্টর সাহেবের বউয়ের পক্ষের আত্মীয়। কালকে বেড়াতে এসেছিলাম এ বাসায়। আমাকে ভুল করে ধরে এনেছে।

আবুল বারক আলভীর চেহারা প্রতারণাময়, বয়স বোঝা যায় না, তার ওপরে আগের দিনের মারে সমস্ত শরীরে কাটা কাটা দাগ, রক্ত শুকিয়ে ভয়াবহ দেখাচ্ছে, চোখমুখ ফোলা, ঠোঁট কাটা, হাতের আঙুল থেকে নখ বের হয়ে আসছে...

কর্নেলকে অনেক সহানুভূতিসম্পন্ন মনে হচ্ছে... এমন সময় আগের দিনে ও রাতে যে সিপাইটা প্রচণ্ড মেরেছিল, তাকে দেখা যায় এদিকে আসছে, আবুল বারক প্রমাদ গোনে, কারণ ওই সিপাইটা সব জানে, সে জানে যে তার নামই আসলে আলভী, আর একজন মুক্তিযোদ্ধা তাকে আলভী বলে সনাক্ত করে গেছে...

আরো খানিকক্ষণ চলে জিজ্ঞাসাবাদ, আবুল বারক জানায় তার চাকুরিস্থলের কথা, সে রোজ অফিসে যায়, এই যে ফোন নম্বর, ফোন করেন, এটা সে বলে আত্মবিশ্বাস থেকে যে তার অফিসে কেউ খোঁজ করলে তার সহকর্মী বা বড় কর্তা তাকে বিপদে ফেলবে না...

কর্নেল তাকে চলে যাবার অনুমতি দেন।

আবুল বারক বেরিয়ে আসে। সে হাঁটতে পারছে না। তার ওপর ওই দূরে সেই ভয়ঙ্কর সিপাইটাকে দেখা যাচ্ছে। সে ভালো মানুষ সুবাদারটাকে পেয়ে যায়। এই সুবেদারটাকে পরশু থেকেই তার ফেরশেতা বলে মনে হচ্ছে। প্রথম দিন যখন ওই কশাই টাইপের সিপাইটা প্রচণ্ড মার মারছিল, তখন এক সময় এই সুবেদার সিপাইটাকে বলেছিল, ইতনা মার মাত মারো। আজ সুবেদার সাবকে সামনে পেয়ে আবুল বারক বলে, আমি তো দাঁড়াতেই পারছি না। আমাকে কি তুমি রোড পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারো!

শুনে সুবেদার বলে, আমি দোয়া করি তুমি একাই হেঁটে যেতে পারবে।

পারতেছি না চাচাজি।

সুবেদার আরেকজন সিপাইকে বলে, ওকে পার করে দিয়ে আসো।

আবুল বারক হেঁটে হেঁটে সিপাইয়ের সঙ্গে রাস্তায় আসে। দূর থেকে সেই ভয়ঙ্কর সিপাইটা তাকিয়ে দেখে তাকে। আবুল বারক আলভীর রক্ত হিম হয়ে আসে।

আবুল বারক এখনও নিশ্চিত নয়, তাকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে নাকি ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই সৈন্যটা তাকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে বলে, বাসায় গিয়ে একজন ভালো ডাক্তার দেখাবে। আবুল বারকের মনে হয় সে নবজীবন লাভ করল। এয়ারপোর্ট রোডে আসে সে। দেখে একটা গাড়ি যাচ্ছে। সে হাত তোলে। গাড়িটা তাকে অতিক্রম করে চলে যায়। তারপর ব্রেক কষে। আবার ফেরে। আলভী ভয় পায়। গাড়ি থেকে বলা হয়ঃ গাড়িতে ওঠো।

আবুল বারক আলভী দেখতে পায়, তার বন্ধু রানা ও নিমা রহমানের বাবা লুৎফর রহমান। আলতাফ মাহমুদের বাসার পাশে থাকেন। বড় পাট ব্যবসায়ী। আলভী তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে আলতাফ মাহমুদের বাসায় আসে। মহিলা-মহলে সাড়া পড়ে যায়। নিমার মা এসে সব মহিলার সামনে আবুল বারক আলভীকে খালি গা করে শুশ্রূষা করতে থাকেন। আলভী লজ্জা পায়, আবার মহিলাদের এই আদর সে উপভোগও করে।

ফিরে আসে জামী, রুমীর বাবা ইমাম শরীফ।

এইভাবে কেউ ছাড়া পায়, কেউ পায় না।

আজাদের মা মগবাজারের বাসায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই মহুয়া বলে, আম্মা, আপনে কই আছিলেন। কামরুজ্জামানে এক লোকরে আনছিল। কয় বলে, আজাদের মা কই। জরুরি দরকার আছে। আজাদরে ছাড়নের ব্যাপারে কথা আছে।

মার বুকের ভেতরটা যেন লাফিয়ে ওঠে। আজাদকে ছাড়িয়ে আনা যাবে! ফিরে আসবে তাঁর আজাদ। আশার সঞ্চার হয় খানিক। পরক্ষণেই কামরুজ্জামানের নাম শুনে তিনি খানিকটা হতাশ হন। মিলিটারির দালাল লোকটা। ইউনুস চৌধুরীর বাসাতেও ঘুরঘুর করে। সে কি মতলবে এসেছিল, আল্লাহই জানে! মহুয়া বলে, আপনেরে থাকতে কইছে। আজকা বিকালে ফির আইব।

বিকালের জন্য অপেক্ষা করেন মা। তাঁর বুক দুরুদুরু করে কাঁপছে। কিছুই ভালো লাগছে না। মহুয়ার কোলে ছোট মেয়েটা কাঁদে, মহুয়া তাকে স্তন্য পান করায়, মেয়েটা তখন চুপ করে, এই দৃশ্যের দিকে আজাদের মা তাকিয়ে থাকেন। তাঁর বুকের ভেতরটায় হাহাকার করে ওঠে। কোথায় তাঁর আজাদ!

বিকালবেলা কামরুজ্জামান আসে। দরজায় আওয়াজ শুনে মা দৌড়ে দরজা খোলেন। কামরুজ্জামানের সঙ্গে আরো একটা লোক। কামরুজ্জামান বলে, চাচি। আল্লার কাছে শুকর করেন। আমি রইছি বইলা না সুযোগ আইছে। আজাদরে ছাইড়া দেওনের একটা ভাও করছি। ওনারে ক্যাপ্টেন স্যারে পাঠাইছে। কী কয়, মন দিয়া শুনেন।

আজাদের মা তাদেরকে ঘরের ভেতরে আনেন। বসতে দেন। কামরুজ্জামানের সঙ্গের লোকটার মুখের দিকে তাকান। কালো প্যান্ট, শাদা শার্ট পরা লোক। চুল ছোট। ছোট করে ছাঁটা গোঁফ। চেহারাটা পেটানো।

লোকটা বলে, আজাদের সঙ্গে দেখা করতে চান?

'জি।' মার বুক এমনভাবে কাঁপছে যেন তা তাঁর শরীরের অংশ আর নাই।

'ছেলেকে ছাড়ায়া আনতে চান?'

'জি।'

'আজকা রাতে আজাদ রমনা থানায় আসবে। আপনারে আমি দেখা করায়া দেব। বুঝলেন?'

'জি।'

'তার সঙ্গে দেখা করবেন। দেখা করে কী বলবেন?'

'জি!'

'দেখা করে বলবেন, সে যেন সবার নাম বলে দেয়!'

'জি?'

'শোনেন, ছেলেকে যদি ফিরে পেতে চান, তাকে বলবেন, সে যেন সবার নাম বলে দেয়। বুঝেছেন?'

'হুঁ।'

'অস্ত্র কোথায় রেখেছে, সে যেন বলে দেয়। বুঝেছেন?'

'হুঁ।'

'সে যদি সব স্বীকার করে, তাকে রাজসাক্ষী বানানো হবে। বুঝেছেন?'

আজাদের মা তার মুখের দিকে তাকায়। শূন্য তাঁর দৃষ্টি।

কামরুজ্জামান বলে, রাজসাক্ষী মানে হে সবাইরে ধরায়া দিব। যারা যারা আসল ক্রিমিনাল তাগো বিরুদ্ধে সাক্ষী দিব। পুরস্কার হিসাবে হেরে ক্ষমা কইরা দিব। আপনের ছেলেরে ছাইড়া দিব। আমি কইছি, আজাদ ভালো ছেলে। হে ইন্ডিয়া যায় নাই। আরে বন্ধুবান্ধব গো পালায় পইড়া...

আজাদের মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

লোকটা বলে, আপনি বললে আপনার ছেলে আপনার কথা শুনবে। আমাদের কথা শুনছে না। বাজে ছেলেদের সাথে মিশে ও কিছু ভুল করেছে। সব স্বীকার করলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এরপর ছেলেকে দেখে রাখবেন। আর যেন খারাপ ছেলেদের সঙ্গে না মেশে।

যাওয়ার আগে কামরুজ্জামান বলে যায়, রাতের বেলা রমনা থানায় যাইয়েন। আজাদ থাকব। যা যা কইছে, ঠিকমতন কইরেন। বুঝছেন।

তারা চলে যায়। কচি এসে বলে, কী কইল আম্মা, আজাদ দাদাকে ছেড়ে দিবে? ও আম্মা।

মা কিছুই বলেন না। একদিকে তাকিয়ে থাকেন। মহুয়ার মেয়েটা আবার কাঁদছে। কেন, কাঁদছে কেন। মহুয়া কি কাছে নাই? সে তাকে দুধ দিচ্ছে না কেন!

রাত্রিবেলা। গরাদের এপারে আজাদ। ওপারে তার মা। ছেলেকে দেখে মার সর্বান্তকরণ কেঁপে ওঠে। কেঁদে ওঠে। কিন্তু তিনি ছেলেকে কিছু বুঝতে দিতে চান না। আজাদের চোখমুখ ফোলা। ঠোঁট কেটে গেছে। চোখের ওপরে ভ্রূর কাছটা কাটা। সমস্ত শরীরে মারের দাগ। মেরে মেরে ফুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাটা জায়গাগুলোয় রক্ত শুকিয়ে দেখাচ্ছে ভয়াবহ।

এখন আজাদকে তিনি কী বলবেন? বলবেন, রাজসাক্ষী হও। সব স্বীকার করো। এটা তিনি তো বলতেই পারেন। ওর বাবা ইউনুস আহমেদ চৌধুরী এই শহরের এখনও সবচেয়ে ক্ষমতাবান লোকদের একজন। গভর্নরের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। আর্মির অফিসাররা তার ইয়ার-বান্ধব। আজাদের ছোট মা, তিনি শুনতে পান, কর্নেল রিজভী নামের একজনকে ভাই ডেকেছে। কর্নেলের ছোটবোনের নামের সঙ্গে নাকি তার নাম মিলে গেছে। সাফিয়া বেগম যদি ইঙ্গিতেও চৌধুরীর কাছে ছেলের জন্য তদ্বির করেন, তাহলেও তো ছেলে তাঁর মুক্তি পাবে। আবার চৌধুরীর নিজের ভাই আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক। ওই দিক থেকেও তাঁদের কোনো সমস্যা নাই। আজাদের ছোটমা নাকি আজাদের চাচাসহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে গাড়িতে করে নদীতীর পৌঁছে দিয়েছেন।

কিন্তু তাঁর ছেলেকে তিনি রাজসাক্ষী হতে বলবেন? অন্যের ছেলেদের ফাঁসানোর জন্য? মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য? মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রগুলো পাকিস্তানীদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য?

ছেলে তাঁর যুদ্ধে যাওয়ার পরে একদিন বলে, মা তুমি কিন্তু আমাকে কোনোদিনও মারো নাই। হ্যাঁ, তাঁর ছেলেকে তিনি কোনোদিনও ফুলের টোকাও দেন নাই। সেই ছেলেকে ওরা কি মারটাই না মেরেছে! আর ছেলে তাঁর করাচি থেকে চিঠি লিখেছিল, মা, ওরা আর আমরা আলাদা জাতি। অনেক ব্যবধান।

না। তিনি আর যাই হন না কেন, বেঈমান হতে পারবেন না। ছেলেকে যুদ্ধে যেতে তিনিই অনুমতি দিয়েছেন।

আজাদ বলে, মা, কী করব? এরা তো খুব মারে। স্বীকার করতে বলে। সবার নাম বলতে বলে।

'বাবা, তুমি কারো নাম বলো নি তো!'

'না। মা বলি নাই। কিন্তু ভয় লাগে, যদি আরো মারে, যদি বলে ফেলি।'

'বাবারে, যখন মারবে, তুমি শক্ত হয়ে থেকো। সহ্য করো। কারো নাম যেন বলে দিও না।'

'আচ্ছা। মা, ভাত খেতে ইচ্ছা করে। দুইদিন ভাত খাই না। কালকে ভাত দিয়েছিল, আমি ভাগ পাই নাই।'

'আচ্ছা, কালকে যখন আসব, তোমার জন্য ভাত নিয়ে আসব।'

সেন্ট্রি এসে যায়। বলে, সময় শেষ। যান গা।

মা হাঁটতে হাঁটতে কান্না চেপে ঘরে ফিরে আসেন। পাশেই হলি ফ্যামিলি, জায়েদ আর টগর সেখানে চিকিৎসাধীন আছে, কিন্তু সেখানে যেতে তাঁর ইচ্ছা করছে না।

সকালবেলা, যথারীতি গাড়ি এসে বন্দিদের নিয়ে যায় এমপি হোস্টেলের ইন্টারোগেশন সেন্টারে।

বদির ওপরে চলছে অকথ্য নির্যাতন, সে আর সহ্য করতে পারছে না, এক সময় সে দৌড়ে ঘরের ভেতরে ইলেক্ট্রিক লাইনের ভেতরে হাত ঢোকানোর চেষ্টা করে, চেষ্টা করে সকেটের দুই ফুটোর মধ্যে দু আঙুল ঢোকানোর, ব্যর্থ হয়ে সকেট ভেঙে ফেলতে আরম্ভ করে, শব্দ পেয়ে সেন্ট্রিরা এসে তার দুহাত পেছন দিক থেকে বেঁধে ফেলে। তখন সে ভাবে, পালানোর চেষ্টা করলে নিশ্চয় গুলি করবে। তাকে যখন একঘর থেকে আরেক ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন সে অকস্মাৎ দৌড়ে গেটের দিকে যাবার চেষ্টা করে, এ আশায় তাকে গুলি করা হবে, কিন্তু সৈন্যরা অতোটা উদারতার পরিচয় দেয় না, তাকে ধরে নিয়ে এসে উল্টো রাইফেলের বাট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারতে থাকে।

আজাদকে আবার নিয়ে যাওয়া হয় কর্নেলের সামনে। তিনি কাগজ দেখেন। তাকে তার মার সঙ্গে দেখা করানো হয়ে গেছে। ইন্টেলিজেন্সের রিপোর্ট। এখন নিশ্চয় সে স্বীকার করবে সব কিছু। জানিয়ে দেবে অস্ত্রের ঠিকুজি।

আজাদ, বলো, সিদ্ধিরগঞ্জ অপারেশনে আর কে কে ছিল?

আজাদ বলে, জানি না।

'বলো, সিদ্ধিরগঞ্জ অপারেশনের পরে রকেট লাঞ্চারটা কোথায় রাখা হয়েছে?'

'জানি না।'

কর্নেল ইঙ্গিত দেন। আজরাইলের মতো দেখতে একজন সৈনিক এগিয়ে আসে। আজাদের ঘাড়ে এমনভাবে হাত লাগায় যে মনে হয় ঘাড় মটকে যাবে। তাকে ধরে একটা চেয়ারে বসানো হয়। তাকে বাঁধা হয় চেয়ারের সঙ্গে। বিদ্যুতের তার খোলামেলা ভাবে আজাদের চোখের সামনে খুলে বাঁধা হচ্ছে চেয়ারের সঙ্গে, তার পায়ের সঙ্গে। তাকে এখন শক দেওয়া হবে। আজাদের একবার মনে হয় ফারুক ইকবালের কথা, ৩ মার্চ রামপুরা থেকে পুরানা পল্টনের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিটিঙে আসার জন্য মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিল সে, টেলিভিশন-ভবনের সামনে আর্মি গুলি চালায়, গুলিবিদ্ধ হয়ে রাজপথে লুটিয়ে পড়ে ফারুক ইকবালের শরীর, তখন সারাটা শহরে জনরব ছড়িয়ে পড়ে যে ফারুক ইকবাল

নিজের বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তায় মৃত্যুর আগে লিখেছিল জয়বাংলা, তখন খবরটা বিশ্বাস হয় নাই আজাদের, এখন ঠিক অবিশ্বাস হচ্ছে না, তার মনে পড়ে লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের মৃত্যুর বর্ণনা, যা সারাটা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে কিংবদন্তির মতো, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দু নম্বর আসামী লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসায় ২৫ মার্চ রাত ১১ টার দিকে আর্মি ঢুকে পড়ে, তাঁকে জিজ্ঞেস করে, তুমহারা নাম কিয়া, তিনি বলেন কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, তারা বলে, বলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ, তিনি বলেন, এক দফা জিন্দাবাদ, পুরোটা মার্চে যখন নানা রকমের আলোচনা চলছিল, তখন মোয়াজ্জেম হোসেন এই এক দফার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিলেন, এক দাবি এক দফা বাংলার স্বাধীনতা...সৈন্যরা গু লি করল, লুটিয়ে পড়ল তার দেহ...

প্রচণ্ড অত্যাচার চলছে আজাদের ওপর দিয়ে, কিন্তু আজাদ নির্বিকার, সে শুধু মনে করে আছে তার মায়ের মুখ, মা বলেছেন, বাবা, শক্ত হয়ে থেকো...কারো নাম বলো না...

একসময় কর্নেল তাঁর হাতের কাগজ রাগে ছুড়ে ফেলেন, তারপর নির্দেশ দেন চূড়ান্ত শাস্তি র...আজাদের ঠোঁট তখন নড়ে ওঠে, কারণ সে জানে চূড়ান্ত শাস্তি মানে এই শারীরিক যন্ত্রণার চির উপশম, আজাদের মন এই টর্চারের হাত থেকে বাঁচার সম্ভাবনায় আশ্বস্ত হয়ে ওঠে।

পরদিন, কখন রাত হবে, কখন তিনি ভাত নিয়ে যাবেন রমনা থানায়, সারাদিন অস্থির থাকেন মা। দুপুরে তিনি আর ভাত মুখে দিতে পারেন না। তার ছেলে ভাত খেতে পায় না। তিনি বাসায় বসে আরাম করে ভাত খাবেন! তা কি হয়!

সন্ধ্যা হতে না হতেই তিনি চাল ধুতে লেগে পড়েন। দিনের বেলায়ই ঠিক করে যোগাড়যন্ত্র করে রেখেছেন কী রাঁধবেন! মুরগির মাংস, ভাত, আলুভর্তা, বেগু নভাজি। একটা টিফিন কেরিয়ারে নিবেন। নাকি দুটোয়! তার কেমন যেন লাগে।

রাত নেমে আসে। সারাটা শহর নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। কারফিউ দেবার আগেই ভাত নিয়ে তিনি হলি ফ্যামিলিতে আশ্রয় নেন। রাত আরেকটু বেড়ে গেলে দুটো টিফিন কেরিয়ারে ভাত নিয়ে তিনি যান রমনা থানায়।

দাঁড়িয়ে থাকেন, কখন আসবে গাড়ি। কখন এমপি হোস্টেল থেকে নিয়ে আনা হবে আজাদদের। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরে গাড়ি আসে। একজন একজন করে নামে বন্দিরা। কই, এর মধ্যে তো তার আজাদ নাই। আর্মিরা চলে গেলে তিনি পুলিশের কাছে যান। আমার আজাদ কই?

পুলিশ কর্তা নামের তালিকা দেখেন। বলেন, না, আজাদ তো আজকে আসে নাই।

'মাগফার চৌধুরী?'

'না। এ নামেও কেউ নাই।'

'আর কি আসতে পারে?'

'আজ রাতে? নাহ।'

'কালকে?'

'বলতে পারি না।'

টিফিন কেরিয়ারে ভাত নিয়ে আজাদের মা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন। সারারাত। থানার চত্বরে। বাইরে বাঙ্কারে পাকিস্তানী সেনাদের চোখ এলএমজির পেছনে ঢুলুঢুলু হয়ে আসে, ভেতরে পুলিশের প্রহরী মশা মারে গায়ে চাপড় দিতে দিতে, বিচারপতির বাসভবনের উল্টো দিকের গির্জায় ঘণ্টা বাজে, মা দাঁড়িয়ে থাকেন টিফিন কেরিয়ার হাতে, তাঁর কেবলই মনে হতে থাকে সেই দিনগু লির কথা, বিন্দু মারা যাবার পরে যখন তাঁর পেটে আবার সন্তান এল, প্রতিটা মুহূর্ত তিনি কীরকম যত্ন আর

উৎকণ্ঠা নিয়ে ভেতরের জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, আর সন্তানের জন্ম দেবার পরে কানপুরের ক্লিনিকেই চৌধুরী সাহেব আজান দিয়েছিলেন, আর ভারতবর্ষের আজাদির স্বপ্নে ছেলের নাম রেখেছিলেন আজাদ, তাঁর পেটের ভেতরটা গুড়গুড় করছে, যেন তিনি আজাদকে আবার এই পৃথিবীর সমস্ত বিপদ-আপদ-শঙ্কার প্রকোপ থেকে বাঁচাতে তাঁর মাতৃগর্ভে নিয়ে নেবেন, যদি তিনি পাখি হতেন, এখনি তাঁর পাখাদুটো প্রসারিত করে আজাদকে তার বুকের নিচে টেনে নিতেন। আসসালাতু খায়রুম মিনান্‌নাউম, ভোরের আজান দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দৌড় ধরেন তেজগাঁ থানার দিকে। ওখানে যদি তাঁর আজাদ থাকে! ঝিরঝির করে বৃষ্টি ঝরে, ছোট ছোট ছাঁদে, তিনি কিছুই টের পান না, তেজগাঁ থানার চত্বরে হাজির হন। তখনও তাঁর হাতে দুটো টিফিন কেরিয়ার।

পুলিশকে দুটো টাকা চা খাওয়ার জন্যে উপহার দিয়ে তিনি আজকের হাজতিদের পুরো তালিকা দেখেন। গরাদের এ পাশে দাঁড়িয়ে হাজতিদের প্রত্যেকের মুখ আলাদা আলাদা করে নিরীক্ষণ করেন। না, আজাদ নাই।

এখান থেকে এমপি হোস্টেল বেশি দূরে নয়। তিনি এমপি হোস্টেলের দিকে দৌড় ধরেন। একজন সুবেদারের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। সুবেদারকে বলেন, আজাদ কোথায়? আমি আজাদের মা।

সুবেদার বলে, মাইজি, উনি তো এখানে নাই। ক্যান্টনমেন্টে আছেন। আপনি বাড়ি চলে যান।

মা কী করবেন, বুঝে উঠতে পারেন না। তাঁর হাতের ভাত ততক্ষণে পচে উঠে গন্ধ ছড়াচ্ছে। তাঁর নিজের পরিপাকতন্ত্রের ভেতরে থাকা পরশু দিনের ভাতও যেন পচে উঠছে...

মাইজি, আপনি বাড়ি চলে যান।

মা এক সময় বাসায় চলে আসেন। তাঁকে পাথরের মতো দেখায়। তিনি মহুয়াকে, কচিকে সংসারের স্বাভাবিক কাজকর্ম দেখিয়ে দেন, কিন্তু তবু মনে হয় সমস্তটা পৃথিবী গুমোট হয়ে আছে, কী অসহ্য ভাপসা গরম, বৃষ্টি হলে কি জগতটা একটু স্বাভাবিক হতো! তিনি হাসপাতালে যান, দেখতে পান, জায়েদের জ্ঞান ফিরে এসেছে, টগরের অবস্থাও উন্নতির দিকে, তিনি জুরাইনের বড় হুজুরের কাছে, বেগম সাহেবার কাছে যান, তাঁরা তাঁকে আশ্বাস দেন যে, আজাদ বেঁচে আছে, আজাদ ফিরে আসবে। ঘাবড়াও মাত। ও আপসা আয়ে গা।

মহুয়া বলে, আম্মা কিছু খান, না খেয়ে খেয়ে কি আপনি মারা যাবেন, আজাদ দাদা ফিরা আসবে তো!

মা কিছুই খান না। একদিন, দুদিন।

মহুয়া বলে, আম্মা, আপনি কি আত্মহত্যা করতে চান? আত্মহত্যা মহাপাপ। আপনি মারা গেলে আমরা কার কাছে থাকব আম্মা।

মার হুঁশ হয়। তিনি তাঁর চোখের সামনে দেখতে থাকেন তাঁর ভাগ্নেভাগ্নি চঞ্চল, কচি, টিসুর অপ্রাপ্তবয়স্ক মুখ, জায়েদ টগরের শয্যাশায়ী শরীর, তিনি মরে গেলে এরা কোথায় যাবে, কার কাছে থাকবে?

মহুয়া একটা থালায় ভাত বেড়ে টেবিলে রাখে। তাঁকে ধরে জোর করে এনে খাবার টেবিলে বসায়। মা খাবেন বলেই আসেন। দুদিন খান না। পেটে খিদাও আছে। তাঁর সামনে থালায় ভাত। মহুয়া আনতে গেছে তরকারি। ভাত। ভাতের দিকে তাকিয়ে মার পুরো হৃদপিণ্ডখানি যেন গলা দিয়ে দুঃখ হয়ে শোক হয়ে শোচনা হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তিনি ভাতগুলো নাড়েন, চাড়েন। তাঁর মনে পড়ে যায়, রমনা থানার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আজাদ কেমন করে বলেছিল, মা ভাত খেতে ইচ্ছা করে। দুই দিন ছেলে আমার ভাত খায় না। তারপরেও তো কেটে যাচ্ছে দিনের পরে দিন। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। এই প্রথম, আজাদ নিখোঁজ হয়ে যাবার পরে, তিনি কাঁদেন।

তাঁকে কাঁদতে দেখে বাড়ির ছেলেমেয়েরাও বিনবিনিয়ে কাঁদতে থাকে। আজাদের মার আর ভাত খাওয়া হয়ে ওঠে না। তখন সারাটা দুনিয়ায় যেন আর কোনো শব্দ নাই। কেবল কয়েকজন বিভিন্ন বয়সী নারীপুরুষের কান্নার শব্দ শোনা যায়। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে চোখের জল সামলাতে, বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা রোদনধ্বনি দমন করতে, তারা পারে না।

রাত্রিবেলা সবাই ভাত খাচ্ছে। মহুয়া মার কাছে যায়। আম্মা, দুইটা রুটি সেঁকে দেই। খাবেন?

মা মাথা নাড়েন। খাবেন।

তাঁকে রুটি গড়িয়ে দেওয়া হয়। একটুখানি নিরামিষ তরকারি দিয়ে তিনি রুটি গলায় চালান করেন।

খাওয়ার পরে, শোওয়ার সময় তিনি আর খাটে শোন না, মহুয়া কচি টিসু অবাক হয়ে দেখছে গত দু রাত ধরে আম্মা মেঝেতে পাটি বিছিয়ে শুচ্ছে। তারা বিস্মিত হয়, বলে, আম্মা এইটা কী করেন, আপনে মাটিতে শুইলে আমরা বিছানায় শুই কেমনে, কিন্তু আম্মা কোনো জবাব না দিয়ে মেঝেতেই শুয়ে পড়েন। মাথায় বালিশের বদলে দেন একটা পিঁড়ি।

তখন কচি, ১১ বছর বয়স, মহুয়াকে বোঝায়, আম্মা যে দেখছে রমনা থানায় দাদা মেঝেতে শুইয়া আছে, এই কারণে উনি আর বিছানায় শোয় না, না বুজি!

এরপরে আজাদের মা বেঁচে থাকেন আরো ১৪ বছর, ১৯৮৫ সালের ৩০ আগস্ট পর্যন্ত, এই ১৪ বছর তিনি কোনোদিন মুখে ভাত দেন নাই। একবেলা রুটি খেয়েছেন, কখনও কখনও পাউরুটি খেয়েছেন পানি দিয়ে ভিজিয়ে। মাঝেমধ্যে আটার মধ্যে পিঁয়াজ-মরিচ বিশেষ ধরনের রুটি বানিয়েও হয়তো খেয়েছেন। কিন্তু ভাত নয়। এই ১৪ বছর তিনি কোনো দিন বিছানায় শোন নাই।

তিনি আবার যান জুরাইনের মাজার শরিফের হুজুরের কাছে, হুজুরাইনের কাছে। হুজুর তাঁকে অভয় দিয়ে বলেন, ইনশালাহ, আজাদ ফিরে আসবে। শিগগিরই আসবে।

এরই মধ্যে জাহানারা ইমাম একদিন আসেন। তাঁরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেন। অনেকক্ষণ কেউ কথা বলতে পারেন না। তারপর আজাদের মা মুখ খোলেন, বোন গো, কী সর্বনাশ হয়ে গেল। আপনার রুমীকেও নাকি ধরে নিয়ে গেছে!

আজাদের মার মুখে আজাদকে কীভাবে ধরা হলো, তার বৃত্তান্ত শোনেন জাহানারা। তারপর আজাদের মা তাঁকে দেখান সেই ঘরটা, স্টিলের আলমারিতে এখনও রয়ে গেছে গুলির দাগ। মেঝেতে রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে আছে। দেয়ালে গুলি আর রক্তের চিহ্ন।

'বোনরে, বড় মেরেছে আমার আজাদকে। চোখমুখ ফুলে গেছে। সারা গায়ে মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে। গায়ে রক্তের দাগ। মারের দাগ। আজাদের মা বলেন।'

'আপনি দেখেছেন আজাদকে?'

'হ্যাঁ। রমনা থানায়।'

'দেখা করতে দিল আপনাকে!'

'হ্যাঁ।'

'কী বলল সে আপনাকে?'

'বলল, মা, খুব মারে। ভয় লাগে, যদি মারের চোটে বলে দেই সবকিছু।

'আপনি কী বললেন?'

বললাম, বাবা, কারো নাম বলোনি তো। বোলো না। যখন মারবে, শক্ত হয়ে থেকে সহ্য করো।'

জাহানারা ইমাম ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে যান। কী শুনছেন তিনি এই মহিলার কাছে। তাঁকে তিনি শক্তই ভেবেছিলেন, কিন্তু এত শক্ত! গভীর আবেগে জাহনারা ইমামের দুচোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। তিনি আবারও সাফিয়া বেগমকে জড়িয়ে ধরেন।

৪৪

আজাদের মা ভাত খান না, বিছানায় শোন না, তবু দিন গড়িয়ে যায়, সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায়, মেলাঘরের মুক্তিযোদ্ধারা নতুন করে পরিকল্পনা আঁটতে থাকে, নতুন নতুন গেরিলারা প্রশিক্ষণ শিবির থেকে বেরিয়ে ঢুকে যেতে থাকে বাংলায়, কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গেরিলাদের আক্রমণে সারাটা টাঙ্গাইলে ময়মনসিংহে পাকিস্তানী বাহিনী মার খেতে থাকে, হেমায়েতের নেতৃত্বে দক্ষিণ বাংলায় চলে দুধর্ষ গেরিলা অভিযান, মাহবুব আলমেরা ঢুকে পড়ে তেঁতুলিয়া দিয়ে, সারা বাংলাদেশের প্রতিটা সীমান্তে সেক্টর কমান্ডারদের নেতৃত্বে বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনী, সেনাসদস্য, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, আর লক্ষাধিক মুক্তিবাহিনী জলে-ডাঙায় শানাতে থাকে আক্রমণ, বাংলার নদনদী বৃষ্টি বর্ষা ধানক্ষেত কাদামাটি ফাঁদ পেতে রাখে হানাদারদের জন্য, বাংলার ফুলফল পাখিপতঙ্গ আশ্রয় দেয় মুক্তিদের, বাংলার প্রতিটা ঘর দুর্গ হয়ে ওঠে, বাংলার প্রতিটা মানুষ হয়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধা, আর যুদ্ধাহত হন খালেদ মোশাররফ, তবুও সেক্টর টুর গেরিলা ওয়ারফেয়ার আরো গতি পেতে থাকে, আরবান গেরিলারা ঘিরে ফেলে ঢাকার চারপাশ, ওই তো গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছেন শিল্পী আজম খান, ওই তো রক্তে আগুনে ক্যানভাস রাঙাবেন বলে ক্রলিং করে এম্বুশ পাতছেন চিত্রশিল্পী শাহাবুদ্দিন, কবির কলম ফেলে রাইফেলের ট্রিগারের সঙ্গে মিতালী গড়েছেন হেলাল হাফিজ, রফিক আজাদ, আবু কায়সার, মাহবুব সাদিক; সারা বাংলাদেশ যুদ্ধ করছে, শাহাদত চৌধুরীর মাকে তাঁর যে-গণিতজ্ঞ ভাই কিছুদিন আগে বলেছিলেন, আমাকে অঙ্কের হিসাবে বলো, এক পরিবারের কয়জন গেছে মুক্তিযুদ্ধে, ঢাকার রাস্তায় কয়টা পটকা ফোটালেই একটা প্রশিক্ষিত সেনাবহিনীকে হারানো যায় না, তাঁকে মা তখন কিছু বলেন নাই; কিন্তু ৩০শে আগস্ট ৭১ নিজ বাড়িকে বিপদ-সংকুল মনে করে ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেবার পরে তিনি সেই পুরোনো প্রশ্নের জবাব বুঝিয়ে দেন, আমার ৬ ছেলের তিনজনই গেছে মুক্তিযুদ্ধে, আমি অঙ্কের হিসাবে দেখি দু কোটি যুবকের এক কোটিই যোদ্ধা; আজাদের মা ভাত খান না, বিছানায় শোন না, ঢাকায় একরাতে ধরা পড়ে অনেক গেরিলা, অনেক অস্ত্রশস্ত্র, কিন্তু আবারও ঢাকায় ঢুকে পড়ে গেরিলারা, রাইসুল ইসলাম আসাদের নেতৃত্বে ওই তো এগিয়ে যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধারা বায়তুল মোকারমে, সেনাবাহিনীর দুটো লরির মধ্যে হাইজাক করা গাড়িতে বোমা পেতে রেখে একই সঙ্গে উড়িয়ে দিচ্ছে দুটো লরিই, বোমা বিস্ফোরিত হয় টিভিভবনের ৬ তলায়, ঢাকার উত্তরে মানিক বাহিনীর তৎপরতা, আর দক্ষিণে ক্রাক পাটুন, ভায়াডুবি ব্রিজ ওড়াতে গিয়ে শত্রুবাহিনীর গুলিতে শহীদ হয় মানিক, তখন সেকেন্ড ইন কম্যান্ড নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু গ্রহণ করে নেতৃত্ব, পানির নিচে নেমে যাচ্ছে নৌ কমান্ডোরা, একই সময়ে চট্টগ্রাম, খুলনা, চাঁদপুর বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকায় ডুবিয়ে দেওয়া হবে জাহাজ, তিনশ নৌকমান্ডো অপেক্ষা করছে কখন আকাশবাণীতে বাজবে আমি তোমায় শুনিয়েছিলাম আমার যত গান, নেমে গেল যোদ্ধারা জলে, আবার অপেক্ষা পরের গানের জন্য, আমার পুতুল আজকে প্রথম যাবে শ্বশুরবাড়ি, জিরো আওয়ার, আঘাত করো, এক সঙ্গে হঠাৎই ডুবে গেল দশটা জাহাজ,

অপারেশন জ্যাকপট, সেপ্টেম্বরে আবার পরিচালিত হয় অপারেশন জ্যাকপট-২, ধীরে ধীরে ঘেরাও হতে থাকে ঢাকা, চারদিকে ষোল হাজার গেরিলা...

আজাদের মাকে শুভার্থীরা পরামর্শ দেন মগবাজারের বাসা ছেড়ে দিতে, কেননা ওখানে থাকা নিরাপদ নয়, তিনি বাসাটা ছাড়েন না, নিয়মিত ভাড়া দেন, যদি আজাদ ছাড়া পায়, যদি এসে দেখে বাসায় কেউ নাই, কিন্তু তাঁরা চলে যান মালিবাগে, ৭২ সাল পর্যন্ত মগবাজারের বাসার ভাড়া গুনেছেন তিনি, অবশেষে ছেড়ে দেন, এদিকে চৌধুরী সাহেবের পক্ষ থেকে কামরুজ্জামান আসতে থাকে আজাদের মার কাছে, এখনও চলো চৌধুরীর কাছে, আজাদের বাবাও তাঁর প্রথম ছেলেকে হারিয়ে মুষড়ে পড়েছেন, তিনি নানাভাবে চেষ্টা চালিয়েও ছেলের খোঁজ বের করতে, পারেন না, আজাদের বাবার পানাসক্তি বেড়ে যায়, একেকটা রাতে তিনি আজাদ আজাদ বলে নিজের চুল ছেঁড়েন, আজাদের ছোট মাকে অভিযুক্ত করেন নানা অভিযোগে, লোক পাঠিয়ে দেন সাফিয়া বেগমের কাছে, নানাভাবে মিনতি করেন যেন সাফিয়া বেগম তাঁর বাড়িতে ফিরে যান, কিন্তু আজাদের মা অনড়, প্রশ্নই আসে না চৌধুরীর কাছে ফিরে যাবার, এ তাঁর নিজের যুদ্ধ, এ যুদ্ধে তিনি হেরে যেতে পারেন না।

আজাদের মা ভাত খান না, বিছানায় শোন না, অপেক্ষায় থাকেন ছেলে আসবে বলে, আর খোঁজ বের করার চেষ্টা করেন ছেলের, রমনা থানায় যান, তেজগাঁ থানায় যান, এমপি হোস্টেলে যান, ছেলের খবর পাওয়া যায় না, অথচ বড় হুজুর আশ্বাস দিয়েছেন আজাদ বেঁচে আছে, সে ফিরে আসবেই।

এই আশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকেন, দিন গুজরান করেন মহিলা।

রুমীর কোনো খবর নাই, প্রতিদিন মগবাজারের পাগলাবাবার দরবারে যান জাহানারা ইমাম। সেখানে গিয়ে দেখতে পান আলতাফ মাহমুদের আত্মীয়-স্বজনদের, ঝিনু মাহমুদ, মোশফেকা মাহমুদ, দেখতে পান চট্টগ্রাম দুর্নীতি দমন বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর নাজমুল হকের স্ত্রীকে, বরিশালের এডিসি আজিজুল ইসলামের স্ত্রীকে, কুমিল্লার ডিসি শামসুল হক খানের স্ত্রীকে, রাজশাহীর রেডিও ইঞ্জিনিয়ার মহসীন আলীর স্ত্রীকে, চট্টগ্রামের চিফ প্লানিং রেলওয়ে অফিসার শফি আহমেদের স্ত্রীকে, কুমিল্লার লেঃ কঃ জাহাঙ্গীরের স্ত্রীকে, কুমিল্লার মেজর আনোয়ারুল ইসলামের স্ত্রীকে এবং এ রকম বহু। এদের সবারই স্বামী নিখোঁজ। তাঁরা পরস্পরের দুঃখের কাহিনী শোনেন। এদের মধ্যে থেকে জাহানারা ইমাম তাঁর নিজের ছেলেকে হারানোর শোক অনেকটা ভুলে থাকতে পারেন। পিএসপি আওয়াল সাহেবের স্ত্রী আসেন ছোট ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে, জাহানারা জানেন তাঁর তিনছেলে মুক্তিযুদ্ধে গেছে, কিন্তু ভুলেও সে কথা তারা আলোচনা করেন না, উলফাতের বাবা আজিজুস সামাদ ছাড়া পাবার পরে তাঁর স্ত্রী তাঁকে আনেন পাগলা বাবার কাছে, কিন্তু ভুলেও জাহানারা তাঁকে শুধান না উলফাত বা আশফাকের কথা।

এরই মধ্যে একদিন খবর আসে, ৪ সেপ্টেম্বর রাতে, ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আগের রাতে, ঢাকায় শ খানেক মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। জাহানারা ছুটে যান আজাদের মার কাছে, আজাদের মা আজাদের কোনো খবর আর পান নাই। জাহানারা ইমামের মনে এই আশঙ্কা জাগে যে, কেউ নাই, রুমী নাই, বদি নাই, বাকের নাই, জুয়েল নাই, আজাদ নাই, বাশার নাই, আলতাফ মাহমুদ নাই...

রুমীর মা অপেক্ষায় থাকেন যে রুমী ফিরে আসবে, আজাদের মা ভাত বেড়ে নিয়ে বসে থাকেন যে তাঁর ছেলে এসেই ভাত খেতে চাইবে, রুমী আসে না, আজাদ আসে না, কিন্তু স্বাধীনতা নিকটবর্তী হতে থাকে, ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে, মুক্তিবাহিনী আর মিত্র বাহিনী দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকে ঢাকার দিকে, গবর্নর হাউসে মিটিং চলাকালে আকাশ থেকে এসে পড়ে ভারতীয় বিমানের বোমা, সারা আকাশ থেকে ছড়ানো হয় পাকিস্তানী বাহিনীর প্রতি আত্মসমর্পণের আহ্বান সংবলিত লিফলেট, রেডিওতে ঘোষণা দেওয়া হতে থাকে আত্মসমর্পণের

আহ্বান, মিত্রবাহিনীর সঙ্গে ঢুকে পড়ে গেরিলারা, ঢাকায়, মেজর হায়দার ওইতো লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন রেসকোর্স ময়দানের দিকে, যাচ্ছেন কাদের সিদ্দিকী, ৯০ হাজার পাকিস্তানী সৈন্য নিয়ে জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করছে জেনারেল নিয়াজি, মাথা হেঁট, অস্ত্র ফেলে দিতে হচ্ছে মাটিতে...

রুমীর মা বিজয়ের আনন্দে হাসবেন, নাকি কাঁদবেন বুঝছেন না, সকালে সবাই মিলে বাসার ছাদে তুলেছেন স্বাধীন বাংলার পতাকা, কিন্তু দুদিন আগে মারা গেছেন তাঁর স্বামী শরীফ ইমাম সাহেব, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে, আসলে আর্মির নির্যাতনের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ায়। আর তাছাড়া রক্তহিমকরা সব খবর আসছে, মুনীর চৌধুরী নাই, শহীদুল্লা কায়সার নাই, ডা. রাব্বি, ডা. আলীম চৌধুরী, তাঁদের কারা যেন দুদিন আগে চোখ বেঁধে জিপে করে তুলে নিয়ে গেছে, বিকাল নাগাদ খবর আসে, রায়ের বাজারের জলা ডোবাটা একটা বধ্যভূমি, পড়ে আছে সবার লাশ...

সন্ধ্যার পরে বিদ্যুৎ নাই বলে মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে আছেন জাহানারা ইমাম, তাঁর দুবাহুর ভেতরে জামী, বাইরে গাড়ির শব্দ, তারপর দরজায় করাঘাত, কাঁধে স্টেন ঝুলিয়ে কয়েকটা তরুণ দাঁড়িয়ে, তিনি বলেন, এসো বাবারা এসো।

'আমি মেজর হায়দার, এ শাহাদত, এ আলম, এ আনু, ফতে, জিয়া আর এই যে চুলু।'

বড় গোঁফ, জুলফি নেমে এসেছে দাড়ির ধরনে, মিলে গেছে গোঁফের সঙ্গে, আলম বলে, চুলু-সামাদ ভাই এরা জেলে ছিল। আমি নিজেই এদের রিলিজ অর্ডারে সাইন করে এদের ছাড়িয়ে নিয়ে এলাম।

শাহাদতের চাইনিজ স্টেনগানটা জাহানারা ইমাম নিজের হাতে তুলে নেন। তারপর তুলে দেন জামীর হাতে।

আজাদের মা থাকেন মালিবাগের একটা বেড়ার বাসায়। ১৬ ডিসেম্বরের সকাল থেকেই তিনি শুনতে পাচ্ছেন, দেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে, পাকিস্তানী আর্মি সারেন্ডার করতে যাচ্ছে, তাঁর বুকের ভেতরটা আশায় আনন্দে কেমন যে করে, তিনি মহুয়াকে বলেন, দেশ স্বাধীন হলে জেলখানা থেকে সব মুক্তিফৌজ তো ছাড়া পাবে, কী বলিস তোরা! সকাল গড়িয়ে বিকাল হয়, তিনি একবার ঘরে যান, আবার বেরিয়ে আসেন, ডিসেম্বরের বিকালের হলদেটে আলো এসে পড়ে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকা আজাদের মার মুখে। ডালু এসে বলে, আম্মা মুক্তিবাহিনী আর মিত্রবাহিনী ঢুইকা পড়ছে, আর চিন্তা নাই, দেশ স্বাধীন, মা বলেন, তাহলে চল, যাই, মগবাজারের বাসায় যাই, আজাদ যদি ছাড়া পেয়ে চলে আসে!

'এখন যাইবা। চারদিকে গোলাগুলির আওয়াজ, এর মাঝে?'

'হ্যাঁ।'

'কাইলকা যাই চলো।'

'না। আজকেই যাব।'

ডালু জানে তার খালার জেদ, তার খালার তেজ, সে আর না করে না। সাফিয়া বেগম একটা থলেতে করে মগবাজারে বাসায় যাওয়ার জন্যে জিনিসপত্র গোছগাছ করেন। রিকশা জোগাড় করে সাফিয়া বেগমকে নিয়ে ডালু রওনা হয় মগবাজারের বাসার দিকে। একটা দোকানের সামনে এসে সাফিয়া বেগম বলেন, এই রিকশা একটু দাঁড়ান না।

ডালু বলে, কেন?

সাফিয়া তার হাতে ১০টা টাকা দিয়ে বলে, দু সের ভালো চাল কেনো তো বাবা। আলু পিঁয়াজ মরিচ তেল সাথেই আছে।

ডালু কোনো কথা না বলে চাল কিনে আনে।

ততক্ষণে সন্ধ্যা ঝুপ করে নেমে এসেছে এই ঢাকায়। শীতও পড়েছে প্রচণ্ড। চারদিকে জনতার কণ্ঠে জয় বাংলা ধ্বনি। মাঝেমধ্যে গুলির শব্দে প্রকাশ পাচ্ছে জয়োল্লাস।

মগাবাজারের বাসায় আসতে আসতে অন্ধকার ঘন হয়ে নামে। বারান্দাটা অন্ধকার, অন্ধকারেই তালা খুলতে গিয়ে আজাদের মা বোঝেন তালার ওপরে ধুলার আস্তর পড়ে গেছে। তালা খুলে ভেতরে ঢুকে লাইটের সুইচ অন করলে বোঝা যায় বিদ্যুৎ নাই। ডালু দোকানে গিয়ে মোমবাতি কিনে আনে। দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে মোমবাতি জ্বালানো হয়। ঘরদোরেও ধুলার প্রলেপ পড়ে গেছে। মা ঘরদোর সাফসুতরো করে ফেলেন দ্রুত। ছেলে ফিরে এসে দেখুক ঘর অপরিষ্কার, এটা হতে দেওয়া যায় না। মোমবাতি হাতে নিয়ে মা রান্নাঘরে যান। হাঁড়িপাতিল এখানে যে কটা ছিল সেসব মাকড়সার জালে ছেয়ে গেছে। তিনি একটা হাঁড়ি পেড়ে নিয়ে লেগে পড়েন চাল ধুতে।

ডালু জিজ্ঞেস করে, আম্মা, কী করো?

একটু ভাত রান্ধি।

ডালু আর কথা বাড়ায় না। খালা তার কার জন্যে ভাত রাঁধছে, এ সে ভালো করেই জানে। সে চোখের জল গোপন করে। বাইরে তখনও হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার ভেসে আসছেঃ জয় বাংলা।

ভাতের চাল সেদ্ধ হচ্ছে। বলক উঠেছে। ভাতের মাড়ের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে রান্নাঘরের বাতাসে। মা অনেক যত্ন করে রাঁধছেন এই ভাতটুকু। ভাত হয়ে গেলে তিনি হাঁড়িটা মুছে আবার চুলার ওপরেই রেখে দেন। কিছুক্ষণ গরম থাকবে। আজাদ কখন আসবে, বলা তো যায় না।

চুলার আগুন এক সময় নিভে আসে। ডিসেম্বরের শীতের স্পর্শে ভাত ঠাণ্ডা হয়ে আসে হাঁড়িতেই। সারা রাত কেটে যায় আশায় আশায়। মোমবাতি ক্ষয় হতে হতে এক সময় শেষ হয়ে যায়, আলো যায় নিভে। মেঝেতে একটা পাটি আর পাটির ওপরে একটা চাদরে বিছিয়ে শুয়ে থাকেন সাফিয়া বেগম। দুচোখের পাতা তাঁর কখনও এক হয় না। মাঝেমধ্যে উঠে বসেন। রাত ভোর হয়, ফজরের আজান ভেসে আসে মগবাজারের মসজিদ থেকে। আজাদ ফেরে না।

সকালবেলা রোদ উঠলে সাফিয়ার বোনের ছেলেমেয়েরাও চলে আসে এই বাসায়। চঞ্চল বলে, আম্মা, মগবাজারের মোড়ে পাড়ার পোলাপান আজাদ ভাইয়ের নামে ব্যানার টাঙাইছে।

'কেন? চল তো দেখে আসি।'

চলো। চঞ্চলের সঙ্গে মা হাঁটতে থাকেন।

মগবাজারের চৌরাস্তায় এসে দেখেন, পাড়ার ছেলেরা ব্যানার তুলেছে, শহীদ আজাদ, অমর হোক। তিনি বলেন, এইসব কী তুলেছ, এইসব নামাও, আজাদ তো বেঁচে আছে, ও তো ফিরবে।

৪৫

আজাদের মা কিছুদিন থাকেন মগবাজারের বাসায়, এইসময় তাঁর সঙ্গে এসে দেখা করতে কাজী কামাল উদ্দিন, হাবিবুল আলম আসে, সাফিয়া তাদের যত্নআত্তি করেন, তাদের ভাত না খাইয়ে ছাড়তে চান না, ছেলেরাও কথা না বাড়িয়ে হাত ধুয়ে খেতে বসে যায়, কাজী কামাল ভাত খায়, সাফিয়া বেগম তার পাতে ভাত তুলে দেন, কাজী কামাল ভাত চিবোয়, আজাদের মা তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে চোয়ালের ওঠানামা দেখেন, হাবিবুল আলম তার বড় জুলফিওয়ালা গাল নেড়ে ভাত খেতে খেতে গল্প করে, সেন্ট্রাল জেল থেকে সে বের করেছে চুলু-ভাইকে, সামাদ ভাইকে, আজাদের মা বলে, আমার আজাদও বেঁচে আছে, কালকে বড়হুজুর স্বপ্ন দেখে আমাকে বলেছেন...

জাহানারা ইমাম আসেন। জাহানারা ইমাম খোঁজখবর নিতে থাকেন অন্য মায়েদের, জুয়েলের মা কোথায়, বদির মা কোথায়, বাকেরের মা কোথায়, এইসব। আজাদের মা সবাইকে বলেন, আজাদ অবশ্যই বেঁচে আছে। সে ফিরে আসবেই। এই বিশ্বাস তিনি পান জুরাইনের বড় হুজুরের কাছ থেকে, আর তখন নানা জনরব শোনা যেতে থাকে, একজন এসে বলে সে আজাদকে দেখেছে লন্ডনে, টিউব রেলে, তার পাশের আসনেই বসা, আজমির শরিফ থেকে একজন আত্মীয় ফিরে এসে বলেন, ওখানকার খাদেম বলেছে, আজাদ বেঁচে আছে, ফিরে আসবে...

আজাদের মার মৃত্যুর পরে, মালিবাগের শ্বশুরবাড়িতে বসে কচির মনে পড়ে, ৭২ সালে মাঝেমধ্যে আম্মাকে সে গান গেয়ে শোনাত। এই সময় আম্মার প্রিয় গান ছিল, আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি...

কচি গলা ছেড়ে গাইত। মা, ঘরে কুপি জ্বলছে, আলো নড়ছে, মার মুখে আলো পড়ছে আর নড়ছে, চুপচাপ পাটিতে বসে গান শুনছেনঃ

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥

ডান হাতে খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাতে তোর শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥

১৯৮৫ সালে, স্বামীগৃহে বসে, স্মৃতিতাড়িত কচি তার নিজের ছোট ছোট মেয়েদের ডেকে বলে, আম্মা আর আমি আর কী করতাম জানিস?

তারা আধো আধো স্বরে বলে, কী করতা?

আম্মা যখন আমার ওপরে রাগ করতেন, আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইতেন না, আমি তার দরজায় দাঁড়িয়ে গান গাইতে আরম্ভ করে দিতামঃ

বড় আশা করে এসেছি গো, কাছে টেনে লও,
ফিরায়ো না জননী॥
দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো।
আর আমি যে কিছু চাহি নে, চরণতলে বসে থাকিব।
আর আমি যে কিছু চাহি নে, জননী বলে শুধু ডাকিব।

কচি গুনগুন করে গান গেয়ে চলে, মাকে গান গাইতে দেখে তার দুই মেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কচি বলে, আম্মা চুপ করে এই গান শুনত, গান শেষ হলে দেখতাম তার রাগ আর নাই।

কচির চোখ জলে টলমটল করে।

তারপর একসময় মগবাজারের বাসার ভাড়া দেওয়ার সঙ্গতি চলে যায় তাঁর, মালিবাগের বাসাও তাঁরা ছেড়ে দেন, বাসা ছেড়ে দিয়ে ওঠেন বিক্রমপুরে আরেক বোনের ছেলের বাড়িতে, কিছুদিন চলে যায়, সেখান থেকে এসে ভাড়া নেন খিলগাঁওয়ের এক বাসা, যাকে ঠিক হয়তো বাসা বলা যাবে না, বলতে হবে বস্তিঘর, অন্তত যে রাজপ্রাসাদে তিনি একদা থাকতেন, তার তুলনায় এ তো বস্তিই, নর্দমার গন্ধ ঘরের মধ্যে, কাঁচা বাঁশের বেড়া, চারদিকে গরিব মানুষের কোলাহল-খিস্তিখেউড়, জায়েদ কাজ নেয় গাড়ির ওয়ার্কশপে, সারাদিন কাটে তার কালিঝুলি মেখে গাড়ির নিচে। জাহানারা ইমাম বাসায় আসেন, আজাদের মার অবস্থা দেখে তাঁর বুকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে, এতটা খারাপ অবস্থা কারো হতে পারে এ তাঁর কল্পনারও অতীত, দারিদ্রের কশাঘাতের চিহ্ন ঘরজুড়ে, আজাদের মার চেহারাও খুবই খারাপ হয়ে গেছে, শুকিয়ে তিনি অর্ধেক হয়ে গেছেন, অথচ এই মহিলা একদিন এই শহরে রাজরানী ছিলেন। জাহানারা ইমাম বলেন যে তিনি সাহায্য করবেন, কিন্তু আজাদের মা কারো সাহায্য নেবেন না, কেবল সৈয়দ আশরাফুল হক, যে আজাদের ছোটবেলার বন্ধু ছিল, তার কাছ থেকে কিছু টাকা কী মনে করে নেন, মাঝেমধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কাজী কামাল আসে, সে তো আবার আজাদের সহপাঠী, তাকে তো আর না করা যায় না, আজাদদের আরেক বন্ধু হিউবার্ট রোজারিও একদিন এসে তাঁকে মা বলে ডাকে, সাফিয়া বেগম তার মাথায় হাত বোলান, সে তখন জোর করে তাঁর হাতে কিছু টাকা গছিয়ে দেয়, তিনি সেটাও গ্রহণ করেন। না, ভাত তিনি আর কোনোদিনই খান না, দুটো পাতলা রুটি, একটু সব্জি হলেই তাঁর দিন চলে যায়, কী শীত কী গ্রীষ্ম, তার বিছানা মেঝেতে, পাটি বিছিয়ে, খুব শীতের রাতে গায়ের ওপরে দুটো শাড়ি ভাঁজ করে ঢেকে দেওয়া থাকে। জাহানারা ইমাম আবার আসেন তাঁর বাসায়, বলেন, আপনার এই কাহিনী আমি লিখতে চাই, আপনি আজাদের ফটো দেন, আপনার ছবি দেন, তিনি বলেন, না, আমি ইতিহাস চাই না। কোনো কিছু লিখবেন না। কী জানি, হয়তো তিনি চৌধুরীর কাছে নিজেকে ছোট করতে চান নাই।

জাহানারা ইমাম একা খোঁজ খবর করেন আর সব শহীদের মায়েদের, সময়ের চাকা ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে, জীবনের চক্রে পড়ে কোথায় ছিটিয়ে পড়ছে শহীদ জুয়েলের মা, শহীদ বদির মা, শহীদ বাকেরের মা, কত কত শহীদ এই দেশে, তাদের কতজন মা, অভিযোগহীন, দুঃখ সয়ে পাথর হয়ে যাওয়া কখনো উচ্চবাচ্য না করা একেকজন মা!

চৌধুরী আবার প্রস্তাব পাঠান সাফিয়া বেগমকে বাসায় নিয়ে যেতে, কাকুতি-মিনতি করেন, তাঁর নিজেরও শরীর ভেঙে আসছে, তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন নিজের অতীত আনন্দময় সুখের জীবনের কথা ভেবে ভেবে, কিন্তু সাফিয়া বেগম রাজি হন না, রাজি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ইতিমধ্যে আরো বিয়ে করেছেন চৌধুরী, চট্টগ্রামে পেতেছেন আরেক সংসার, তার কাছে যাওয়ার চিন্তাও তো অবান্তর। এখনও ইস্কাটনের বাসা সাফিয়া বেগমেরই নামে, ফরাশগঞ্জের বাসা, এবং ঢাকায় আরো অনেক জমাজমি...

জাহানারা ইমামের কাছে তাঁর সম্পর্কে লেখার প্রস্তাবটা শুনে সাফিয়া বেগম একরাতে তার ছেলের চিঠিগুলো বের করেন। সেখান থেকে আলাদা করেন আজাদের একটা বিশেষ চিঠি।

মা,

কেমন আছ? আমি ভালভাবেই পৌঁছেছি। এবং এখন ভালই আছি। হরতাল বন্ধ হয়ে গেছে। রীতিমতো ক্লাস হচ্ছে। পরীক্ষা শীঘ্রই শুরু হবে। দোয়া করো। তোমার দোয়া ছাড়া কোন উপায় নাই।

আমি নিজে কী ধরনের মানুষ আমি নিজেই বুঝতে পারি না। আচ্ছা তুমি বল ত সব দিক দিয়ে আমি কী ধরনের মানুষ। আমি তোমাকে আঘাত না দেওয়ার অনেক চেষ্টা করি। তুমি আমার মা দেখে বলছি না; তোমার মতো মা পাওয়া দুর্লভ। এই বিংশ শতাব্দীতে তোমার মতো মা যে আছে কেউই বিশ্বাস করবে না। আমি এগুলি নিজ হৃদয় থেকে বলছি, তোমার কাছে ভালো ছেলে সাজবার জন্য নয়। যদি আমি পৃথিবীতে তোমার দোয়ায় বড় বা নামকরা হতে পারি, তবে পৃথিবীর সবাইকে জানাব তোমার জীবনী, তোমার কথা।

আমি ভালো পড়াশুনা করার চেষ্টা করছি।

এবং অনেক দোয়া দিয়ে চিঠির উত্তর দিও।

ইতি তোমার
অবাধ্য ছেলে
আজাদ

আজাদ লিখেছিল, সে যদি নাম করা হয় কোনোদিন, সে লিখবে তার মায়ের জীবনী। পৃথিবীকে জানাবে তার মায়ের কথা। আজাদ যদি বেঁচে থাকে, যদি ফিরে আসে, নিশ্চয় এই কাজ সেই করবে। তিনি তো এই কাজ অন্য কাউকে করতে দিতে পারেন না।

৪৭

১৯৮৫ সাল। আগস্ট মাস। আগস্ট মাস এলেই ঢাকার মুক্তিযোদ্ধাদের মাথার মধ্যটা কেমন করতে থাকে। জায়েদের হাত-পা ঘামতে থাকে দরদর। ২৯শে আগস্ট দিবাগত রাতে আজাদ চলে গিয়েছিল। ১৪ বছর আগে।

সেই রাতটা কাছে আসছে। এদিকে শাহজানপুরের এক দীনহীন বাসায় থাকা আজাদের মার শরীরটা খুবই খারাপ হচ্ছে। হাঁপানির টান যখন ওঠে, তখন তিনি এত কষ্ট পান যে মনে হয় এর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। এর মধ্যে একটা দিনের জন্যও, সেই ১৯৬১ থেকে, তিনি স্বামীর মুখ দেখেন নাই। নিজের মুখও তাকে দেখতে দেন নাই। আজাদের মা জায়েদকে ডেকে বলেন, আমার আর সময় নাই।

জায়েদ বলে, আম্মা, ডাক্তার ডাকি।

মা বলেন, ডাকো। এতদিন ধরে আমাদের দেখছেন, বিদায় নিই।

তাঁকে যে ডাক্তার দেখতেন, টাঙ্গাইলের লোক, ডাক্তার এস.খান, তাকে ডাকা হয়। ডাক্তার এসে দেখেন, আজাদের মা শুয়ে আছেন স্যাঁতসেতে মেঝের ওপরে বিছানো একটা পাটিতে। তিনি বিস্মিত হন না। কারণ তিনি জানেন, কেন এই ভদ্রমহিলা মেঝেতে শোন। তবে ঘরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তাঁকে চিন্তিত করে। গলিটা ময়লা, একধারে নর্দমা উপচে উঠেছে, দুর্গন্ধ ঘরের ভেতরে পর্যন্ত এসে ঢুকছে। ঘরটাতেও আলো তেমন নাই।

তবে সাফিয়া বেগমের মুখখানা তিনি প্রশান্তই দেখতে পান। তিনি তাঁর নাড়ি পরীক্ষা করেন, স্টেথোস্কোপ কানে দিয়ে তাঁর বুকের ভেতরের হাপরের শব্দের মর্ম অনুধাবন করেন। রোগীর অবস্থা বেশি ভালো নয়। এখনই ক্লিনিকে নিয়ে গিয়ে একটা শেষ চেষ্টা করা যায়।

ডাক্তার বলেন, বোন, কী করবা!

মা বলেন, আপনাকে দেখলাম। দেখতে ইচ্ছা করছিল। তাই ডেকেছি। আপনার আর কী করার আছে! আমার সময় হয়ে এসেছে। আমাকে বিদায় দিন। ভুলত্রুটি যা করেছি, মাফ করে দেবেন।

'হসপিটালে যাওয়া দরকার।'

'না। দরকার নাই।'

আলাহ! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তার কিছু ওষুধ দিয়ে বিদায় হন।

মা বলেন, উকিল ডাকো। গেন্ডারিয়ার জমিগুলো আমি লেখাপড়া করে দেব।

উকিল ডাকা হয়।

তিনি গেন্ডারিয়ার জমি তাঁর ভাগ্নে-ভাগ্নিদের নামে আর জুরাইনের মাজারের নামে দলিল করে দেন।

২৯ আগস্ট পেরিয়ে যায়। আসে ৩০ আগস্ট। তিনি ভাগ্নেভাগ্নিদের ডাকেন। জায়েদকে বলেন, শোনো, আমার মরণের পরে কবরে আর কোনো পরিচয় লিখবে না, শুধু লিখবে শহীদ আজাদের মা। বুঝলে!

জি। জায়েদরা কাঁদতে শুরু করে।

তিনি বলেন, শোনো, আসলে আজাদ যুদ্ধের সময়ই শহীদ হয়েছে। ওর বউয়ের জন্যে আমি কিছু গয়না রেখেছিলাম। এগুলো রেখে আর কোনো লাভ নাই। আজাদ তো আসলে যুদ্ধের সময়ই শহীদ হয়েছে। এগুলো তোমাদের দিয়ে গেলাম। তোমরা বড় হজুরের সাথে আলাপ করে সৎকাজে এগুলা ব্যয় কোরো। আমার যাওয়ার সময় হয়েছে, আমি যাই বাবারা, মায়েরা।

জায়েদ, টিসু, টগর, তাদের বউবাচ্চা, যারা তাঁর পাশে ছিল, তারা কাঁদতে থাকে।

তিনি ইশারা করে বলেন, কেঁদো না। তিনি একটা ট্রাংকের চাবি জায়েদের হাতে তুলে দেন। পরে, জায়েদ সেই ট্রাংক খুলে প্রায় একশ ভরি সোনার গয়না দেখতে পায়! আশ্চর্য তো মহিলা, এতটা কষ্ট করলেন, কিন্তু ছেলের বউয়ের জন্য রাখা গয়নায় এই ১৪টা বছর হাত দিলেন না!

১৩ই জেলহজ্ব, ৩০ আগস্ট ১৯৮৫ বিকাল পোনে ৫ টায় আজাদের মা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

জায়েদ অন্যান্য কৃত্যের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা কাজী কামাল বীরবিক্রমকে খবরটা দেওয়ার কর্তব্যটাও পালন করে। সেখান থেকে খবরটা পান জাহানারা ইমাম। তিনি আবার একে একে খবর দেন ঢাকার আরবান গেরিলাদের। হাবিব আলম, হ্যারিস, বাচ্চু, ফতেহ, উলফত, শাহাদাত, চুলু-আলভী, আসাদ, শহীদুলাহ খান বাদল, হিউবার্ট রোজারিও...

পরদিন সকালে লাশ নিয়ে যাওয়া হয় জুরাইন গোরস্তানে। জাহানারা ইমাম রয়ে যান গাড়ির ভেতরে, গোরস্তানের গেটের বাইরে।

জনা তিরিশেক মুক্তিযোদ্ধা আর কিছু নিকটাত্মীয়ের শবযাত্রীদলটি কফিন বয়ে নিয়ে চলে।

লাশ গোরে নামানোর পরে হঠাৎই রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ থেকে বৃষ্টি নামতে থাকে। একটা অচেনা মিষ্টি গন্ধে পুরো গোরস্তানের বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। অনেক মুক্তিযোদ্ধারই মনে হয়, তাদের সহযোদ্ধা শহীদেরা আজ অনেকেই একত্রিত হয়েছে এই সমাধিক্ষেত্রে, যেন তারা পুষ্পবৃষ্টি করছে বেহেশত থেকে, যেন তারা মাটি দিচ্ছে কবরে। শহীদ জুয়েল, শহীদ বদি, শহীদ বাকের, শহীদ আলতাফ মাহমুদ, শহীদ রুমী প্রমুখ আর শহীদ আজাদ এখানে উপস্থিত।

সহযোদ্ধা শহীদের মাকে সমাহিত করতে এসে ঢাকার আরবান গেরিলাদলের সদস্যরা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, ঘোরগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাড়িত বোধ করে; স্মৃতি তাদের দখল করে নেয়, স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন তাদের জাগিয়ে তোলে, নিশিপাওয়া মানুষের মতো তারা হাঁটাহাঁটি করে, ত্রিকালদর্শী বৃদ্ধের মতো তারা একবার কাঁদে, একবার হাসে। তারা স্মৃতি তর্পণ করে। আজাদের মার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ে যাবার পরের কটা

দিন তারা একা একা, জোড়ায় জোড়ায়, কিংবা ছোট ছোট গ্রুপে বসে এই কাহিনী স্মরণ করে। বলাবলি করে। ঘাঁটাঘাটি করে। জাহানারা ইমাম কাগজকলম নিয়ে লিখতে বসেন। কারণ তিনি মা। একটা লোক যখন মরে যায়, ভাইয়ের কাছে সেটা চলে যাওয়া, বোনের কাছে সেটা শূন্যতা, বাবার কাছে তার নিজেরই ধারবাহিকতার ছেদ, বন্ধুর কাছে সেটা অতীতস্মৃতি আর বিস্মৃতির দোলাচল, পড়শির কাছে তা দীর্ঘশ্বাস, দেশের কাছে কালের কাছে হয়তো তা প্রিয়তম পাতার ঝরে যাওয়া, কিন্তু মায়ের কাছে? মায়ের কাছে সন্তানের মৃত্যু হলো সমস্ত সত্তাটাই মৃতের দ্বারা দখল হয়ে যাওয়া, মায়ের স্মৃতি, মায়ের অস্তিত্ব, তাঁর নিদ্রা, তাঁর জেগে থাকা, তাঁর স্বপ্ন, সবটা জুড়েই পুনর্বার জন্ম নিয়ে বিপুলভাবে বেড়ে উঠতে থাকে তাঁর গতায়ু সন্তানটিই। তাঁর পরিপার্শ্ব, তাঁর চারপাশের জগত একজন সন্তানহারা মায়ের এই গোপন বিপুল রক্তক্ষয়ী নিজস্ব সংগ্রামটাকে বুঝতে পারে না, আমলে আনে না।

সন্তান নাই এই সত্যটা মেনে নিতে না পেরে মা করে চলেন তাঁর নিজস্ব সংগ্রাম, বিস্মৃতির বিরুদ্ধে স্মৃতির সংগ্রাম; বিলাপ করে, সন্তানের স্মৃতি বয়ান করে, তার ছবি বুকের মধ্যে ঘরের মধ্যে ট্রাঙ্কের মধ্যে সংরক্ষণ করে, তার নামে কুরবানি দিয়ে, তার নামে গাছ লাগিয়ে ফল ফলিয়ে তিনি চালিয়ে যান এই তাঁর এই একাকী নিজস্ব ব্যক্তিগত সংগ্রাম। তা-ই করতে বসেন জাহানারা ইমাম, লিখে চলেন একাত্তরের ডায়েরি, বুকে পাথর বেঁধে, দিনের পর দিন, পৃষ্ঠার পরে পৃষ্ঠা। নিশ্চয় শহীদ জুয়েলের মা, শহীদ বদিউল আলমের মা, শহীদ বাশারের মা, শহীদ বাকেরের মা, বাংলাদেশের আর লাখো শহীদের মা, নিজ নিজ ধরনে বিস্মৃতির সুষুপ্তির বিরুদ্ধে একা জেগে থাকেন। আর তাঁদের সেই একাকী স্মরণসংগ্রামের প্রতীক হয়ে শহীদ মিনারের মধ্য মিনারটা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, মায়ের দুপাশে চারটা সন্তানসমেত, দিন নাই, রাত্রি নাই, কী রোদে, কী বৃষ্টিতে!

৪৮

আজাদ ধরা পড়ার পর ৩১ বছর পরে, আজাদের মাকে দাফন করার ১৭ বছর পরে একজন ক্ষুদ্র-সামর্থ্য লেখক, আরেক ৩০ আগস্টে আরম্ভ করে আজাদের অপূর্ণ একটা ইচ্ছা পূর্ণ করার অসম্ভব কাজটিঃ আজাদের মার কথা সবাইকে জানানো, আজাদের মার জীবনী রচনা করা। আজাদ মাকে লিখেছিল সে যদি নামকরা হয়, বড় হয়, তাহলে সে সবাইকে জানাবে তার মায়ের কথা। রচনা করবে তাঁর জীবনী! আজাদ অনেক বড় হয়েছে, এত বড় যে তার সমান আর কেই বা হতে পারে, নামকরা হয়েছে, এরচেয়ে বেশি নামকরা আর কীভাবে হওয়া যাবে? এখন আজাদের বাবা বেঁচে নাই, ইস্কাটনের বাসাটাও বিক্রি ও ভাঙা হয়ে গেছে, ওখানে উঠছে বড় এপার্টমেন্ট, ৩৯ মগবাজারের বাসাটা একই রকম আছে, কামরুজ্জামান মারা গেছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে ভুগে ভুগে। শহীদ ক্রিকেটার জুয়েলের নামে আজো অনুষ্ঠিত হয় শহীদ জুয়েল স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

জাহানারা ইমাম আর বেঁচে নাই, কিন্তু রয়ে গেছে তাঁর একাত্তরের দিনগুলি, মুক্তিযোদ্ধারা অনেকেই আছেন, কেউ কেউ নাই, বাংলাদেশ আছে, স্বাধীনতা আছে, কী জানি এই বাংলাদেশ তাঁদের কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশের সঙ্গে মেলে কি না, আর জায়েদ ও চঞ্চল দাঁড়িয়ে গেছে নিজের পায়ে, তাদের আম্মার দোয়ায় তারা এখন স্বচ্ছল, আর তারা তাদের আম্মার কবরটা পাকা করে টাইলস শোভিত করে রেখেছে, আজও যদি কেউ যায় জুরাইন গোরস্তানে, দেখতে পাবে কবরটা, আর দেখতে পাবে প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ তাঁর পরিচয়ঃ মোসাঃ সাফিয়া বেগম, শহীদ আজাদের মা।

তথ্য-সহায়িকা ও উৎস

১. একাত্তরের দিনগুলিঃ জাহানারা ইমাম, প্রকাশকঃ সন্ধানী প্রকাশনী

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্রঃ সম্পাদনা-হাসান হাফিজুর রহমান, প্রকাশকঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

৩. মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুল আলম বীর প্রতীক-এর লেখা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রকাশিতব্য স্মৃতিচারণ গ্রন্থের ইংরেজি পাণ্ডুলিপি

৪. সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকায় প্রকাশিত হাবিবুল আলম বীর প্রতীক লিখিত ঢাকার বিভিন্ন অপারেশনের স্মৃতিচারণ।

৫. স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঢাকায় গেরিলা অপারেশনঃ হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, প্রকাশকঃ সময় প্রকাশন

৬. 'আগরতলা মামলা', শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহঃ ফয়েজ আহ্‌মদ, প্রকাশকঃ সাহিত্য প্রকাশ

৭. হাসান হাফিজুর রহমান, বিমুখ প্রান্তরে অনির্বাণ বাতিঘরঃ মিনার মনসুর, প্রকাশকঃ বাংলা একাডেমী

৮. সাধু গ্রেগরির দিনগুলিঃ শাহরিয়ার কবির, প্রকাশকঃ দিব্যপ্রকাশ

৯. শাশ্বতঃ তাহমীদা সাঈদা, প্রকাশকঃ সন্ধানী প্রকাশনী

১০. ভুলি নাই, ভুলি নাইঃ গোলাম মোর্তোজা সম্পাদিত, প্রকাশকঃ সময় প্রকাশন।

১১. ঘুম নেই, নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু, প্রকাশকঃ চেতনা প্রকাশন।

১২. টিটোর স্বাধীনতা, নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুঃ চেতনা প্রকাশন।

১৩. মুক্তিযুদ্ধ, সিদ্দিকুর রহমান, প্রকাশকঃ ঢাকা প্রকাশনী।

১৪. বাঙালির ইতিহাস, ড. মোহাম্মদ হাননান, প্রকাশকঃ অনুপম প্রকাশনী।

লেখকের নেওয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (সেপ্টেম্বরঃ ২০০২)

১. মুক্তিযোদ্ধা নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু,

২. মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুল আলম বীরপ্রতীক

৩. মুক্তিযোদ্ধা কাজী কামাল উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রম

৩. শাহাদত চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা, সম্পাদক সাপ্তাহিক ২০০০,

৪. আবুল বারক আলভী, মুক্তিযোদ্ধা, শিল্পী

৫. ফেরদৌস আহমেদ জায়েদ, শহীদ আজাদের খালাত ভাই, ঘটনার রাতে গুলিবিদ্ধ

৬. গাজী আলী হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ আজাদের দুঃসম্পর্কিত চাচা,

৭. আজাদের ছোটমা।

৯. গাজী আমিন আহমেদ, মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ আজাদের দুঃসম্পর্কিত ভাই, প্রাক্তণ বামপন্থী রাজনীতিক

১০. শিমুল ইউসুফ; অভিনেত্রী।

১১. আরো একাধিক ব্যক্তি (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক)

এবং

মাকে লেখা আজাদের চিঠি, ফেরদৌস আহমেদ জায়েদের সূত্রে প্রাপ্ত।